মনোজ বসু

এক বিহঙ্গী

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE LIBRARY
৫৭৯৪
Agartala

বেঙ্গল পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা বারো

তৃতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৬৩

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৬১

দ্বিতীয় সংস্করণ : চৈত্র, ১৩৬১

প্রকাশক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর : সত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়

চ্যাটার্জি প্রিণ্টার্স

৪২এ, মলঙ্গা লেন

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ :

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই : বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

নতুন কালের সাহিত্যশিল্পী

শ্রীমান্ প্রাণতোষ ঘটক

করকমলেষু

২০ শ্রাবণ, ১৩৬১

—এই লেখকের—

মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প (৩য় সং), চীন দেখে এলাম—১ম পর্ব (৬ষ্ঠ সং), চীন দেখে এলাম—২য় পর্ব (৩য় সং), বকুল (৩য় সং), জল-জঙ্গল (২য় সং), নবীন যাত্রা (৪র্থ সং), এক বিহঙ্গী (৩য় সং), কুংকুম (২য় সং), কিংশুক, বাঁশের কেল্লা (৪র্থ সং), উলু (৩য় সং), কাচের আকাশ (২য় সং), দিল্লী অনেক দূর, রাখিবন্ধন (২য় সং), বিপর্যয়, নূতন প্রভাত (৫ম সং), প্লাবন (৪র্থ সং), আগস্ট, ১৯৪২ (৩য় সং), ভুলি নাই (২৬শ সং), শত্রুপক্ষের মেয়ে (৫ম সং), সৈনিক (৭ম সং), পৃথিবী কাদের ? (৪র্থ সং), দেবী কিশোরী (৩য় সং), দুঃখ-নিশার শেষে (৩য় সং), যুগান্তব (২য় সং), বিলাস-কুঞ্জ বোর্ডিং।

যুগান্তর : ঘরোয়া পরিবেশে সহজ স্বাভাবিক জীবনের প্রকাশ 'এক বিহঙ্গী'। লেখকের লিরিকধর্মী মন অতি পরিচিত পরিবেশে এক বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করিয়াছে। যে জগতের সন্ধান পাইবার জন্য বর্তমানকালের অসংখ্য তরুণ-তরুণী ব্যাকুল হইয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে। সংলাপের মিষ্টতা ও ভাষার আশ্চর্য সংযম পাঠককে অতি দ্রুত সম্মুখপানে টানিয়া লইয়া যায়।

Hindusthan Standard: Fondling of an affluent and affectionate father, the motherless daughter Anita soured like a blithe bird with the mortals moving wide open wings high in the sky from where on the earth looked very small. But thawing started at the dawn of love for such a mortal till at last with closed wings she nestled into a sweet home.

The creative genius of Sri Manoj Basu is evident from the brilliantly drawn characters,—so complete and so lively—that their pulses seem to beat audibly. The firm grip of the whole story full of the searching of hearts and tears beneath the smiles bears the imprint of the inimitable and mature pen of the author.

Thought (Delhi) :...'Mr. Bose has specialised in portraying the sweet romance of middle class Bengali families with deft touches that catch the retrospect, the depth of thought and the vision with a rare sense of sympathy for ordinary middle-class people...Equally important in the happy blending that Manoj Bose presents in his pen-picture of Bengal villages...The book is a significant contribution to the Bengali literature.

দেশ : 'বনমর্মরের' মনোজ বসু এখনো সাহিত্য-ক্ষেত্রে সজীব, এখনো নবীন।...আলোচ্য উপন্যাসটি সেইরূপ এক নতুন সুর সংযোজনার স্পষ্ট অনুরণন আছে। মনোজবাবু মূলত অন্তঃধর্মী লেখক, বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতের চেয়ে অন্তরের নানা রহস্যময় আনন্দ-বেদনার সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়ে তার সৃষ্ট চরিত্রগুলি পাঠক সমক্ষে উপস্থিত হয়। বিমুগ্ধ পাঠক তাদের মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে আশ্চর্য হন। যে কোন কাহিনীকে মনোমত করবার ক্ষমতা তাঁর অননুকরণীয়। ভাষা এবং বর্ণনার ভঙ্গিতে অদ্ভুত এক যাদু আছে।...আগাগোড়া উপন্যাসটি মনোরাজ্যের অদ্ভুত এক রহস্যময়তার ইঙ্গিত করছে—হেথা নয়, আর কোনখানে। আধুনিক অস্থিরচিত্ত যুবক-যুবতীদের এমন সার্থক চিত্র বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে দেখা যায় নি।

১

হিমাংশু রায় গভীর মনোযোগে মামলার নথিপত্র দেখছেন। হেনকালে পায়ের উপর শুড়শুড়ি মতন। ঝটকা মেরে পা সরিয়ে নিতে এক ছোকরা উঠে দাঁড়াল।

হিমাংশু ভ্রূকুটি করেন, কি?

জবাব শোনবার ধৈর্য নেই। এক নাগাড় গজর-গজর করছেন, এক এক মহৎ কর্ম সেরে এসে ওঠেন। একান্নর উপরে এই আর এক পীঠস্থান বেড়েছে—হিমাংশু উকিলের সেরেস্তা। এসে পড়লে সমস্ত পাপখণ্ডন। বলে ফেল, কি করে এলে—ডাকাতি, রাহাজানি, খুনজখম?

ছোকরা সবিনয়ে বলে, সে সব কিছু নয়—

কি তবে—চুরি-ছ্যাঁচড়ামি? পায়ের ধুলো নেয়াটা তো ভারিক্কি কেসের মতো। তা সে যাই হোক—আমি পারবো না। সোজা পথ দেখা যাচ্ছে, বিদেয় হয়ে যাও। কেন, আমি ছাড়া উকিল নেই?

ছোকরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। চেহারায় সেই মানুষই বটে—কিন্তু নিজের কোটে ফিরে মেজাজ ও কণ্ঠস্বর বিলকুল পালটেছে। মেনি-বিড়াল বনে গিয়ে বন-বিড়াল হয়ে যায়। তা এ জায়গা বনেরই সামিল—কলকাতা শহর। দালান-কোঠার বনজঙ্গল। জানোয়ারে জানোয়ারে মুখোমুখি হলেই নখ-দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে, শহরের মানুষও তাই।

হিমাংশু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, এখনও দাঁড়িয়ে? কাঠের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে তো অতগুলো চেয়ার আছে কি জন্যে? নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই, তবু রেহাই দেবে না। বলি, বুড়োমানুষ বলেও মায়া-দয়া হয় না তোমাদের?

ছেলেটা মৃদুকণ্ঠে বলে, আমায় চিনতে পারছেন না ?

না, পারছি না চিনতে—কি হবে ? দাগি লোক বুঝি—বিস্তর আসা-যাওয়া আছে ? শোন, হাজার টাকা ফী দিলেও পুরানো মক্কেল আমি চিনে রাখি নে। সাধুসন্ত সোহং বাবাজিরা কিনা, তাই চেহারা মুখস্থ রাখতে হবে !

ছোকরা বলে, মামলা-মোকর্দমার কাজে আসি নি—

এ ধরনের ভূমিকাও হিমাংশুর বিস্তর শোনা আছে। নানা কায়দায় কথার মারপ্যাঁচের পর শেষটা আসল বস্তু বেরোয়, মাঝখান থেকে সময়ের অপব্যয়। বললেন, উকিলের বাড়ি তবে কি ভাগবত শুনতে এসেছ বাপু ? কোর্টের বেলা হয়ে গেছে—সংক্ষেপে বলে ফেল, কি চাই—

ছোকরা রেগে গেছে। আর মফঃস্বলের এরা রেগে উঠলে একেবারে বেপরোয়া। ঝাঁঝালো সুরে বলে, চাই একটু ভদ্রতা। মারমুখি হয়ে উঠছেন—কিন্তু আপনি আসতে বললেন, তাই এসেছি। ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন। আমায় না চিনুন, নিজের হাতের লেখা চিনবেন তো ?

অতএব চোখ তুলতে হল। বেকুব হলেন।

তাই বটে ! পাকা দলিল হাতে করে এসেছ। আচ্ছা, কোন জায়গায় দেখা হয়েছিল বলো দেখি ?

জলিপাড়ার বীরেশ্বর দাঁব বাসায়। কেস করতে গিয়ে যেখানে উঠেছিলেন আপনি।

বীরেশ্বর মোক্তার নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে নিয়ে গেল মক্কেল বাঁচাতে। তার বাসায় ছাড়া উঠি আর কোথায় ?

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর অতি প্রসন্ন হয়ে উঠল।

গোলমেলে কেস, ফাঁসিও হতে পারত। তিন দিন থাকতে হয়েছিল সেখানে। বীরেশ্বরের বাসায় এক ছোঁড়া থাকত, গঙ্গা পার হয়ে কলেজ করতে যেত। কী যত্নটাই যে করল ! একদিন মাথা ধরে বড্ড কাবু হয়ে পড়েছিলাম—বললে বিশ্বাস করবে না বাপু, ভোর-রাত্রে জেগে দেখি, ছোঁড়া শিয়রে বসে মাথা টিপছে। কি যেন-নামটা—রোসো—

আমিই সেই। শ্রীমিহিরকুমার—

শেষ করতে দিলেন না হিমাংশু, উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠেন। ঠিক, ঠিক—

মিহিরই বটে। দেখলে বাবা মিহির, আগাগোড়া সমস্ত মনে আছে। কিছু ভুলি নি।

মিহির বলে, আপনি বলেছিলেন পরীক্ষার পর দেখা করতে। কাজকর্ম করে দেবেন।

আলবত করে দেব। তুমি অত করলে আর তোমার কিছু করব না? কিন্তু রেগেমেগে তেরিয়া হয়ে উঠলে। দেখ বাপু, রাগটা কম কোরো—জীবনে উন্নতি হবে। মেজাজ দেখালে মানুষ বিগড়ে যায়।

নথিপত্র বেঁধে ফেলে হিমাংশু চেয়ারে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসলেন। অর্থাৎ উপদেশামৃত কেবল ছিটেফোঁটা পড়েছে, জুত করে বসে এবার মুষলধারে ছাড়বেন। কিন্তু গটমট করে এসে পড়ল এক মেয়ে। স্লিপার পায়ে, খোলা চুলের রাশি, ঢিলেঢালা বেশ। মিহির যে একটা মানুষ, সামনে দাঁড়িয়ে তা মোটে আমলেই আনল না। কীটপতঙ্গ নজরে আসে না, এমনি একটা ভাব।

সাড়ে-নটা বেজেছে বাবা—

হিমাংশু বলেন, বাজুক গে। হচ্ছে জরুরি মামলার কথা। আমি কি অফিসের কেরানি যে ঘড়ি ধরে চলতে হবে?

বেশ! তখন যে নাকে-মুখে গুঁজেই ছুটতে শুরু করবে, তা হতে দিচ্ছিনে। খাওয়ার পরে আধঘণ্টা জিরোনোর নিয়ম—যখনই ওঠো, সে আধঘণ্টা আমার চাই।

যেমন এসেছিল, জজসাহেবের মতো রায় দিয়ে তেমনি ভাবে চলে গেল।

কথাবার্তা এর পর আর জমে না। ঐ আতঙ্ক রয়েছে—যত দেরিই হোক, বিছানায় গড়ানো আধঘণ্টার জায়গায় উনত্রিশ মিনিট হতে দেবে না অনীতা। তবু কথাটুকু শেষ করে যেতে হয়।

যা বলছিলাম বাবা, মেজাজ ঠাণ্ডা রেখ—জীবনে উন্নতি হবে। এই আমাকে দিয়ে দেখ না—সব সময় সকলের কাছে চোর হয়ে বেড়াই। নিজের মেয়েটার কাছেও।

বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

এখন হল না, সন্ধ্যেবেলা আসবে—কেমন? এই ধর সাতটা। রাত্রে

এখানে খাবে। ভুলে যেও না কিন্তু—তোমার জন্যে আজ সকাল সকাল ফিরব। কাজ যোগাড় হয়ে যাবে, সেজন্যে ভেবো না। আমাদের বার-লাইব্রেরিতে একটা ক্লার্ক নেবার কথা আছে, আজকেই খোঁজ নেব—

বাপের সঙ্গে অনীতাও খেতে বসেছে। নইলে বাপ মেয়ে কারও পেট ভরে না। কমলবাসিনী দেখাশুনা করছেন। হিসাব করলে হিমাংশুর সঙ্গে তাঁর ভাই-বোন সম্পর্ক দাঁড়ায়। পাকিস্তান থেকে মেয়ে নিয়ে তিনি উঠেছেন। সেই মেয়ের খোঁজ নিচ্ছেন হিমাংশু।

সীতা আমাদের সঙ্গে বসে না কেন রে?

কমলবাসিনী বললেন, তার তো কলেজ নেই। এত সকালে সাত-তাড়াতাড়ি খেয়ে কি করবে সমস্তটা দিন?

অনীতা বাপকে তাতিয়ে দেয়, কোন দিন আমাদের সঙ্গে দিদিকে বসতে দেন না পিশি। নানান কথা বলে কাটান দিয়ে দেন।

হিমাংশু হাসতে হাসতে বলেন, শহুরে ম্লেচ্ছ হলাম কিনা আমরা! কমল আমাদের অজাত-কুজাত বলে ভাবে।

কথাটা একেবারে মিথ্যা হয়তো নয়। বয়স কম অনীতার, কিন্তু ভারি চালাক; কিছু লুকোছাপা থাকে না ওব কাছে। হিমাংশু উকিল হযেও অত বুদ্ধি ধরেন না। কিন্তু মনের মধ্যে যাই থাক, মুখে মেনে নেওয়া চলে না কিছুতে। কমল বলেন, জাতের কথা কি বলছ দাদা? সকলের বড যে জাত, তাই হল তোমাদের। বিদ্যাসাগব মশায় যে জাতের ছিলেন, তাই।

অনীতা তখন আর-এক দিক দিয়ে ফোড়ন কাটে। জানো বাবা, আমরা খেয়েদেয়ে যা এঁটোকাঁটা পড়ে থাকে, পিশিমা দিদিকে তাই খাওয়ান।

হিমাংশু রাগ করে ওঠেন, অন্যায—এ তোমার ভারি অন্যায় কমল—

কমলবাসিনী বলেন, পাগলির কথায় কান দিও না দাদা। তোমাব এখানে যা খায়-পরে, কজনের কপালে তা জোটে? একটু দেরিতে খেলে গতর ক্ষয়ে যায় না। আমাদের পাডাগাঁযের সংসারে মেয়েমানুষেব পরে খাওয়াই নিয়ম।

কি সৃষ্টিছাড়া নিয়ম রে বাপ্! বুড়োমানুষ আমি খেয়েদেয়ে ঢেকুর তুলব, আর একফোঁটা বাচ্চা শুকনো-মুখে ঘুরে বেডাবে। না কমল, তোমাদের গেঁয়ো নিয়ম এখানে চলবে না, সবাই আমরা এক টেবিলে খাব। বুঝতে পারলে?

কমলবাসিনী শঙ্কিত হয়েছেন। মৃদু মৃদু হেসে—ভারি এক রসিকতার কথা শুনছেন, এমনি ভাবে ঘাড় নাড়লেন।

কক্ষনো ও-তালে যেও না দাদা। থুবড়ো মেয়ে—আজ হোক কাল হোক—পরের ঘর করতে যাবে। ঘরের বউ আগেভাগে টেবিলে গিয়ে বসলে শাশুড়ি তখন ঝাঁটা তুলে তেড়ে আসবে।

একটু হেসে আবার বলেন, খাবার টেবিল পড়ে থাক, তাদের সে সংসারে শোওয়ার তক্তাপোশও হয়তো জুটবে না। স্যাঁতসেতে মেজেয় মাদুর বিছিয়ে পড়তে হবে।

অনীতা ঘাড় দুলিয়ে মহা বিক্রমে তর্ক করে, সেটা তুমি কি করে বল পিশিমা? এমন হতে পারে, বড়লোকের ছেলে দিদির রূপ দেখে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে তুলল। সে বাড়ির ঝকঝকে মেজেয় পা পিছলে যায়। অলকবাবুদের লেকরোডের বাড়িটা যে রকম। পারবে দিদি তখন কাঁটাচামচেয় খেতে, নখ আর ঠোঁট রাঙাতে, পিয়ানোয় বসে বেসুরো চেঁচাতে?

হিমাংশু হাসছেন ছেলেমানুষের মতো। বললেন, নিজেদের ঠেশ দিয়ে বলছিস বেবি, মনে মনে তবে যেন তুই আমারই মতন বুড়ো। ঠাট্টাতামাসা করছিস কর্—কিন্তু নতুন কালের ক্ষমতাটা খুঁটিয়ে দেখিস। নইলে কিন্তু সুবিচার হবে না।

ক্ষমতা মানি বই কি বাবা! খোদার উপরে খোদকারি। বিধাতা পা খোঁড়া করে দিলেন তো বয়ে গেল—প্লেনে চেপে ঘণ্টায় হাজার-দু হাজার মাইল ছুটছি। বিধাতা রূপ না দিলেন তো কৌটো কৌটো রূপ কিনে আনছি বাজার থেকে। তার এক পোঁচ বুলিয়ে নিলে বাপ হয়েও নিজের মেয়ে চিনতে পারেন না।

হিমাংশু লজ্জা পেলেন। তাঁকে নিয়েই ব্যাপার। বেবি একদিন এমন সাজ সেজেছিল যে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন প্রথমটা। বললেন, এক পোঁচ বুলিয়েছিলি—তা বই কি! কলেজে থিয়েটার করবি, বাড়ির মধ্যে তার সাজের মহলা! উঃ কি হচ্ছিস তোরা, বাপ বলে মান্যগণ্য করবি নে, বেকুব বানিয়ে হাততালি দিস। তোমাকেই সাক্ষি মানি কমল, বাপকে নিয়ে খেলা করা—এটা কি উচিত কাজ?

অনীতা খিলখিল করে হেসে ওঠে। হিমাংশু বলেন, আবার হাসি হচ্ছে!' কি বলব, হাত এঁটো—নইলে বিনুনি ধরে দিতাম এক টান। কমলবাসিনীর দিকে সভয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেসে বললেন, এঁটো হাত গায়ে ছোঁয়ালে কমল খেয়ে ফেলবে তাই বেঁচে গেলি।

অনীতা বলে, সে যাকগে। যা বলছিলাম বাবা, দিদিকে পিশিমা একেবারে সেকেলে করে রাখছেন।

হিমাংশু রাগ দেখিয়ে বলেন, একালের হেনস্তা করে আবার এখন সেকালের ঘাড়ে? খবরদার! আমাদের কাল ওটা। না-ই বা হল সীতা আজকালকার মতো! সে তার ঘরবাড়ি নিকিয়ে মন্দিরের মতো করবে, সন্ধ্যা হলে শাঁখ বাজিয়ে গোলা-গোয়ালে সাঁজ দেখিয়ে বেড়াবে। আমার ছেলেবেলায় মা-খুড়িমারা যেমন করতেন। তোরা পারবি সে সমস্ত?

কমলবাসিনী তাড়াতাড়ি বলেন, ষাট ষাট—কোন দুঃখে পারতে যাবে? সাতমহল অট্টালিকায় রাজরানী হয়ে থাকবে আমাদের অনীতা—সেখানে নেই গোলা-গোয়াল, না আছে গোবরমাটি লেপবার জায়গা।

এবং সেই পুরানো প্রসঙ্গ। ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে কমল বলে উঠলেন, গোবর-লেপা, ঘুঁটে-দেওয়া, বাসন-মাজা, শতেক দাসীবৃত্তি করবারও তো একটা জায়গা জোটে না। কি হবে দাদা? তোমার পায়ের তলায় এসে পড়েছি, কোন একটা উপায় করে দেবে না? হতভাগীর দিকে চাইলে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়।

অনীতা সত্যি সত্যি রেগে ওঠে।

জায়গা আবার জোটে না! ঐ চেহারা, গায়ের রং, অমন শান্ত স্বভাব—দিদির সম্বন্ধ না জুটলে পৃথিবী-সুদ্ধ মেয়ে আইবুড়ো হয়ে থাকবে। তুমি পিশিমা, যখন তখন দিদিকে শুনিয়ে বচন ঝাড়ো—সে ভালমানুষ বলে কিছু বলে না—আমার কাছে এবার থেকে কিন্তু কাটা-কাটা জবাব পাবে।

কমল বলেন, একটি মাত্র মেয়ে, ত্রিভুবনে আপনজন কেউ নেই—

বলতে বলতে জিভ কাটলেন।—উঁহু, একথা বললে ভগবান আমায় ক্ষমা করবেন না। কেউ ছিল না বটে এতদিন, কিন্তু সকলের বড় আত্মীয় করে

দিয়েছেন তোমাদের। মেয়েকে বকাবকি করি ইচ্ছে করে নাকি? তাতে কি ভাল ঠেকে আমার?

অনীতা বলে, তোমার স্বভাব—

কমল বলেন, ছেলেমেয়ের মা যখন হবি, তখন বুঝতে পারবি—আজকে নয়। সীতার বাপ অসুখে পড়ে পড়েও জনে জনের হাতে-পায়ে ধরেছেন দায়মুক্ত হবার জন্যে। তিনি চলে গেলেন। দাদাও কতজনকে বলেছেন, কত চেষ্টা করেছেন। বিয়ের ফুল কিছুতে ফোটে না।

বাবা চেষ্টা করছেন তো? অনেক জনকে বলেছেন? কৌতুক-দৃষ্টিতে হিমাংশুর দিকে চেয়ে অনীতা বলে, তুমি বলে বলে হায়রান হচ্ছ বাবা, তোমার মতো মানুষ খেটে খেটে বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারছে না, দিদির 'পরে তাই পিশির আরও আক্রোশ—

হিমাংশু আমতা-আমতা করেন, মেয়ের কথার জবাব জোটে না।

বিয়ের কথা ক-জায়গায় বলেছ? উকিল মানুষ, বাড়ির মধ্যে তবু বলো একটা সত্যি কথা।

তাই কি গোনাগুনতি আছে? বলে থাকবো হয়তো কোথাও কোথাও—

অনীতা হেসে ফেলে কমলবাসিনীর দিকে চেয়ে বলে, শুনলে তো? তুমি আর এইজন্যে মন খারাপ করে আছ—

বিপন্ন হিমাংশু বলেন, মনে থাকে না রে! মক্কেলের ভিড়ে ভুলে মেরে দিই। তাড়ালেও যায় না—মক্কেলগুলোই শেষ করবে আমায়।

অনীতা এবারে বাপের দিকে।

মনে রাখবার কথা নাকি যে ভুলে যাবে না? বিয়ে না দিলে মেয়ে যেন শিং বেরিয়ে মহিষ হয়ে যাচ্ছে, পিশির এমনিধারা ভাব। বুড়োধুমসি বলে বলে এমন করে তুলেছে যে, সে বেচারি ঘর থেকে বেরুতে চায় না—দিনরাত মন-মরা হয়ে থাকে।

২

মিহির চাঁপাতলায় এক মেসে এসে উঠেছে। হীরালাল বর্ধন ওখানে থেকে চড়কবাড়ি কোল-কনসাবনের অফিসে কাজ করেন। মিহিরদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা—মিহিরের জেঠতুত ভাই কানাইয়ের শ্বশুর তিনি। ঠিকানাটা লিখে দিয়েছেন বউদিদিই।—বাবার ওখানে ওঠোগে ঠাকুরপো, ধীরে সুস্থে তারপর একটা জায়গা দেখে নিও।

মেয়ের চিঠি আদ্যন্ত পড়ে গোঁফ পাকাতে পাকাতে হীরালাল বললেন, তা বেশ—এসে পড়েছ যখন কি আর হবে! কিন্তু এত লটবহর সঙ্গে এনেছ কোন বিবেচনায়? কটা দিনের জন্যে ঠেসেঠুসে তোমার না হয় জায়গা হল। জিনিসপত্তোরের কি হবে?

মিহির বলে জিনিসপত্তোর কোথা—দুটো কাপড়, একটা জামা আর খান কয়েক বই ব্যাগে ভরে নিয়ে এসেছি। আর এই বিছানা। বিছানা তো লাগবেই—

চক্ষু কপালে তুলে হীরালাল বলেন, বিছানা ফেলবার জায়গা থাকলে তো আর একটা সিটই করে দিত ঘরের মধ্যে। এটা তোমাদের জঙ্গিপাড়া-হাঁসপুকুর নয়—কলকাতা শহর। মাথাপিছু আড়াই ছটাক চাল—আর শোওয়ার জায়গার রেশন হয় নি বটে, তবু হিসেব করে দেখো জনপ্রতি চার হাত বাই সওয়া হাতের বেশি পৌঁছবে না।

তেতলায় লাটুবাবু থাকেন। শৌখিন ব্যক্তি—থাকেন তক্তাপোশের উপরে। বিছানার বাণ্ডিল হীরালাল তেতলায় তুলে সেই তক্তাপোশের নিচে চালান করলেন। লাটুবাবু হাঁ-হাঁ করে ওঠেন। কি করেছেন বলুন দিকি? মশা হবে—সে মশা বেছে বেছে আমাকেই শুধু কামড়াবে না মশায়, সকলে ভুগবেন।

হীরালাল বলেন, পাড়াগাঁয়ের ছেলে—কলকাতার গতিক জানে না, তাই গন্ধমাদন ঘাড়ে করে এসেছে। চারটে-পাঁচটা দিন থাকবে বড়জোর—তারই ভিতর জায়গা দেখে নেবে।

পাঁচ দিনের বেশি হলে কিন্তু বিছানা ছাতে ছুঁড়ে ফেলব। তখন কিছু বলতে পারবেন না।

তাই, তাই—

ঘর আর সিঁড়ির মাঝে সামান্য বারাণ্ডা। জায়গাটা দেখিয়ে হীরালাল বললেন, সারাদিন কাজকর্মে ঘুরবে বাবাজি—দিনমানটা ভাল যাবে, রাতের বেলা একটু মুশকিল। মেম্বাররা সব উপরে উঠে গেলে ঐখানটায় গড়িয়ে পোড়ো। এ ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি নে। পা ছড়িয়ে শোওয়া চলবে না। খানিকক্ষণ শুয়ে থাকলে—আবার একটু বা উঠে দাঁড়িয়ে পা টান করে নিলে। তবে বৃষ্টি-বাদলা হয় যদি—

একটুখানি ভেবে বলেন, বৃষ্টি হলে ঘরেই ঢুকিয়ে নেবো—কুটুম্বর ছেলে ভিজিয়ে মারব কি করে? ঘরের মধ্যে আবার পুরো এক মানুষ ঢোকালে চিত হয়ে শোওয়া কারো ঘটবে না, কাত হয়ে শুতে হবে। তাই সই—

তিলেক গড়িমসি চলবে না এই অবস্থায়—কাজ জোটাতেই হবে। হিমাংশুর কাছ থেকে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সারতে দেরি হয়েছে, খেয়েই সে বেরিয়ে পড়ল, নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরবে। রাত্রের জন্য চাল নিতে মেসে মানা করে গেছে।

দিনভোর বিস্তর ধকল গেছে, লাভ কিছু হয় নি। অজানা অচেনা মানুষকে এক কথায় কে চাকরি দেবে? ঘুরতে ঘুরতে তারপর সন্ধ্যা হয়ে গেলে—হিমাংশুর বাড়ির সামনে এল। সময়ের আন্দাজ করতে পারে নি, আগেভাগে এসে পড়েছে।

শহরে বড়লোক—তায় মানুষটা ঐ রকম রগচটা, হুট করে ঢুকে পড়তে সাহস হয় না। রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে। মোড়ে পান-সিগারেটের দোকানে টাইমপিস আছে—বার বার সেখানে গিয়ে ঘড়ি দেখে। কাঁটায় কাঁটায় সাতটা হলে তখন ভিতরে গেল।

সকালবেলা গমগম করছিল, এখন ছাড়া-বাড়ির মতো। অনেক দূরে সিঁড়ির নিচে একটা আলো জ্বলছে শুধু। এমন অবস্থায় ঘরে ঢোকা ঠিক নয়। বারাণ্ডায় একটা বেঞ্চি পেয়ে সেইখানেই সে বসে পড়ল।

বসেই আছে। মিছিমিছি রাত হয়ে যাচ্ছে। কথাবার্তা হবে, নিমন্ত্রণের খাওয়াদাওয়া আছে তার পরে। কলকাতা শহর চেনা নেই তেমন, বাস

বন্ধ হয়ে গেলে মহা বিপদ। বাস থেকে নেমে আবার গলিখুঁজি ভেঙে যেতে হয়। রাত বেশি হয়ে গেলে মেসে ফেরা মুশকিল হবে তার পক্ষে।

ফটক খোলার শব্দে আশান্বিত হয়ে তাকায়। উঁহু, হিমাংশু নন—সেই রণচণ্ডী মেয়ে। মিহিরের বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করে। তবে মেজাজটা ভাল এখন, গুন-গুন করে সুর ভাঁজছে। লন পার হয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে অনীতা উপরে উঠে যাবে, আবছা-মতো মানুষ দেখতে পেয়ে ফিরে এল। সুইচ টিপে আলো জ্বালল। চিনেছে—সকালে এই লোকটাই তো বাবার কাছে দাঁড়িয়ে কি-একটা দরবার জানাচ্ছিল।

বাবার জন্যে বসে আছ?

থতমত খেয়ে মিহির উঠে দাঁড়াল। সম্বোধনের ধরনটা খারাপ লাগছে। গিন্নিবান্নি মানুষ যেন এক বাচ্চা ছেলেকে বলছেন। টাকায় বড আছ বটে মানিক, কিন্তু বয়সে ছোট। উপকার নিতে এসেছে—চুপচাপ দেমাক সয়ে যাওয়া ছাড়া উপায়ই বা কি? বলল, কর্তামশায় আসতে বললেন—কাজকর্মের জোগাড় করে দেবেন।

বাবা করে দেবেন কাজকর্ম, তবেই হয়েছে! অনীতা হেসে উঠল। কি কাজ করতে পারবে বলো—

কাজ একটা এরই মধ্যে অনীতার মাথায় এসে গেছে। ঝড়ু বেয়ারা বুড়ো হয়ে পড়েছে। পেন্সন নিয়ে দেশে চলে যাক্, কিংবা এখানে থেকেই পড়ে পড়ে ঘুমোক। নতুন একটা বেয়ারা চাই। বাপ-মেয়ের অনেকবার হয়েছে এই কথা।

লেখাপড়া জানো?

রাগের সঙ্গে মিহিরের কৌতুকও লাগছে। আচ্ছা, ভেবেছে কি মেয়েটা? সবিনয়ে জবাব দেয়, জানি—

ভালই তো মনে হচ্ছে মানুষটাকে। পাড়াগাঁয়ের সদ্য আমদানি—জোচ্চোর-ফেরেব্বাজ হবে না। ভাল করে তবু বাজিয়ে নেওয়া দরকার। বাবা যা মানুষ—তাঁর উপরে বেশি আস্থা রাখবে না, অনীতা নিজে দেখবে।

উপরে উঠছে। মিহিরকে ডাক দিল, এসো—

মিহির ঘেমে উঠেছে। তার জজিপাড়া অঞ্চলে এমন কাণ্ড স্বপ্নে ভাবা

যায় না। নিরালা বাড়ির মধ্যে ফুটফুটে যুবতী মেয়ে অজানা পুরুষকে ডেকে নিয়ে চলেছে। সাজ-সজ্জায় হাসিতে ঝলমল, সেন্ট মেখেছে বুঝি—মধুর উগ্র গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করে মিহিরের। একটুখানি গিয়ে আর পা চলে না।

পিছনে তাকিয়ে অনীতা হাঁক দেয়, কি হল ?

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই পড়ার ঘর। ঘরে ঢুকে পাখা খুলে দিয়ে অনীতা ইজিচেয়ারে গড়িয়ে পড়ল। অলস দৃষ্টি মেলে তাকায় মিহিরের দিকে। মিহির যেন বলির পাঁঠা—বলির খড়্গ হল মেয়েটার খরধার ঐ চোখের দৃষ্টি।

একটু-আধটু ইংরেজিও যে জানার দরকার। নাম সই করতে পারবে তুমি ? করো দিকি—

ভাল মানুষের মত মিহির নাম সই করল। সবিস্ময়ে অনীতা বলে, কদ্দুর পড়াশুনো করেছ ?

বি. এস-সি. পাশ করলাম এবারে—

অনীতা খাড়া হয়ে উঠে বসেছে। কি আশ্চর্য, ঝড়ুর চেহারা-পোশাক এই বি. এস-সি. পাশের চেয়ে অনেক সভ্যভব্য। চেয়ার দেখিয়ে দেয়, বসুন—

বেকুব হয়েছে, সেটা কিন্তু ধরতে দেবে না। সহজ কণ্ঠে বলে, বাবার ফিরতে অনেক দেরি। ক্লাবে দাবায় মেতে আছেন।

আমায় বললেন, সকাল সকাল আজকে ফিরে আসবেন।

সে তো মুখের কথা—মুখ দিয়ে বেরিয়েই ফুরিয়ে যায়।

খিলখিল করে অনীতা হেসে উঠল। বলে, বসেই যান। বসে বসে দেখুন ফিরতে কটা বাজে—

টেবিলে খাতা খোলা—পাতা-ভরতি বিস্তর অঙ্ক। কিন্তু একটাও পারে নি, আগা-পাস্তলা ঢেরা দেওয়া। মিহির আড়চোখে তাই দেখছিল। অনীতা বলে, এক নতুন প্রফেসর ক্লাস নিচ্ছেন। বড্ড ত্যাঁদোড়—বাছা বাছা অঙ্ক দেয়।

মিহির খাতাটা টেনে নিল। তার নিজের ক্ষেত্র, এখানে হুঁশ-জ্ঞান থাকে না।

এ আবার কঠিন কিসে ? পুলি-সিস্টেমের গোড়ার জিনিস। গোরু-গাধায় কষতে পারে।

অনীতা বলে, আমি পারি নি—

মিহিরের চমক লাগে। চাকরির উমেদার হয়ে এসে এসব কি বলছে? রক্ষা এই, শ্রীমতীর মেজাজটা ভারি ঠাণ্ডা—সকালবেলার মতো নয়। সামলে নেবার ভাবে বলল, আপনি চেষ্টা করেন নি তেমন। করলে না হবার কি আছে?

অনীতা বলে, ঢের চেষ্টা করেছি। কিন্তু গোরু নই, গাধাও নই—একটাও তাই হল না।

পাতা উল্টে উল্টে মিহিরও দেখল বটে তাই। বিস্তর খেটেছে। মেঘবরন চুলে-ঢাকা অমন মাথাটি অতএব নিতান্তই ফাঁপা। বেশ এইবার আমোদ পাচ্ছে মনে মনে। এই অঙ্ক কষতে পারো না, অত গুমোর কিসের তবে হে? জোনাকির মতো শুধুই ফাঁকির আলো তোমার, এক ফুলকি আগুন নেই।

অনীতা বলে, বসে বসে কি করবেন? দেখুন না দুটো-একটা যদি হয়ে যায়।

বলবার আগেই পেন্সিল টুকটুক করে চলতে শুরু করেছে। কোথা দিয়ে, কি কায়দায় তিন ছত্রে পয়লা অঙ্কের উত্তর বের করে পরেরটা ধরেছে।

অনীতা ঝুঁকে পড়ল তার কাঁধের উপর দিয়ে। অবাক হয়ে দেখছে। সর্বনাশ, আরে সর্বনাশ, গা শিরশির করে মিহিরের। এমন করলে কিন্তু অঙ্ক গুলিয়ে যাবে। অঙ্ক যদি কষতে হয়—সরে গিয়ে বসা হোক, বেশ অনেকখনি দূরে—ঐ ইজিচেয়ারে আগের মতন বসে থাকলেই তো হয়! শহুরে মেয়েগুলো কি রে—দশাসই জোয়ান পুরুষটাকে মানুষ বলে কেয়ার করে না!

সোল্লাসে অনীতা বলে, ধরতে না ধরতে আপনার হয়ে যাচ্ছে—আর দেখুন, দু-দিন দু-রাত ভেবেও আমি কূলকিনারা পাই নি। কষুন, কষে যান—বাবা যতক্ষণ না এসে পড়ছেন।

অনুনয়ের আমেজ কণ্ঠে। জবাবের ফুরসত দেয় না। মোটা বই খুলে ফসফস করে পাতা উল্টাচ্ছে।

এই প্রশ্নটায়। ডজন খানেক কষতে দিয়েছে রাগ করে। কি উপায় করব, ভাবতে ভাবতে আধখানা হয়ে গেছি।

মিহির সকৌতুকে নজর তোলে। এই যদি তোমার আধখানা হয়, যখন পুরোপুরি অর্থাৎ দ্বিগুণ ছিলে, না জানি কি ব্যাপার। কিন্তু অনীতা আর

নেই সেখানে। স্ফূর্তি হয়েছে—হেঁটেও চলবে না এখন আর। দুমদুম করে ঘরবাড়ি কাঁপিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচের তলায়।

মোহিনী-ঝি আলু কুটছে কমলবাসিনীর কাছে বসে। ইলিশ-ভাজার গন্ধ বাড়ি আমোদ করেছে, ছ্যাঁক-ছ্যাঁক শব্দ উঠছে রান্নাঘরে। মোহিনী বলে, আর কুটবো নাকি পিশিমা? দেখ—

কমল নেড়ে চেড়ে আন্দাজ নিয়ে বলেন, কোটু আর চার-পাঁচটা। মাছ কম—তরকারি বেশি না হলে খাবে সব কি দিয়ে?

ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেন, হায় রে পোড়া রাজ্যি! ইলিশমাছ খাবে, তা-ও টুকরো গুনতি করে—

তোমাদের সেখানে খুব সস্তা বুঝি?

কমল বলেন, পয়সা দিয়ে কিনতে যাচ্ছে কে? বাড়ির নিচে গাঙ—জেলেরা চাকরান খায়। ফি নৌকো একখানা করে মাছ দিয়ে যাবে সায়ের যাবার মুখে। পাড়াময় বিলিয়েও শেষ করা যায় না। এক-এক সময় মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়, নয়তো পচা মাছের গন্ধে গাঁয়ে টেঁকা যায় না।

সীতা এসে বলে; ভাঁড়ারের চাবি দাও মা—

কেন রে?

ঘি যা ছিল, ফুরিয়ে গেছে।

বিনাবাক্যে কমল মেয়ের দিকে চাবি ছুঁড়ে দিলেন।

কি বলব রে মোহিনী, কড়াই-ভরতি দুধের উপর হলুদবরন সর-আঁটা। সেই সর মুখে তুলে দিয়েছি, আর ঐ পোড়া মেয়ে থু-থু করে ফেলে দিয়েছে। আজকে এই হাল। সর্বস্ব ফেলে ভিখারির বেহদ্দ হয়ে মেয়ের হাত ধরে রাতারাতি পালিয়ে আসতে হল।

মোহিনী বলে, বুঝি মারামারি কাটাকাটি হচ্ছিল?

হয় নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ! এক একটা খবর আসে, আর মাথা ঘুরে যায়! সকলের বড় শত্তুর সোমত্ত মেয়ে—তার জন্যে আরো সোয়াস্তি নেই।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সীতার বাপ মরে যাচ্ছেন, তখনও মেয়ের

বিয়ের কথা মুখে। কত বড় ঘরের ঘরণী হয়ে আজকে পরের বাড়ি পরের ভাতে পড়ে আছি। পাপটাকে কোন গতিকে বিদেয় করতে পারলে পোড়া দেশের মুখে ঝাড়ু মেরে আবার নিজের কোটে চলে যাই। মানুষজন আবার ঠিক আগের মতন হয়েছে শুনছি—আমার দেওর ভাসুর জা-জাউলিরা সব ফিরে গেছে।

মোহিনী ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, ওটা কি বললে পিশিমা—পরের ভাত হল কিসে? তুমিই তো সর্বময় হয়ে আছ—

অনীতা আসছে দেখে কমলবাসিনী তাড়াতাড়ি সামলে নেন, তা অবিশ্যি ঠিক। ভাসুর বলো, দেওর বলো, এমনধারা কেউ করবে না। নানান ঘাটে ভেসে ভেসে ঠাকুর শেষটা এখানে এনে ফেললেন। দাদা আমার সত্যযুগের মানুষ, আর ঐ পাগলি জগদম্বাও তাই।

দুমদাম করে অনীতা এসে বলে, ও পিশিমা, কি আছে তোমার—খাবার বের করো কিছু।

কমলবাসিনী স্নেহকণ্ঠে বলেন, ক্ষিধে পেয়েছে—দাদা আসবার আগেই খেয়ে নিবি?

আমার জন্য বুঝি! মেয়ের বিয়ে দিতে চাও তো ছুটে এসো। পড়ার ঘরে পাত্তোর এনে আটকেছি।

কমল হেসে বলেন, কোন্ মেয়ে রে? মেয়ে আমার দুটো—

যেটার সঙ্গে বেশি শত্রুতা—দূর করবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছ। চা দেবার ছুতোয় ভাল করে জামাই দেখে নাওগে। উঁহু, চা দিও না—গেঁয়ো মানুষ মুখ-টুখ পুড়িয়ে এক কাণ্ড করে বসবে।

আবার ছুটেছে উপরে। মোহিনী কৌতুক-চোখে সে দিকে চেয়ে বলল, ঐ যে তুমি মেয়ে বললে পিশিমা—দিদিমণি আহ্লাদে আটখানা। মা নেই কিনা, মা পাবার বড্ড শখ—

উপরে গিয়ে অনীতা মিহিরের ঠিক পিছনটিতে দাঁড়িয়েছে। টেরই পাচ্ছে না এত নিবিষ্ট হয়ে অঙ্ক কষছে। উজবুক আর কাকে বলে—অনুরোধ করেছে তো এমনি দম ধরে কষে যেতে হবে! সে যাই হোক, কাজ নেই শব্দ-সাড়া করে—যতগুলো পারে হয়ে যাক ভালোয় ভালোয়। প্রফেসর ঘোষ টাস্ক দিয়ে

একবারে বড় হুমকি দিয়েছিলেন। ঈশ্বর যেন তাই মিলিয়ে দিলেন। বড্ড ঈশ্বর! অঙ্ক হয়ে যাচ্ছে, অথচ কলম ছুঁতে হল না নিজের হাতে।

পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল। গড়িয়ে পড়ল নিজের ঘরে গিয়ে। গান ধরল। পুরো গান শেষ করবার ধৈর্য নেই। তা ছাড়া অঙ্ক কষা ছেড়ে হয়তো বা হাঁ করে গান শুনবে আদেখলা মানুষটা। গান থামিয়ে দেখতে যায় আবার। না—গান শুনছে না, অঙ্কও কষছে না। খাবার খাচ্ছে—কমলবাসিনী মেঝেয় আসন পেতে খাবার দিয়েছেন, আর সামনে উবু হয়ে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন করছেন। অসুখ ধরেছে তবে—ঠাট্টা করে সে বলেছিল, কিন্তু সত্যি জামাই করবার ফিকিরে আছেন পিশি?

বাড়িতে কে কে আছেন বাবা তোমার?

মা আছেন। আর ভাই-ভাজেরা, তাঁদের ছেলেপুলে। পঁচিশ-ত্রিশখানা পাত পড়ে বেলায়।

ঐ যে বললে, এক ছেলে তুমি মায়ের—

আমি একাই। তারা জেঠতুত ভাই। আসল সংসার বলতে গেলে দু-জনকে নিয়ে—মা আর আমি। কিন্তু সে তো হতে পারে না—বাবা সারাজীবন সকলকে টেনে গেছেন, আমাকেও তাই করতে হবে।

মুখ শুকনো করে বলে, পড়াশুনোয় তাই ইস্তফা দিয়ে রোজগারের চেষ্টায় আছি। মা তাই বললেন। তাঁরও মন উড়ু-উড়ু—আমার একটু স্থিতি হলে সংসারের ভার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে বৃন্দাবনে আমার মামার কাছে উঠবেন। মায়ের হুকুমের উপরে কিছু নেই—কাজের চেষ্টায় তাই বেরিয়ে পড়েছি।

এসে উঠেছ কোথায়?

ঐ মুশকিল একটু। মুশকিল আর কি—পাকা ঘরে আছি, দোতলার উপরেও থাকতে পাচ্ছি। কত মানুষ যে ফুটপাথের উপর—

রাগে অনীতার গা জ্বালা করে। আচ্ছা এক হাঁদারাম—নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে পরাশ্রয়ী কতকগুলোকে পুষবার জন্যে। যেমন ছেলে, তেমনি তার মা!···দিদিটা গেল কোথায় রে? দিদির জন্য দাসীবৃত্তি করবার জায়গা চাচ্ছিলেন পিশি—তা ঠিকই হয়েছে, পঁচিশ-ত্রিশখানা পাতের উপর ভাত ফেলবার জোগাড়ে দিনরাতের মধ্যে নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত থাকবে না সে-বাড়ি।

দিদি এসে দেখে যাক আজব জীবটাকে। ঠিক সে রান্নাঘরে ময়দা ঠাসতে বসেছে। ঠাকুরকে করতে দেবে না, ঠাকুরের মাথা ময়দায় লুচি নাকি তেমন ফুলকো হয় না। কোমরে আঁচল জড়িয়ে তাই নিজে লেগে পড়েছে।

দিদি শোন্—দেখে যা শিগগির—

কি রে?

পড়ার ঘরে হনুমান—

সীতা অ' ’ৰ্গ হয়ে বলে, শহরে বনজঙ্গল নেই—হনুমান আসবে কোত্থেকে?

জঙ্গলের র।ᐟ্য থেকে এসে জুটেছে। এখানে ডালে ডালে লাফায় না—রাস্তায় হাঁটে, মোটর চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। কিন্তু চেহারায় বুদ্ধিতে কাজকর্মে একেবারে জঙ্গুলে জানোয়ার।

টানতে টানতে নিয়ে আসে। জানলার কাছে এনে আঙুল দেখায়। তবু সীতা বুঝতে পারে না।

কোথায় হনুমান?

মাথা থেকে পা অবধি দেখ মিলিয়ে। খোঁচা-খোঁচা চুল—জন্মে কখনো চিরুনি পড়ে নি। লেজটা পাওয়া যাচ্ছে না—মিলের কোরা কাপড়ের নিচে সেটা ঢেকেঢুকে রেখেছে।

সীতা বলে, অত ঘেন্না করতে নেই। গাঁয়ের মানুষ এমনি হয়ে থাকে—

বর করবি?

সীতা চিমটি কাটে। চুপ! শুনতে পেলে কি ভাববে?

সরে এসে রেলিঙের ধারে তারা দাঁড়াল।

তুই দিদি বাড়ির মধ্যে থেকেও বাড়ির লোক নোস। অমন খাতির করে খাওয়ানো দেখে ধরতে পারলি নে? পিশি ক্ষেপে উঠেছেন তোকে বিদেয় করবার জন্য।

তারপর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, হাসছিস না যে?

হাসবার কি হল? কথাটা সীতা অন্যভাবে ঘুরিয়ে নেয়, মানুষ দেখে হাসব—এমন দেমাক করবার মতো কি আছে আমার ভাই?

অনীতা বলে, কেন—রূপ? এই আমায় দেখিস তো? তোর চেহারা

আর গায়ের রঙের সিকিভাগও যদি পেতাম, ধরাকে সরার মতো পায়ের ধুলায় গুঁড়িয়ে বেড়াতাম। তাই বুঝেই ঈশ্বর ওদিক দিয়ে মেরে দিলেন।

সীতার মুখ তুলে ধরে পুঁথি পড়ার মতো তাকায়।

বুঝতে পারলাম, এ বর পছন্দ নয় তোর—

ম্লান হেসে সীতা বলে, আমি করব বর পছন্দ! তোর নিজের ভাগ্য দিয়ে বিচার করিস নে। হনুমান-জাম্বুমান যেই হোক, দয়া করে পছন্দ করলে বর্তে যাই—

জল টলটল করে উঠেছে চোখে। অনীতা তাড়াতাড়ি মুছিয়ে দিয়ে বলে, হনুমান বলেছি, সেই জন্য বুঝি? চেহারা যাই হোক, গুণ জানিস্‌ নে মুখপুড়ি? আধ ঘণ্টায় কড়া কড়া তিন অঙ্ক কষে ফেলেছে। তা বেশ, পাল্টে নে তবে অলকের সঙ্গে। আমার তো মজা—কলেজের অঙ্ক করে দেবে, বই-খাতা মোটে ছুঁতেই হবে না।

দেমাক করে বলে, বাজি রাখ তাহলে—আমি ভার নিচ্ছি, কি করে দিই মানুষটাকে। অলককে ছেড়ে ওরই দিকে তাকিয়ে থাকবি তখন।

সীতা বলে, কে তোর অলকবাবু, জানিই নে মোটে। তার দিকে আবার তাকাতে যাবো।

হাজার মানুষ বসে থাকলেও ললনামোহন সে মূর্তি নজর এড়ায় না। তাকাস কি তুই দশজনকে ডেকেডুকে সভাশোভন করে? হয়তো অন্য দিকে চেয়ে স্বভাবের শোভা দেখতে দেখতে তারই মধ্যে চুরি করলি এক ঝলক। কিম্বা কেউ কোন দিকে নেই—খড়খড়ির উপর চোখ দুটো রাখলি। কিন্তু তা-ও বলে রাখছি, এই গেঁয়ো মানুষটাকে নতুন সাজগোজে যেদিন লনের উপর দাঁড় করাবো সেদিন খড়খড়ি তোলা শুধু নয়—চুলে ফুল গুঁজে হারেম ভেঙে ফেলে লাফাতে লাফাতে ছুটে বেরুবি। তখন ঝগড়া হবে, ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেবো—আগে থাকতে বলে রাখছি।

খানিক পরে নিতান্ত নিরীহ ভালমানুষ হয়ে অনীতা ঘরে ঢুকল। খাওয়া সেরে মিহির আবার অঙ্কে মজেছে। কমলবাসিনী চলে গেছেন। তা গুণ থাকলে কি হবে—এ মানুষকে সীতা বলে কেন, কোন মেয়েই পছন্দ করবে

শ্যামবর হিসেবে। আমি এই এতক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে শব্দসাড়া করছি—আপনার মশায় বনে গিয়ে তপস্যা করা উচিত, ঈশ্বর লাভ হবে, সংসারে থেকে কিছু হবে না।

খাটো হয়ে অতএব এই তরফ থেকে কথা শুরু করা ছাড়া উপায় কি? খাতা টেনে নিয়ে অনীতা বলে, সব অঙ্ক হল কই? অনেক যে বাকি—

যেন দায়ঝক্কি তারই উপর, সমাধা না করায় ভারি এক অপরাধ হয়েছে—এমনি ভাবে মিহির বলে, সময় এইটুকু পেলাম। সেই কবে এসমস্ত করেছি—তারপরে কেমিস্ট্রিতে অনার্স ছিল, অঙ্ক বেশি আর করা হয় নি তো!

জুতো মসমস করে হিমাংশুর আবির্ভাব। দু-জনে তাকাল।

অনীতা বলে, বাবা, তুমি এর মধ্যে ফিরলে? অনেক অঙ্ক বাকি।

এর মধ্যে কি রে! দেরি হয়ে গেল আজ। প্রায় দশটা—

সঙ্গে সঙ্গে অনীতার আর এক মূর্তি। কেন আসবে তুমি দশটায়? বেশি রাতে খেলে অসুখ করে না?

মিহিরকে বলে, আপনি আসুন তবে। কাজের কথাবার্তা এত রাতে হবে কেমন করে? বাবার দেরি হয়ে গেছে।

মিহির আর কি করবে—উঠে দাঁড়াল অগত্যা। ভাগ্য ভালো এবারে—হিমাংশু এক নজরে চিনেছেন। মেয়েকে বলেন, আলাপ-সালাপ হয়েছে? সেই যে বলেছিলাম—জঙ্গিপাড়ার সেই ছেলেটা। বড্ড ভাল ছেলে রে—

মিহিরের দিকে চেয়ে অনীতা বলে দেয়, বাবা তুমি কাজ ঠিক করে দেবে বলেছ, সন্ধ্যে থেকে তাই বসে আছেন। নিচে মশায় কামড়াচ্ছিল বলে উপরে এনে বসিয়েছি—

হিমাংশু জিভ কাটলেন, এই রে:! মক্কেলগুলো আমায় শেষ করল—তাদের ঠেলায় কিছু আর মনে থাকে না।

অনীতা বলে, আচ্ছা এবারে আমি ভার নিচ্ছি—বাবাকে মনে করিয়ে দেবো। আপনি কাল আসবেন। করাবোই একটা-কিছু বাবাকে দিয়ে—

হিমাংশু বললেন, সেই ভাল, কালকে এসো। রাত হয়ে গেছে আজ।

মিহির ইতস্তত করছে।

হিমাংশু বলেন, আর কিছু দরকার আছে নাকি বাবা?

নিমন্ত্রণ করে তারপরে আর উচ্চবাচ্য নেই, এ বড় আচ্ছা মানুষ। মেসেও ভাত রাখতে মানা করে এসেছে। কিন্তু লজ্জা যেন মিহিরেরই। আমতা-আমতা করে বলে, জুতো পাচ্ছি নে—

অনীতা আশ্চর্য হয়ে বলে, সে কি? নিচে খুলে রেখে আসেন নি তো?

মিহির বলে, এইখানটায় খুলে চেয়ারে উবু হয়ে বসে অঙ্ক কষছিলাম। আমার ঠিক মনে আছে।

হিংমাংশু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, জুতো চুরি উপরের ঘর থেকে—সর্বনেশে কথা!

মিহির বলে, সে জুতোর চেহারা দেখে কিন্তু চোরের লোভ হবার কথা নয়—

অনীতা বলে, তবে নিশ্চয় কুকুর। তোমার টমি একবার কিন্তু এসেছিল বাবা। সে-ই মুখে করে নিয়ে গেছে।

দেখ্ দেখ্—

রাতেব বেলা এখন কি পাওযা যাবে? আমার স্লিপার পরে চলে যান। ঠিকানাটা দিয়ে দিন, সকালের দিকে খোঁজ করে ঝড়ুদাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো—

মিহির বলে, স্লিপার পায়ে চলব কেমন করে?

পরেই দেখুন না। আছাড় খাবেন না।

চলা হয়তো যাবে, কিন্তু এই কাপড়চোপড়ে ঐ জুতো পরে পথে বেরুলে চোর বলে তক্ষুনি হাজতে পুরবে।

খালি পায়ে সে নেমে গেল। অনীতা অবাক হয়ে আছে। চেহারা-বেশভুষা যেমন হোক, বাক্যের জৌলুষ খুব। ছেঁড়া বস্তায় খাসা চাল!

চেঁচিযে বলে দেয, সকাল সকাল আসবেন কাল। বাকি অঙ্কগুলো হবে। আর খেযে যাবেন এখান থেকে।

৩

নতুন জুতো কিনে পাঠাতে হল মিহিরকে; পুরানো জোড়া পাওয়া গেল না। জুতো পৌঁছে দিয়ে ঝড়ু ফিরে এসেছে। অনীতা বলে, কিছু বলল নাকি ঝড়ুদা?

ঝড়ু ঘাড় নাড়ে, চেয়েও দেখল না দিদিমণি। খ্যাংরা-কাঠির মতো গোঁফ আর একজন ছিলেন—তিনিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তারিফ করতে লাগলেন।

মনে করিয়ে দিয়ে এসেছ তো এখানে আসবার কথা? রাত্তিরে খাওয়া এখানে?

সমস্ত বলেছি—

কৌতুহল তবু ফুরোয় না অনীতার। বলে, কি করছিল তুমি যখন সেখানে গেলে?

ছাতে বসে কাপড়ে সাবান দিচ্ছিল।

অনীতা সবিস্ময়ে বলে, সাবান দিচ্ছে ছাতের উপরে কেন?

কলকাতায় জায়গা কোথা? মানুষ গিজগিজ করছে। মৌমাছির চাক বেঁধে থাকে দেখেছ দিদিমণি, অবিকল তাই। অন্ধকারে ভূতের মতো মানুষ ওঠানামা করছে—সিঁড়ি কাঁপছে ভূমিকম্পের মতন। যেমন ভাপসা গন্ধ, তেমনি অন্ধকার। আর কতকালের পুরোনো বাড়ি—ভয় করছিল, মানুষের ভারবোঝায় ভেঙে না পড়ে!

হিমাংশু কোর্ট থেকে এসে পিছনে দাঁড়িয়েছেন। ঐ করেন—মেয়ের সঙ্গে সর্বদা খেলা যেন তাঁর। পা টিপে টিপে এসে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন। কিম্বা বিনুনি ধরে দিলেন বা একটান। আজকে সে সব নয়। শান্ত মানুষটি পিছন থেকে সামনে চলে এলেন।

শোন্ বেবি, একটা কথা বলি। পাড়াগাঁয়ের ছেলে ওরা—খোলা-মেলায় মানুষ। বড্ড কষ্ট হচ্ছে বেচারির। আমাদের বাড়ি এসে থাকুক না।

অনীতা ঝেড়ে ফেলে দেয়, না—

না কেন রে? আমার কথায় সে কলকাতা এসেছে। এত ঘর রয়েছে—থাকুক এসে কয়েকটা দিন। ভাল জায়গা দেখে নিয়ে চলে যাবে।

অনীতা রাগ করে ওঠে, কি করে বলছ তুমি বাবা? জামার চারটে বোতাম চার সাইজের, কদমফুলি চুল ছাঁটা, আর জুতো—

রাগের মধ্যে সে হেসে ফেলল।

দেখনি তো সে জিনিস! ক্যাম্বিসের জুতো—কিন্তু রং কোনদিন সাদা ছিল, সে তোমার কিছুতে বিশ্বাস হবে না। তালি গোটা পনেরো,

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE LIBRARY 4794 11.4.58

নিচের রবার ক্ষয়ে ফুটো হয়ে গেছে। টমির অবধি মেজাজ বিগড়ে গেল, মুখে করে কোন তেপান্তরে ফেলে দিয়ে এসেছে। কত বড় বড় মক্কেল আসে তোমার কাছে—ভাবো দিকি, তাদের মাঝখানে এক গবুচন্দ্র ঘুরে বেড়াচ্ছে—

কমলবাসিনীকে ডেকে হিমাংশু বলেন, শুনে যাও কমল। কালকের সেই ছেলেটা—বেবি তাকে বলছে গবুচন্দ্র। বাইরেটা দেখেই ভেঙচি কাটে, ভিতরের গুণ চেয়ে দেখবে না? পাড়াগাঁর মানুষ হলেই অমনি করে। কিন্তু ওর বাপও একদিন যে পাড়াগাঁ থেকে শহরে এসে উঠেছিল, সেই কথাটা বুঝিয়ে দাও দিকি ভাল করে।

কমল জিভ কাটেন, ও কথা বোলো না দাদা। আমরাও তো পাড়াগেঁয়ে। কি করে আমাদের নিয়ে দেখতে পাও না? সীতাকে রাতদিন চোখে হারায়। বোন ছিল না, এখানে এসে সে ভালবাসার বোন পেয়ে গেছে। আমাকেও পিশিমা বলে বলে সুখ হয় না বুঝি—সময় সময় মা বলে ওঠে।

ভাল বললে অনীতা সহ্য করতে পারে না। ফুড়ুত করে পালাল। কাজে গেছে অবশ্য—বাপের ধুতি-পাঞ্জাবি-চটিজুতো আনতে।

কমলবাসিনী প্রশ্ন করেন, ছেলেটার উপাধি বলল 'দত্ত'—আমাদের জাতের তো? দত্ত আবার নানা রকমের হয় কি না।

কৌতুক-কণ্ঠে হিমাংশু বলেন, নজর পড়ে গেছে নাকি বেবির ঐ গবুচন্দ্রের উপর?

কমল বলেন, নরম-সরম ভাব—ঘাড় নিচু করে খাবার খাচ্ছিল, মুখই তোলে না। নামটা নেহাত অন্যায় দেয় নি। কিন্তু এর চেয়ে ভালো জুটছেই ব কোথা থেকে।

হিমাংশু উৎসাহভরে বলেন, ছেলের সম্বন্ধে আমি বলছি কমল, একেবারে হীরের টুকরা। তবে পাড়াগেঁয়ে গৃহস্থ—বীরেশ্বরের কাছে শুনেছিলাম, মোটা ভাত মোটা কাপড়টা জোটে। তা সত্যি সত্যি ইচ্ছে থাকে তো বলে দে—খোঁজখবর নিই ভাল করে।

কমলবাসিনী বলেন, ভাল ঘর-বর পাবে তো বাপকে খেয়ে বসে আছে কেন হতভাগী? সর্বস্ব ছেড়ে এমন করে আমাদের চলে আসতেই বা হবে কেন

অনীতা হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়ে কোন দিক থেকে। জিজ্ঞাসা করি—দিদি তোমাদের কত খায়, কতখানি জায়গা জুড়ে শোয়, যে যাকে দেখবে তারই ঘাড়ে গছিয়ে দিতে চাও। এখন ছোট্টটি নয়—সে মনে করে, বাড়িসুদ্ধ সকলের ভার-বোঝা হয়ে পড়েছে।

হিংমাশু এতটুকু হয়ে যান। আমি কি করব বেবি? মেয়ের মা হল কমল, সে-ই যখন বলছে—

মেয়ের বোন হলাম আমি। আমায় বাদ দিয়ে ভাইবোনে যতই ষড়যন্ত্র করো—দেখা যাবে, কেমন করে তোমরা দিদিকে ধাপধাড়া গাঁয়ের বনবাসে পাঠাও?

বিপন্ন বোধ করছেন হিমাংশু। মেয়েটা কেন জানি ক্ষেপে আছে মিহিরের উপর—অথচ সে বেচারা কত খাটনি খেটে কাল অঙ্ক কষে দিচ্ছিল। কথা কাটাকাটি করতে গেলে ক্লাবে যাবার দেরি হবে—ঠাণ্ডা করবার অভিপ্রায়ে তাই বললেন, সে এখন কোথায় কি। কমলই তুলল কথাটা, আমি তো কিছু বলি নি? এ বাড়িতে কোন কাজটা তোকে বাদ দিয়ে হয়?

বলতে বলতে অভিমান ছাপিয়ে ওঠে বুড়ো বাপের কণ্ঠে।

নামেই আমি কর্তা। নইলে তুই তো সব। এক বিন্দু গ্রাহ্য করিস? বাড়িসুদ্ধ সকলকে ওঠ-বোস করাচ্ছিস দিনরাত—

অনীতা গালে হাত দিয়ে বলে, কখন? মিথ্যে করে বোলো না বাবা। আমি বলে ভয়ে মরি সকলকার, সকলের হুকুম তালিম করে করে বেড়াই—

ভয় করিস তুই? বলিস নে, আর বলিস নে। হাসছে ঐ দেখ কমল।

অনীতা বলে, কি বকুনিটা দিলে আমায় ফার্স্ট-ইয়ার পরীক্ষায় অঙ্কে ফেল করেছি বলে—

ফেল হলে কিছু বলতাম না। পরীক্ষায় বসলি নে তুই মোটে—

না পারলে বসে কি হবে?

পারিস কি না পারিস—ফুরসত ছিল ভেবে দেখবার? বিশ রকম হুজুগ—আজ নাচ, কাল গান-জলসা, পরশু সাঁতারের কম্পিটিশন, তরশু থিয়েটার—খাওয়াদাওয়া পড়াশুনো সমস্ত গোল্লায় গেছে। কোর্টে পড়ে থাকলে কি হয়, সকল খবর নখদর্পণে। দোষ না করলে আমি বকি নে।

অনীতা কমলবাসিনীর দিকে তাকায়। বিশ্বাসঘাতক তিনিই নিশ্চয়। ঝগড়ায় অতএব সুবিধে হবে না। তখন আর এক পথ নিল। হুকুমের ভঙ্গিতে গম্ভীর কণ্ঠে বলে, চেয়ারে বসে পড়ো—

কেন ?

সকালবেলার জুতো-মোজা পরে আছ—ছাড়তে হবে না ? পোশাক বদলাবে না ?

সে আমি করব—

অনীতার নিজের এক্তিয়ার, সে তাড়া দিয়ে ওঠে, না—কিছু করবে না তুমি যার কাজ তাকে করতে দাও। সেই কোন্ সকালে কোর্টে গেছেন, সারাদিন খাটলেন—খাটনির তবু সাধ মেটে না।

বসতে হল চেয়ারে পা ছড়িয়ে। মেজেয় হাঁটু গেড়ে বসে অনীতা জুতোর ফিতে খোলে। জুতো—তারপরে মোজা। কোট-প্যাণ্টলুন ছেড়ে হিমাংশু ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ভদ্রলোক হলেন এতক্ষণে। আঃ—বলে মনের সুখে এইবারে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। কিন্তু শেষ হয় নি— সীতা খাবারের থালা হাতে করে এসেছে, মোহিনী ঠাঁই করে দিল, জল গড়িয়ে আনল অনীতা।

বোসো—

খেতে খেতে হিমাংশু বলেন, মেয়েটা তো খালি হুকুম তামিল করে বেড়ায় নিজে কিছু নয়—কাউকে বকা-ঝকা করে না—

দোষ না করলে বকি নে। না বকলে কাপড় ছাড়ানো যেতে তোমায় দিয়ে ?

তা বেশ হয়েছে—দোষঘাট করেছি, বকুনিও খেয়েছি। শোধ-বোধ হয়ে গেল। এবারে যা দিকি তুই। বেলা পড়ে গেল, ঘরের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা ঠিক নয়। এতে স্বাস্থ্য খারাপ হয়।

তা বুঝেছি। আমি গেলে তুমিও সরে পড়তে পারো। কাজকর্ম সারা হোক তার পরে যাবো—

আবার কি ? খেয়েদেয়ে আমি তো ক্লাবে চলে যাচ্ছি—

গেলেই হল! খাওয়ার পর বসবে খানিক। কলকেয় তামাক দিয়েছি টিকে ধরিয়ে দেবো আমি—

হিমাংশু বলেন, না রে, হাঙ্গামে যাস নে। তামাকের কি দরকার এখন ?

অনীতা শাসন করে, ঐ যে দাবার নেশায় ধরেছে—ক্লাবে গিয়ে দাবায় বসতে পারলে হল—খাওয়াদাওয়া আরাম-বিরাম কোন-কিছুর দরকার নেই! অমন করলে ক্লাবেই আর যাওয়া চলবে না। লনে নেট খাটিয়ে ব্যাডমিণ্টন খেলব দু-জনে।

সভয়ে হিমাংশু বলেন, আমায় কেন রে ? বুড়োমানুষ—আমার কি আর ছুটোছুটির শক্তি আছে ?

দিশা না পেয়ে অনীতাদের থিয়েটারের কথা তুললেন। আচ্ছা, তোদের রিহার্সাল বিকালবেলা হতে পারে না ? কলেজে এ সময়টা অসুবিধা হলে আমাদের বাড়ি তো করতে পারিস।

অনীতা বলে, রিহার্সাল একজন-দুজনের ব্যাপার নয়। ক্লাস থাকে—এখন সকলে জুটবে কেমন করে ? আর কলেজের ব্যাপার বাড়িতেই বা হতে দেবে কেন ?

ফিক করে হেসে ফেলল।

বলছিলে বাবা যে বিকালে ঘরের মধ্যে থাকলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়, রিহার্সাল তবে কি মাঠে করতে বলো ?

রীতিমত কোণঠাসা করে ফেলেছে। হেন কালে ভগবান করুণা করলেন। দরজায় অলক—ছোকরা-ব্যারিস্টার, প্রায়ই আসে।

হিমাংশু বলে উঠলেন, কাল আবার এক চিঠি পেয়েছি তোমার বাবার। এটর্নি দু-এক বন্ধুকে বলেছিও তোমার কথা। দেশের অবস্থা খারাপ—নিতান্ত দায়ে না পড়লে লোকে হাইকোর্টের দালান মাড়ায় না। তা ছেড়ো না তুমি আসাযাওয়া—

অলক ছাই শুনছে তাঁর কথা। টিকে ধরে উঠেছে কলকেয়, অনীতা মেজেয় বসে ফুঁ দিচ্ছে—আগুনের আভায় মুখ রক্তাভ হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। দেখছে অলক। একটু বা নজর ফেরায়, আবার দেখে।

হিমাংশু বলে চলেছেন, এ লাইনে খুব ধৈর্য ধরে পড়ে থাকতে হয়। একবার জমে গেলে তখন লাঠি পিটেও মক্কেল ভাগানো যায় না।

হঠাৎ বললেন, খেলাধুলো জানা আছে তোমার ?

অলক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। ধৈর্য ধরে খেলাধুলোয় লেগে পড়লে তবে কি মক্কেল আসবে ?

বেবি ব্যাডমিণ্টন খেলত, তা পার্টনারের অভাবে বন্ধ। বিকালে মাঝে মাঝে এসে খেলাধুলো করলে তো পারো! শরীর না গড়ে তুললে এর পরে ভূতের খাটনি খাটবে কি করে ?

ছেলেটা বিনয়ী। বলে, নিশ্চয় আসব—আপনি যখন আদেশ করছেন। রোজই আসব।

আড়চোখে তাকায় অনীতার দিকে। বাবার কাণ্ড দেখে অনীতা হাসছে। মন আকুলি-বিকুলি করছে ক্লাবে যাবার জন্য—খেলায় বা যা-হোক কোন ব্যাপারে লাগিয়ে দিয়ে সরে পড়তে চান। ডুবতে গিয়ে মানুষ ঘাসের চাপড়াও এঁটে ধরে—অলককে তাই এমন ধরাপাড়া।

৪

খেলে অলক ভালই। উৎসাহ ততোধিক প্রচণ্ড। বলে, শুভস্য শীঘ্রম্ —গুরুজন বলে গেলেন, দেরি করা কিছু নয়। আজ থেকেই।

তোড়জোড় করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তাতে কি হয়েছে ? জ্যোৎস্না রাত—ফুটফুট করছে দিনমানের মতো। চলে আসুন—

কিন্তু দু-জনে জমে না। সীতাটা যে এক নম্বরের ঘরকুণো! কিম্বা রূপের আগুনে পতঙ্গেরা ঝলসে পুড়ে মরবে—করুণারূপিণী ঘরের বার হন না তাই। অলকও শেষটা মিইয়ে পড়ে, কি হল আপনার অনীতা দেবী ? হাত মোটে চলছে না—

অনেক দিন এ পাঠ নেই তো—

অভিমান-ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে অলক বলে, মন নেই আপনার খেলায়।

মনের অপরাধ কি—রাত হয়ে গেল, মিহির আসছে না কেন এখনো ? ঝড়ুও ভুলবার ব্যাপার নয়—মনে করিয়ে দিয়ে এসেছে আর একবার। কালকে সেই সর্বনেশে ঘোষের ক্লাস। যদি না আসে মিহির ? একবার

ভেবেছিল সহপাঠিনী কারো খাতা নিয়ে এসে টুকে নেবে, কিন্তু মিহিরের ভরসায় থেকে শেষ পর্যন্ত সে তালে যায় নি। মাঝ-দরিয়ায় এখন যে ভরা-ডুবির জোগাড়! ছুনিয়ায় মানুষ এমনি বটে—কারও উপর আস্থা করবার জো নেই। অঙ্ক হয় নি বলে মাথা হেঁট করে দাঁড়াবে তো ক্লাসের মধ্যে—কিন্তু ঘাট মানলেই ছেড়ে দেবার পাত্র নন প্রফেসর ঘোষ। মুখে মুখে ধরবেন। ছি-ছি, নিউটনের ল তিনটে জানো না—মাতব্বরির জন্তেই বুঝি কলেজে নাম টেনে বেড়াচ্ছ? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। তার প্রতিষ্ঠায় মেয়েরা জলেপুড়ে মরে—হাসবে তারা, মনে মনে বড় সুখ পাবে। সে দুর্গতি ভাবতে গিয়ে অনীতার মাথা ঘুরে উঠেছে—খেলায় হাত চলে কেমন করে?

অলক বলে, থাকুক এই অবধি। পয়লা দিনে আর নয়, গা ব্যথা হবে।

বারাণ্ডায় গোলটেবিলের ধারে বসেছে। অনীতা ক্ষণে ক্ষণে পথ তাকায়। বলে, খেলেন তো আপনি অতি চমৎকার—অঙ্ক কষতে পারেন? জলের মতো স্টাটিকসের কয়েকটা অঙ্ক—তাই নিয়ে বিপাকে পড়ে গেছি।

অলক হেসে পড়ে, সাদামাটা যোগ-বিয়োগগুলোই এখন অবধি রপ্ত হল না। জ্যামিতি মুখস্থ করে কোন গতিকে ম্যাট্রিকের তিরিশটা নম্বর আদায় করেছিলাম—

উল্লসিত হয়ে বলে, আপনারও অঙ্ক আসে না? বাঃ, বাঃ! সকল দিক দিয়ে আমাদের আশ্চর্য মিল।

সে সুরে কিন্তু অনীতা যোগ দিল না। বলে, অঙ্ক আসবে না কেন? খুবই ভাল বুঝি আমি। মুশকিল হয়েছে, ফার্স্ট ইয়ারে ঋষিতুল্য এক প্রফেসর ছিলেন—তাঁকে ফাঁকি দিয়ে এসেছি, এবারে সেই জায়গায় এসে পড়েছেন দুঁদে একজন—

দু-চারটে ভদ্রতা-মাফিক কথা ও একটুখানি হাসিতে দায় সেরে অনীতা উঠে গেল। এলো না আজকে—গেঁয়ো মানুষদের একটু যদি দায়িত্ববোধ থাকে!

ভ্রূ কুঁচকে সে অঙ্ক ভাবছে একমনা হয়ে, পেন্সিল ঠোঁটের পাশে ছোঁয়ানো। ঝন্টু বলে, এসে গেছেন—

অনীতা লাফিয়ে ওঠে। উঁহু, অসহায় ভাবটা বাইরে দেখানো হবে না।

ঝড়ুই বা কি ভাববে? নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, নিচে বসিয়ে এলে কেন ঝড়ুদা? আসতে বলো।

নিয়েই এসেছে মিহিরকে। খালি পায়ে বলে শব্দ পায় নি।

অনীতা বলে, ঝড়ু জুতো দিয়ে আসে নি আপনাকে?

এই যে—বলে মিহির কাগজে জড়ানো জুতোজোড়া একদিকে রেখে দিল।

অনীতা কালো মুখ করে বলে, আমাদের বাড়ি থেকে খোওয়া গেছে, তাই নতুন কিনে পাঠানো হল। নেবেন না বুঝি?

মিহির বলে, গরজ বড বালাই। কলকাতার পথে এমনি হাঁটা যায় না—জুতো নিশ্চয় চাই। দামটা বলে দেবেন। কিন্তু বদল করতে হবে, আপনাদের ঐ জুতো পায়ে বড হয়ে যাচ্ছে।

অনীতা বলে, এমন তো কথা নয়—

তা সত্যি। ঠিক সেই পুরানো জুতোর মাপ। সেটা আমার নয়, আমার জেঠতুত ভায়ের বাতিল জুতো তালিতুলি দিয়ে এনেছিলাম। কিন্তু নতুন যখন কেনা হল, ঢলঢলে জুতো কেন পরতে যাবো? ধুলোমাটি লাগলে বদল হবে না, সেইজন্যে কাগজে জডিয়ে এনেছি।

চেয়ারে বসে পড়ে হাসিমুখে অনীতার দিকে চেয়ে বলে, কিন্তু সব চেয়ে ভাল হয়—যে-কুকুর জুতো নিয়ে গেছে, তার কাছ থেকে চেয়েচিন্তে পুরানো জোড়াই এনে দেন যদি। দু-চার মাস বেশ চলে যাবে সে জুতোয়।

রাগে অনীতার ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বালা করে। চেহারায় ভাল মানুষ, মুখের দিকে চেয়ে দেখ—হাসির লেশমাত্র নেই, কথায় কিন্তু ক্ষুরের ধার। পাকে-প্রকারে তাকেই কুকুর বলছে নাকি?

তা অপমান যাই করুক, লেখাপড়া সত্যি শিখেছে। টপাটপ অঙ্ক হয়ে যাচ্ছে। ভাবতে হয় না, যেন মুখস্থ-করা, তার সঙ্গে যুক্তি করেই যে অঙ্কগুলো বানানো। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে এলো। অনীতা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে।

ভেবেছিলাম, আপনি বুঝি আর এলেন না—

সর্বশেষ অঙ্কটার উত্তর মিলিয়ে দেখে খুশি হয়ে মিহির মুখ তুলল।

কেন?

এত করে বলেছিলাম, সকাল সকাল আসবেন। তাইতে বুঝি এত দেরি!

মিহির বলে, খাওয়াদাওয়ার ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে এলাম একেবারে। মেসের ব্যাপার—শেষেটা ফ্যান-মেশানো ডাল ছাড়া আর কিছু থাকে না।

সে কি! আমি যে নেমন্তন্ন করেছিলাম!

মিহির চুপ করে থাকে।

অনীতা ক্ষেপে ওঠে, খাবেন না এখানে? খেলে অপমান হত?

আমার মনে ছিল না—

অশ্রুর আভাস অনীতার কণ্ঠে।

আমি এত করে বললাম, আর মনে রইল না আপনার। কি মনে করেন আপনি অন্য-সকলকে?

জবাব দিতে গিয়ে একটুখানি বুঝি দ্বিধা করে মিহির। কালকের রাতটা একেবারে অনাহারে গেছে। কথায় তবু উত্তাপ মাত্র নেই, ধীর স্বরে বলে, রাগ করবেন না। ভুল সকলেরই হয়। আমার হতে পারে, আপনাদেরও—

কখন হিমাংশু এসে দাঁড়িয়েছেন, দেখে নি এরা। তিনি বলে উঠলেন, তাইতো রে বেবি, আমিও যে কাল মিহিরকে নেমন্তন্ন করেছিলাম। হুঁ, ঠিক তাই। সেই জন্যেই এসে বসে ছিল—অথচ মুখ ফুটে কিছু বলল না। ছি-ছি-ছি—

অনীতার উপর হুমকি দিয়ে উঠলেন, নেমন্তন্ন খেতে এসে বেচারা বাড়ি থেকে শুধু-মুখে ফিরে গেল। তোরাই বা কেমন—কোন-কিছু খেয়াল রাখিস নে।

মিহির কি করবে ভেবে পায় না। অপরাধ তারই যেন, কালকের কথা কেন সে ঠারেঠোরে বলতে গেল? অনীতার কিন্তু হাসিমুখ। নিমন্ত্রণের ব্যাপার হিমাংশু ঘুণাক্ষরে কাউকে জানান নি, কিন্তু সে কথা বলতে গেলে আরও বেজার হবেন। হাসিমুখে অনীতা ঘাট মেনে নেয়।

আমার দোষ বাবা। কিন্তু উনিই বা চুপচাপ ফিরে গেলেন কোন বিবেচনায়? আমি হলে ঝগড়া করতাম, না খেয়ে নড়তাম না কিছুতে—

সবাই তোর মত ঝগড়াটে নয়। মিহির হল শান্তশিষ্ট ভাল ছেলে। জজিপাড়ায় তিন দিন ছিলাম, মুখে রা কাড়তে শুনি নি।

অনীতা সন্ধিস্থাপনা করে, যাকগে যাকগে। আমরা নেমন্তন্ন করে ভুলে গিয়েছিলাম, উনিও আমার নেমন্তন্ন ভুলেছেন। কাটাকাটি হয়ে গেল। উঠুন এবারে মিহিরবাবু—

খেয়ে এসেছি যে বললাম—

বাবা নেমন্তন্ন করেছিলেন, সেইটে খেয়ে যান। আমি বাজে লোক—আমারটা নয়। বলুন তবে, রাখবেন না বাবার কথা?

খেতে খেতে একবার মরীয়া হয়ে মিহির বলে, খোঁজখবর হল কিছু?

হিমাংশু না বলতেই অনীতা ফোঁস করে ওঠে, কিসের খোঁজখবর?

সেই যে একটা কাজের কথা হচ্ছিল। আজকেও ভুলে গেছেন বোধ হয়।

ব্যাপার তাই বটে। হিমাংশু মুখ ফেরালেন। অনীতা কিন্তু গায়ে পড়তে দেয় না। বলে, কিছু ভোলেন না আমার বাবা। কাজ তো হয়েছে আপনার। ক'টা করবেন?

মিহির পুলকিত হয়ে বলে, আমি তো জানিনে স্যর। কোথায় হল?

এই যে আমায় পড়াচ্ছেন। তাই নয় বাবা? ফাইন্যাল এবারে, চালাকি নয়—তোমার মুখ্যু মেয়েকে অঙ্কে পাশ করানো এই মাস্টার ছাড়া হবে না। তাই তো বলছিলে তখন তুমি।

মিহির আশ্চর্য হয়ে বলে, এঁকে পড়াব—তাই হতে পারে কখনো?

ঠোঁট ফুলিয়ে অনীতা বলে, তার মানে, বুঝলে তো বাবা, স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেওয়া—মেয়েটা ফেল হয়ে যাক, উনি কিছু করতে পারবেন না। এর পরে কি বলতে চাও, বলো তুমি—

হিমাংশু অথই জলে। বলতে হয়—তাই যেন বললেন, বীরেশ্বর মোক্তারের মেয়েকে তো পড়াতে আমি দেখে এসেছি।

সে হল এক রত্তি এক খুকি—

হিমাংশু চটেছেন এবারে।

আর বেবিকে বুঝি আদ্যিকালের বুড়ি ভেবেছ? আঠার দিনের মেয়ে রেখে ওর মা চোখ বুজল—এই তো, সেদিনের কথা! চোখ বুজলে এখনো আমি দেখতে পাই।

অনীতা ফোড়ন কাটে, বুঝলে বাবা, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কম কিনা—তাই

ঝামেলাটা পোয়াতে চাচ্ছেন না। সেই তখন তুমি বলছিলে, জজিপাড়ার মতো ওঁছা কলেজ থেকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়, এম. এস-সি. তাকে পড়তেই হবে; বার-লাইব্রেরির বাজে চাকরি দিয়ে তার সর্বনাশ করা হবে না।

অধীর হয়ে সে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, কিছু যে বলছ না বাবা? বাড়ির কর্তা তুমি—তোমার মুখ থেকে না শুনলে ভাববেন, মেয়েটা মনগড়া কথা বলছে। যা বলবার সোজাসুজি বলে দাও। নইলে আমার নামে দোষ পড়বে।

কর্তা হিমাংশুকে অতএব বলতে হয়, হ্যাঁ বাবা, তাই—

আর এখানে এসে থাকবেন উনি। নইলে আমার পড়া হবে না। তুমিই বলছিলে—এখন একেবারে চুপ করে আছ।

এবারে আদেশের সুরে হিমাংশু বলেন, চলে এসো মিহির—আমি বলছি। আমার ঘরবাড়ি রয়েছে, আর তুমি যেখানে-সেখানে পড়ে থাকবে—সেটা হবে না। এসে চটপট ভর্তি হয়ে পড়ো।

মেয়ের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, বেবির অত্যাচারে আমরা থরহরি কম্পমান। জব্দ করো দিকি ওটাকে—তবে বলব বাহাদুর!

৫

কমলবাসিনীর কাছে এসে অনীতা বলে, তোমার যে এক পুষ্যি বাড়ল পিশিমা। বাবার কাণ্ড, মাস্টারকে বাড়ি এনে তুলছেন। কথাবার্তা হয়ে গেল—কোন ঘরটা ছেড়ে দেবে, এবার ঠিক করে ফেল।

হেসে বলে, বিয়ের পরে লোকে ঘরজামাই হয়—তোমার বেহায়া জামাই বিয়ের আগেই এসে উঠছে। তা ভালই হবে দিনরাত চোখের উপরে থাকলে। দেখেশুনে বাজিয়ে নিতে পারবে।

কমল বিরস মুখে বলেন, মেস থেকে তাড়িয়ে ফুটপাথে নামিয়ে দিয়েছে নাকি? বাজিয়ে নেবার কথা বলছিস—ভিক্ষের চাল আবার কাঁড়া আর আকাঁড়া! সু-কথায় সমস্ত সেদিন জেনে নিয়েছি। যার কিছু আছে, সে কেন

আসবে অনাথিনীর মেয়ে নিতে ? দেখে শুনে জামাই আনব তো এত থাকতে পথের ভিখারি হয়ে চলে আসব কেন ?

অনীতার রাগ হয়ে যায়।

আসছেন তিনি নিজের ইচ্ছেয় নয়। বাবা-ই বলে-কয়ে কাতর হয়ে নিয়ে আসছেন নিজের হাঁদা মেয়ের এগজামিনের কথা ভেবে। এত খুঁতখুঁতানি থাকে তো দেবে কেন বিয়ে ? ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট—এম. এস-সি.-তেও নিশ্চয় অমনি কিছু হবেন। কত দিকে কত সুযোগ আসবে জীবনে। আমরা তো ছার—আমরা কাছে দাঁড়াতে পারি নে, তেমনি সব মানুষ বর্তে যাবে অমন জামাই পেলে।

রাগ দেখে কমলবাসিনী অবাক হয়ে বললেন, ভাবনা-চিন্তায় আমার মাথার ঠিক থাকে না মা, নানান কথা বলে ফেলি। দাদাই কায়দা করে বাড়ি নিয়ে আসছেন, বুঝতে পারছি। সম্বন্ধটা যাতে গেঁথে যায়। তোমাদের ঋণ ইহজন্মে শোধ হবে না। কিন্তু এমন কি কথা হল মা, যে তুমি অমন ক্ষেপে উঠলে ?, তুমিও তো ওকে নিয়ে কত কুচ্ছো করছিলে।

অনীতার লজ্জা করছে এখন। পিশি খুব দুঃখ পেয়েছেন—'তুই' থেকে সেইজন্য 'তুমি'। হেসে উঠে সামলে নেবার ভাবে বলে, রাগ হবে না ? এখন যে আমার মাস্টার মশায়—তোমরাই বলে থাকো গুরুকে ভক্তি করতে। সত্যি পিশিমা, এমন হাবাগবা মানুষ—কিন্তু ঘোড়দৌড়ের মতো দুড়দাড় আমার অঙ্ক কষে দেন।

কমলের সামনে থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে বাঁচে। ঘর একটা তো গোছগাছ করে রাখতে হয়! তাড়া নেই অবশ্য, হুজুরের শুভাগমনের হপ্তাখানেক দেরি। দেশে গিয়েছে, ফিরে এসে সায়ান্স-কলেজে ভর্তি হবে, এ বাড়ি এসে উঠবে সেই সময়। কি কারণে হঠাৎ মাতৃদর্শনের অভিলাষ, অনুমানে বোঝা যাচ্ছে। যেন-তেন গতিকে ভর্তির টাকার যোগাড় করা। টনটনে আত্মসম্মান—সাহায্য নেওয়া চলবে না কারো কাছ থেকে। অনীতাদের এখানে থাকতে রাজি হল—অনীতার মাস্টার হয়ে আসছে সেইজন্য।

বাপের কাছে গিয়ে পড়ল অনীতা। তুমি তো হুকুম দিয়ে খালাস। কোন ঘরে থাকবে, ঠিক করে দাও এবারে—

হিমাংশু বলেন, উপরে নিচে এতগুলো ঘর রয়েছে, দেখে শুনে দে না একটা।

অনীতা হেসে বলে, বাইরের মানুষ—জানা নেই চেনা নেই—উপরে নিয়ে তুলতে বলো?

নিচের গোলঘরে হোক তবে—

তোমার লাইব্রেরি সেখানটা। বিশবার গিয়ে বই টানাটানি করবে, মাস্টার মশায়ের পড়াশোনার অসুবিধে হবে।

পাশের এই ছোট ঘরটা তবে সাফাই করে দিতে বল্—

ঝড়ু-দা এক তক্তাপোশ পেতে দখল করে আছে। সে না হয় হল—ঝড়ু-দাকে চিলেকোঠায় পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু অফিসঘরে তোমার মক্কেলদের আনাগোনা কাজকর্ম গণ্ডগোল—

হিমাংশু রাগ করে উঠেন, হ্যাঁ—গজ-কচ্ছপের লড়াই করি আমি মক্কেলদের সঙ্গে! একটা একটা করে কেটে দিচ্ছিস—কি বিষ নজরে দেখেছিস ছেলেটাকে, আসাটা যাতে পণ্ড হয়ে যায়!

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আহত কণ্ঠে অনীতা বলে, বেশ ঝড়ু-দাকে বলিগে তক্তাপোশ বের করে নিতে—

হিমাংশু বলেন, ঝড়ুকে আমার কাছে ডেকে দে। নয় তো আবার কোন্ চালাকি খেলবি তার সঙ্গে যুক্তি করে। মিহিরের ব্যাপারে তোকে একবিন্দু বিশ্বাস করি নে। চব্বিশ ঘণ্টার মাস্টার চাপিয়ে দিচ্ছি কিনা,—ফাঁকির আর জুত হবে না, ছটফটানি সেইজন্যে।

হো-হো করে তিনি হেসে উঠলেন।

কোর্ট থেকে ফিরতে আজ দেরি হয়ে গেছে। হিমাংশু পা টিপে টিপে লনের প্রান্তে বিপদের জায়গাটুকু পার হয়ে এলেন। না, মগ্ন হয়ে খেলছে ওরা, টের পায় নি।

পোশাক বদলালেন তাড়াতাড়ি, শব্দসাড়া না করে কমলবাসিনীর কাছে একেবারে ভাঁড়ারঘরে চলে এলেন।

কি আছে দাও শিগগির। আসন পাতছিস কেন রে মোহিনী? হাতে-হাতে দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে আরও ব্যস্ত হলেন।

ইস, আগুন হচ্ছে চাটুজ্জে। নথিপত্তোর গুছিয়ে রওনা হবো, সেই সময়টা এক মক্কেল এসে পাকড়াল। আমার মন এদিকে পড়ে—কে শুনছে তার কথা? তা সে কিছুতে ছাড়বে না। মক্কেলগুলোই মেরে ফেলবে আমায়—

কমল বলেন, কোর্ট আর ক্লাব নিয়ে আছ দাদা, সংসারের কোন দিকে ফিরে তাকাবে না। কোন-কিছু বললে কানেই নেবে না মোটে—

গোলমেলে প্রসঙ্গে হিমাংশু বিব্রত বোধ করেন। যা-ই হোক, খাবারগুলো শেষ করতে কিছু তো সময় লাগবে—ততক্ষণ আলোচনা চালানো যেতে পারে। কমল তাতে খুশি হবে।

কোন জিনিসটা তাকিয়ে দেখি নে, তোদের কোন্ কথা কানে নিই নে? মিথ্যে যা-হোক বলে দিলেই হল?

দেখ তবে ঐ তাকিয়ে—

জানলা দিয়ে কমলবাসিনী লনের দিকে আঙুল দেখালেন।

হিমাংশু আর চোখ ফেরাতে পারেন না। মুগ্ধ কণ্ঠে তারিফ করছেন, চেয়ে দেখ কমল—এই তো দিন সাতেক মাত্তোর খেলছে, কি সুন্দর হাত খুলে গেছে বেবির। অলককে নাকানি-চোবানি খাইয়ে দিচ্ছে।

পুলকিত হয়ে খুব হাসতে লাগলেন। কমল বলেন, কে বলো দিকি ঐ অলক?

অবনীর ছেলে। আমি আর অবনী প্রেসিডেন্সিতে এক সঙ্গে পড়তাম। সরকারি চাকরি নিয়ে সে দিল্লিতে। ছেলেটা হাইকোর্টে বেরুচ্ছে—ওকে দাঁড় করাবার জন্য যদ্দূর যা পারি, করতে হবে আমায়। অবনীর খাতিরে শুধু নয়—ছেলেটা সত্যি ভালো।

আবার জোর দিয়ে বলেন, ভারি সুশীল। সেদিন বললাম, মাঝে মাঝে এসে একটু-আধটু খেলা কোরো বেবির সঙ্গে। তা সেই থেকে, দেখতে পাচ্ছ, শতেক কাজ-ফেলে সন্ধ্যেবেলা চলে আসে।

কমল মুখ বাঁকিয়ে বলেন, কাজকর্ম আছে বলে তো ঠেকে না। চারটে বাজতে না বাজতেই হাজির। অনীতার তবু দু-দশ মিনিট দেরি হয় কলেজ থেকে ফিরতে। ও একেবারে ঘড়ির কাঁটা।

এ হেন নিয়মানুবর্তিতায় হিমাংশু উল্লাস আর ধরে রাখতে পারেন না।

বোঝ তবে! পিতৃবন্ধু বলে আমাকেও ঠিক বাপের মতন মান্য করে। ঐ যে বলে দিয়েছি—ঘড়ির কাঁটা হয়ে তাই করে চলেছে। এমন বাধ্য ছেলে ক'টা দেখতে পাও আজকাল ?

তারপর বললেন, সীতা .কাথায় রে? এমন আনন্দের মেলায় তাকে দেখতে পাচ্ছি নে—

সেলাইফোঁড়াই করছে।

হিমাংশু শিউরে ওঠেন, সন্ধ্যাবেলাটা ঘরের কোণে ঘাড গুঁজে বসে সেলাই করা—শরীর এতে ক'দিন টিকবে ? মা হয়ে কেমন করে যে তুমি আস্কারা দাও কমল! খেলাধুলো করা উচিত এ সময়টা—

আমাদের মেয়ের বল-খেলা চলে না দাদা। বললাম তো সেদিন—

হিমাংশু বিরক্ত হয়ে বললেন, আলবৎ চলে। কাল থেকে নামিয়ে দিও। শাটলকক, দেখো, অচল হয়ে থাকবে না। হয়েছে ভাল! সূর্যের মুখ দেখতে দেবে না, সকলের খাওয়ার পর উচ্ছিষ্ট এঁটোকাঁটা ববাদ্দ—মেয়েটাকে তুমি শেষ করে ছাড়বে।

কমল বললেন, কিন্তু আসল কথাটা কানে নিলে না। অলক যত ভাল ছেলেই হোক, এই রকম ঘড়ি-ঘড়ি আসাযাওয়া—

রুষ্ট কণ্ঠে হিমাংশু বলেন, ঐ সীতারই জন্যে। কষ্ট করে আসে সেই বালিগঞ্জ থেকে—নয় তো খেলাই হত না বেবির! আর মানুষ না পেয়ে তখন বুড়ো বাপকেই হয়তো লনে নিয়ে দাঁড় করাত।

আবার বলেন, মস্ত বড়লোক অলকরা—লেকরোডের বাড়িটা দেখলে অবাক হয়ে যাবে। ছেলেটা বাড়ি বয়ে আসছে—যত্নটত্ন কোরো কমল, রোজই যাতে আসে।

এই কথার এই জবাব! এ মানুষ কি করে যে নামজাদা উকিল হয়ে পয়সা রোজগার করেন, কমলের বুদ্ধিতে আসে না। দাবার নেশা—একটু-কিছু মুখে দিয়ে ক্লাবে ছুটতে পারলে হয়। মেয়ের সম্পর্কে এত বড় কথাটাও মনের মধ্যে নেবার সময় নেই।

কিন্তু যে ভয় করছিলেন হিমাংশু। সাড়ে-পাঁচটা বাজে, বাপের দেখা নেই।

তাই কেমন সন্দেহ হচ্ছে অনীতার। খেলা বন্ধ রেখে হঠাৎ সে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। এবং এসেছে ঠিক জায়গায়—

বাবা!

সিঁদের মুখে চোর ধরা পড়েছে, এমনি ভা হিমাংশুর চোখে-মুখে।

আমায় ডাকো নি কেন বাবা?

আমোদ করে খেলছিলি। ভাবলাম, হাঁকডাক করে খেলাটা মাটি করে দেবো?

কাল থেকে আর খেলছি নে—খেলায় ইতি। কলেজ থেকে এসে ফটকে দাঁড়িয়ে থাকব।

তা যাই ভাবো, মেয়ের তাড়নায় হিমাংশুর স্ফূর্তিও আছে মনে মনে। ক্লাবে যাবার জন্তে পাগল, সকলের ধারণা তাই। মেয়ের কাছে হেনস্তা দেখে কমলও ঐ মুখ টিপে হাসছেন। দাবাখেলা উত্তম বস্তু—তা বলে অনীতা বাপকে নিয়ে যে খেলা করে, তার মতন নয় কখনো। বসতে না বসতে দু-হাতে গলা জড়িয়ে ধরে, ছুটে গিয়ে কোঁচানো ধুতি বের করে আনে। হাত-মুখ ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরুলে তোয়ালে দিয়ে আরও পরিপাটি করে মুখ মুছিয়ে দেয়। বুরুশ-চিরুনি দিয়ে স্বল্পাবশেষ চুল ক'টির পরিচর্যা করে। এই ক'বছর আগেও অনীতা পুতুল খেলত—কলেজে ঢুকবার পর বন্ধ হয়েছে বোধ করি সঙ্গিনীদের কাছে লজ্জায় পড়বার ভয়ে। বাপকে নিয়ে সেই পুতুলখেলার সাধ মেটায়। তা মেয়ের হাতে অবোধ অসহায় পুতুল হয়ে থাকতে এত বড় ধুরন্ধর উকিল হিমাংশুর নিতান্ত মন্দ লাগে না।

কিন্তু বুড়ো বাপকে নিয়ে সমস্ত বেলাটা মাটি করবে, এই বা কি করে হয়? লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়াবার বয়স—তাই করুক। আহা, সর্ববঞ্চিতা মেয়েটি—আঠারো দিন বয়সে যে মা হারাল, এ জগতে পেয়েছে সে কি?

চারটে থেকে ফটক পাহারা দেবো বাবা। দেখি, কেমন করে তুমি লুকিয়ে আসো—

হিংমাংশু যেন শুনতে পাচ্ছেন না, ঘাড় হেঁট করে মনোযোগ সহকারে খেয়ে যাচ্ছেন। অপরাধী যখন, কথার মধ্যে যেতে নেই। কিন্তু ছাড়বে কি অনীতা?

হাত-মুখ ধুয়েছ ভাল করে? সাবান দিয়েছ?

হঁ—

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আপাদমস্তক পরীক্ষিত হচ্ছে, হিমাংশু চোখ না তুলেও টের পাচ্ছেন।

গেঞ্জি ওটা পরেছ কেন?

এ তো ভালো—

ভালো কি মন্দ—তুমি তার কি বোঝ? সকালে ওটা ছেড়ে গিয়েছিলে। নতুন-খোয়া গেঞ্জি বের করে আমি আলনায় রেখেছি—

সকালের গেঞ্জি পরলামই না হয় বিকালবেলা।

আর কোথায় যাবে। অনীতা আগুন হয়ে বলে, কেন ডাকো নি আমায়, তাই জিজ্ঞাসা করি। ময়লা নোংরা ঘামে-ভেজা—একেবারে বিষাক্ত হয়ে আছে। এই থেকে সাংঘাতিক একটা অসুখ বেধে যেতে পারে তা জানো?

হিমাংশু মরীয়া হয়ে বললেন, দেখ্—খাবার সময় ঝগড়া করবি তো এখনি আমি উঠে চলে যাবো।

এত সাহস বাপের নেই, অনীতা নিঃসংশয়ে বুঝে বসে আছে। তবু নীরব হল, খাওয়াটা শেষ হয়ে যাক। বাঘ শিকারের জন্য যেমন থাবা পেতে থাকে, তেমনি বসে রইল সামনে মেজের উপরে।

হিমাংশু বলেন, খেলা ছেড়ে চলে এলি, অলক আবার কি মনে করছে।

অনীতা হাঁক দেয়, মোহিনী—

মোহিনী এলে বলল, যে লোকটির সঙ্গে খেলা করছিলাম, তাকে চলে যেতে বল্। আর খেলা হবে না।

হিমাংশু তাড়া দেন, ছিঃ! খেলার কি যাচ্ছেতাই নেশা আমিও জানি কিছু-কিছু। সেই বালিগঞ্জ থেকে আসে—রাগ করবে।

রাগ? মোহিনী, বলে আয়—কাল থেকে যেন মোটেই না আসে।

এই শিক্ষা-দীক্ষা হচ্ছে?—অভদ্রতা করবে না।

থতমত খেয়ে অনীতা বলে, বাঃ রে, কথাই তো হয়ে গেল—কাল থেকে খেলা বন্ধ। আমি ফটকে থাকব—খেলা হবে তা হলে কি করে?

খাওয়া শেষ হয়েছিল। বাইরে এসে হিমাংশু অলককে ডাকলেন, শোন—

অলক ছুটে এসে দাঁড়াল। হিমাংশু বললেন, তোমাদের খেলায় বাধা পড়ে গেল বাবা। আলোর বন্দোবস্ত করে নিস রে বেবি—তা হলে সন্ধ্যের পরেও একটু খেলা হতে পারে। আজকে অবশ্য জ্যোৎস্না আছে—আলোর দরকার হবে না।

অলক তটস্থ হয়ে বলে, খেলা যথেষ্ট হয়েছে। বেশি খেলাধুলো ভালোও নয়—শরীর খারাপ করে।

অনীতাকে বলে, তা ছাড়া আজ তো আপনাদের মীটিং আছে কলেজে। শারদোৎসবের নাটক বাছাই—

অনীতা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, মীটিঙে যাবো কিনা ঠিক নেই। বাবা মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে।

হিংমাংশু বিপদ গণেন। যা অবস্থা—মেয়ে না গেলে তাঁরও যাওয়া ঘটবে কি? হাত ধরে তাকে কাছে টেনে নিয়ে আসেন।

বকাঝকা তোরই তো একতরফা বেবি। মেজাজ আমারই খারাপ হবার কথা—তা ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে তোর সামনে মেজাজ দেখাতে যাবো?

মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে ঠাণ্ডা করছেন। বলেন, সকলের বড় পাণ্ডা চলি তুই—মেয়েগুলো অথই জলে পড়ে যাবে, তুই যদি মীটিঙে না যাস। আমি বলি, আগেভাগে গিয়ে নাটকগুলোয় একবার চোখ বুলানো উচিত। তাই যা বেবি, অত লোকের আমোদ মাটি করতে নেই।

অনীতা তখন হেসে ফেলল।

তা বুঝেছি। সেই লোকের মধ্যে তুমিও একজন—

সকালবেলা কমলবাসিনী আবার সেই কথা তুললেন।

কিছু তো চেয়ে দেখবে না দাদা। ফেরা হয়েছে কাল অনেক রাতে।

নথিপত্রে ডুবে ছিলেন হিমাংশু। চোখ তুলে বললেন, রাত কোথা—দশটাও নয়। দু-জনে এক সঙ্গে খেলাম তো তার পরে—

কমল বলেন, তোমার অলক ছেলেটা সেই অবধি পিছন ধরে ছিল।

হিমাংশু বিরক্ত হয়ে বলেন, মেয়েটা রাত্রিবেলা একা-একা আসুক—এই তুমি চাও? চমৎকার!

একা আসতে যাবে কেন?

তার মানে, মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমিও কলেজে গিয়ে বসে থাকি? সারাদিন গাধার খাটনি খেটে ঐ যে ঘণ্টা দুই ক্লাবে গিয়ে জিরোই—তোমাদের সকলের নজর সেই দিকে।

লজ্জিত হয়ে কমল বলেন, তাই বলেছি নাকি? কিন্তু রাত্রে একা-একা আসে জোয়ান ছেলের সঙ্গে—

হিমাংশু কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, বুড়োথুথুড়ে লোক-দেখানো একটাকে না নিয়ে জোয়ান ছেলের সঙ্গে ঘোরে—ভালই তো! যা গুণ্ডা-বদমায়েসের উৎপাত—দরকার হলে দুটো-পাঁচটা ঘুষি মেরে সামাল দিতে পারবে।

কমল বলেন, আমিও তাই বলি দাদা, মেয়ের পাকাপাকি পাহারাদার করে দাও ঐ অলককে।

হিমাংশু গোড়ায় কথাটা বুঝে উঠতে পারেন না, সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। বুঝে ফেলে তারপর হো-হো করে হেসে ওঠেন।

মন্দ বলিস নি কমল। ভালো ছেলে সত্যিই—চেহারা, বিদ্যে, টাকাকড়ি সকল দিক দিয়ে। আর পরোপকারীও বটে, নইলে কি দায় পড়েছে কাজকর্ম ফেলে বেবির কলেজ অবধি গিয়ে বসে থাকা!

একটু ভেবে বলেন, কিন্তু ফস করে কথাটা পাড়া যায় বা কি করে? অবনী ভাববে, দেখেছ—ছেলেটার একটু দেখাশুনো করতে বলেছি, অমনি জো পেয়ে বসেছে। অবনী কলকাতায় আসব-আসব করছে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে—সেই সময়টা বরং ভাব বুঝে দেখা যাবে।

কমল বলেন, ভাব সবাই বোঝে, আর অত বড় বুদ্ধিমান হয়ে তুমিই কিছু বুঝতে পারো না! আজকালকার উপযুক্ত ছেলে—তার মতের বাইরে যাওয়া সাধ্য আছে বাপের?

অনীতা কম মেয়ে—আড়ি পেতে সমস্ত শুনে ফেলেছে। কমলবাসিনী ভিতরে যেতে তাঁকে গ্রেপ্তার করল।

পিশিমা, বাবার সঙ্গে কি ষড়যন্ত্র করছ?

কমলবাসিনী বোকা সেজে মৃদু মৃদু হাসেন।

কিসের গো?

অনীতা বলে,—আমি অবাধ্য বজ্জাত মেয়ে, তোমাদের কথা শুনি নে, রাত দুপুরে কলেজ থেকে ফিরি—

কমলও সেই সুরে বলেন, আর উঠতে বসতে শাসন করিস দাদাকে, কচি খোকার মতো দোলনায় তুলে রাখতে চাস—ভয়ঙ্কর রেগে গেছি আমরা এবার।

তাই বিদেয় করে দিয়ে বাড়ি ঠাণ্ডা করবার জোগাড় হচ্ছে।

ঝড়ু কি কাজে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। সে বলল, বাড়ি এমন ঠাণ্ডা হবে যে, তারপরে কেমন করে সকলে থাকব জানি নে—

অনেক দিনের লোক সে। হিমাংশুর পশার জমে উঠল, এই মেয়ে হল, স্ত্রী মারা গেলেন—সমস্ত চোখের উপর দেখেছে। ম্লান হেসে বলে, তা হলে বাবু ঠিক আইন-আদালত ছেড়ে দিদিমণির শ্বশুরবাড়ি উঠে বসবেন। সেকালে ঘরজামাই হত, উনি হবেন ঘর-শ্বশুর।

ব্যাপার তাই বটে! অনীতার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে বাপের সেই অবস্থা ভেবে। রাগ হয়ে যায়। বলে, আর যে এক থুবড়ো মেয়ে বাড়ির মধ্যে রয়েছে, তার ভাবনা আগে ভাবো। দিদি তো দু-বছরের বড় আমার চেয়ে। সে এমনি ঠাণ্ডা—বাড়িতে রয়েছে তা কেউ টের পাচ্ছে না, বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও জানা যাবে না।

কমল বলেন, কে নিতে যাচ্ছে তাকে?

নেয় না আবার! কত সুন্দর চেহারা,—চোখ মেলে দেখ নি কোন দিন? না, নিজের মেয়ে বলে বিনয় হচ্ছে?

কমল বলেন, সুন্দর আর কি—রং একটুখানি চড়া হতে পারে।

একটুখানি? জানো, আমি ওর পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারলে বর্তে যেতাম?

কমলবাসিনী ম্লান মুখ তুলে চাইলেন। সে যাই হোক মা, বিয়ের বাজারে তার কানাকড়ি দাম নেই—

অনীতা বলে, চেষ্টা করে দেখেছ কখনো? বাবাকে ঐ একবার কবে বলেছিলে, ওতেই হয়ে গেল। হাত-পা কোলে করে তোমরা কেবল নিশ্বাসই ছাড়ো পিশি—জলে না নেমেই বলো অথই সমুদ্দুর।

তা বটে! ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললেন কমল।

স্বামীর রোগজীর্ণ সেই চেহারা মনে পড়ে। জীবন স্তিমিত হয়ে আসছে, তখনো আশা—মেয়ের বিয়ে দিয়ে যাবেন। সেই মেয়ে নিয়ে শেষটা পরের ঘাড়ে চাপতে হয়েছে। এঁরা অবশ্য পর ভাবেন না—খাওয়া-পরা দিব্যি চলছে। কিন্তু মেয়ের বিয়েরও সুরাহা করে দেবেন, এতদূর ভাবা যায় না। কিসে কি হবে, কোথায় বা টাকাপয়সা—

কমল বলে উঠলেন, ভাবতে ভাবতে আমি পাগল হয়ে উঠি। আর হতভাগীর দেখছ না স্ফূর্তিতে গতর ফুলে উঠছে দিনকে দিন। মরতে পারলে বেঁচে যেতাম রাক্ষুসীর হাত থেকে।

আর নয়—অনীতা পালিয়েছে। দুঃখ কষ্টের কথা সে শুনতে পারে না। দুঃখ পায় মানুষে—সেই কথা শুনে আর একবার নতুন দুঃখ পাওয়া। দুমদুম করে সিঁড়ি ভেঙে পৃথিবীর দুঃখ-অশান্তি পদতলে যেন গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে সে উপরে যাচ্ছে।

আরে আরে, সিঁড়ির রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে দু-হাতের ভিতর মুখ ঢেকে সীতা। মুখ তুলে ধরতে সীতা ঝরঝর করে কেঁদে পড়ল।

এক রকম বিষ আছে শুনেছি—গলা দিয়ে যাওয়া অবধি সবুর সয় না। তাই একটু জোগাড় করে দিবি বোন, তোদের কলেজের ল্যাবরেটারি থেকে?

অনীতা বলে, পিশির কথা শোনা হয়েছে বুঝি? আড়ি-পাতা মহা পাপ। সংসারে এমনি এত জিনিস কানে আসে, তার উপরে আবার চেষ্টা-চরিত্র করে যদি শুনিস, চোখের জল কখন শুকোবে না দিদি।

আদর করে সে সীতার চোখ মুছিয়ে দিল। সীতা বলে, গলায় কলসি বেঁধে

জলে ঝাঁপিয়ে কিম্বা ছাত থেকে হাত-পা ছেড়ে লাফিয়ে পড়া যায়। কিন্তু সাহস পাই নে। মরে গেলে সমস্ত চুকেবুকে গেল, কিন্তু মরবার আগে যে কষ্ট—

অনীতা রুষ্ট হয়ে বলে, গলায় দড়ির চেয়ে যাতে শতগুণ কষ্ট সেই ব্যবস্থা করছি আমি, দাঁড়া! দড়ির সঙ্গে গলায় বেঁধে দেবো কলসি নয়, আড়াই-মণি এক বর। তবে মেয়ে তুমি সায়েস্তা হবে!

রবিবারে কলেজ নেই, কি করা যায়—মিহিরের জন্য তখন ঘর সাফ করতে লেগে গেল অনীতা। সে বড় চাট্টিখানি কথা নয়। ঝড়ু অত্যন্ত সতর্ক মানুষ—কোন বস্তু সে অবহেলায় ফেলে না। চাকরির পয়লা দিন থেকে যাবতীয় সঞ্চয় এই ছোট ঘরখানায় এনে পুরেছে। বছর ত্রিশেক আগে গায়ে দিত, সেই শতচ্ছিন্ন ফতুয়াটা অবধি। পোড়া-বিড়ির গোড়া-ই ঝাঁট দিয়ে ফেলা হল ঝুড়িখানেক।

শাড়ির আঁচল কোমরে ফেরতা-দেওয়া, নাকের উপর রুমাল বেড় দিয়ে বাঁধা—রণমূর্তিতে অনীতা ঝাঁটা চালাচ্ছে। মোহিনীকে দিয়ে বালতি বালতি জল আনিয়ে ঢালছে। কালো চুলে ধুলোয় ধুলোয় গোলাপি আভা ধরেছে, চোখের পল্লবে পর্যন্ত ধুলো। ঘণ্টা দুয়েক একটানা চলল এমনি। তারপর দু-হাত কোমরে দিয়ে ছাত থেকে মেঝে অবধি চতুর্দিকে দৃষ্টি চালনা করে। হাঁ—হয়েছে খানিকটা এতক্ষণে। জানালা-দরজায় কয়েকটা পর্দা আর দেয়ালে এক পোঁচ চুন টানা হলে মোটমুটি হয়ে যায়।

খুন করতে করতে শেষটা নাকি খুন চাপে, যাকে সামনে পাচ্ছি খুন করে ফেলি। তাই হল অনীতার। এ ঘরের কাজ হয়ে গেল তো হিমাংশুর অফিসঘরে গিয়ে হানা দিল।

বাইরে যাও বাবা, আর কত খাটবে? সেই সকাল থেকে একটা জায়গায় বসে—হাওয়া লাগাও একটু গায়ে।

হিমাংশু লিখছিলেন খসখস করে—ঘাড় তুলে চেয়ে বললেন, বেশ তো সাফসাফাই আছে রে!

এই যে, দেখতে পাচ্ছ না? এক কোণে একটু ঝুলের মতন—অনীতা সজোরে সেখানে ঝাঁটা মারে।

হিমাংশু বলেন, তা নিজে কেন তুই বেবি? ওরা সব কোথায়?

ওরাই রোজ ঝাঁটপাট দেয় এখানে। এই দেখলাম তো ওদের কাজের নমুনা—

আবদারের সুরে বলে, করে দিই না বাবা তোমার একটু কাজ! ধুলো উড়বে, তুমি ওঠো। বেলা হয়ে গেছে—চান সেরে নাওগে। রবিবার তা কি হয়েছে—রবিবারেও ঠিক-নিয়মে নাওয়া-খাওয়া করতে হবে।

অগত্যা উঠে পড়লেন হিমাংশু। পায়ে পায়ে উপরে চললেন। সেই ভাল—খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে একপিঠে হয়ে কাজে বসা যাবে।

এক প্রবীণ ব্যক্তি ঘরে ঢুকে বললেন, হিমাংশুবাবুর সঙ্গে দেখা করব।

অনীতা না তাকিয়ে জবাব দেয়, চান করছেন তিনি—তারপরে খাবেন-দাবেন। এখন নামবেন না।

ইতিমধ্যে ভদ্রলোক চেপে বসেছেন। অনীতার উপর খিঁচিয়ে উঠলেন, নামেন না নামেন আমি বুঝব। তুমি খবরটা দাও যে অলক মিত্তিরের মেসো এসেছেন—কথাবার্তা আছে। আর ওঁর মেয়েটিকে একবার দেখে যাবো, তা-ও বোলো—

অনীতাও রাগ করে বলে, মেয়ের মাথা ধরেছে—আসতে পারবে না।

মেসো রুষ্ট চোখে তাকালেন। ভারি আস্পর্ধা দেখছি। ফোড়ন না কেটে যা বললাম, সেই কথাগুলো বলে এসো তোমার বাবুকে—

ঝি মনে করেছে তাকে। চেহারায় যা দাঁড়িয়েছে, তাই বটে। বাপকে গিয়ে বলে, তোমার মেয়ে দেখতে এসেছে বাবা। মেয়ের কিন্তু মাথা ধরেছে, আমি বলে এসেছি।

হন্তদন্ত হয়ে হিমাংশু ছুটলেন। ঝাঁটা হাতে অনীতাও চলল পিছু পিছু।

হিমাংশু ধমক দিয়ে ওঠেন, তুই আবার কেন এই মূর্তিতে?

বাড়ির ঝি আমি যে বাবা। ঝিয়ের কি রাজনন্দিনী মূর্তি হবে?

হেসে শতখান হয়ে পড়ে মেয়েটা।

যাচ্ছি না তোমার ঘরে বাবা। হল তো। মাস্টার মশায়ের ঘরে ক'টা পর্দা লাগবে, সেইগুলোর মাপ নিতে যাচ্ছি।

খানিক পরে অনীতা ছুটতে ছুটতে সীতার কাছে এলো।

দিদি, বসে আছিস তুই। মস্ত খবর ওদিকে। বাবার কাছে এইমাত্তোর একটা লোক এসেছিল।

সীতা বলে, কতই তো আসে!

মক্কেল নয়। মক্কেলরা এসে বাবাকে টাকা দেয়—এ লোক এক কাঁড়ি টাকা খসাবে, তারই কায়দা করে গেল।

সীতা অবাক হয়ে তাকায়।

বুঝতে পারলি নে? আমি বাবার কালোকুচ্ছিৎ মেয়ে—টাকা দিলে ঘরে নেবে কেন? এসেছিলেন অলকের এক মেসো।

মুখ টিপে হেসে বলে, সম্বন্ধ ঐ তরফ থেকে আসছে—তার মানে অলক আছে এর ভিতর। নইলে আমি এক অবোলা মেয়ে পড়ে আছি—ওরা তার খোঁজ পায় কি করে?

সীতা বলে, তোকে দেখে ফেলে নি তো এই অবস্থায়?

দেখবে না কেন? বেশ কেমন পাউডার মাখা-মাখা ভাব—না রে? বারবার তাকিয়ে দেখছিল। আমি তখন পাশের ঘরে নিজের মনে পর্দার মাপ নিচ্ছি। সব কথা শুনে তো আসতে হবে! তুই যদি একটু একেলে বোন হতিস, বিয়ের কনেকে এই বেহায়াপনা করতে হয়?

সীতা জড়িয়ে ধরল ঐ ধুলোর বোঝা অনীতাকে। বুকের মধ্যে টেনে নিল।

পাকাপাকি হয়ে গেছে নাকি? সত্যি, আমি যেন কি! দোষ আমারই—দশের সঙ্গে কিছুতে মানিয়ে নিতে পারি নে।

অনীতা রাগ করে সীতাকে সরিয়ে দেয়।

এমন একটা খবর দিলাম, তুই মুখ ভার করলি কি জন্যে?

সীতা আকাশ থেকে পড়ে।

কোন চোখে দেখলি তুই অনীতা! ছি-ছি, মিছে কথা বলিস নে—

মুখ না হল, মন ভার বটে তো! মনে মনে সংসারের বিচারটা ভাবছিস। পটের পরী গড়াগড়ি যায়, আর বজ্জাত বিশ্রী মেয়েটাকে লুফে নিয়ে যাচ্ছে। তা দুঃখ করিস নে দিদি—নেবে পণের টাকা, হীরে-মুক্তোর গয়নাগাঁটি, মেয়েটা তার সঙ্গে ফাউ।

সীতা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। আহত কণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলে, কি মনে

কাঁদিস তুই আমায় ? তোর মতন করে কথা বলতে পারি নে, কিন্তু আজ আমার যে কি আনন্দ !

অনীতার সুর বদলে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

বলছি তো তাই, আনন্দে ডগমগ। আচ্ছা দিদি, একটা মানুষ চিরদিনের জন্য বিদায় হয়ে যাবে—বাড়ির কুকুর-বিড়ালটা গেলেও লোকে একবার 'আহা' বলে—তোরা আনন্দ করছিস! আমি কি কুকুর-বিড়ালের চেয়েও অধম ?

কণ্ঠ কেমন যেন হয়ে যায়, চোখে জল এসে গেল নাকি ? এর পরে কি বলবে, সীতা দিশা করতে পারে না।

অনীতা বলে, বেশ—আমিও দেখছি। আমায় সরিয়ে দিয়ে একেশ্বর হবি—আর আমায় না দেখে বাবা কাটা-কবুতরের মতো ছটফট করবে, সে আমি কিছুতে হতে দেবো না।

যেন ঝড় উঠিয়ে দিয়ে অনীতা চলে গেল।

গ্রাম থেকে মিহির ফিরেছে, ভর্তিও হয়েছে। একদিন বাক্স-বিছানা নিয়ে এসে পড়ল। ঘর দেখে সে বেঁকে বসে।

আরে সর্বনাশ, এখানে থাকতে পারব না আমি। কিছুতেই না।

অনীতার বিস্ময়-ভরা মুখের দিকে দৃষ্টি করে বলে, এমন ঝকঝকে-তকতকে পর্দা-আঁটা ঘরে মানুষ থাকতে পারে ? মনে হবে, দেয়ালের বাঁধানো ছবিগুলোর মতো আমিও ফ্রেমে-বাঁধা হয়ে আছি। পড়াশুনোর জন্য টেনে আনলেন—আর তা-ও জানি, পড়াশুনো আপনার নয়—আমার। আপনার জন্য ঢের ঢের ভালো টিউটর মেলে, আমায় এনে বাড়িতে জায়গা দিতে হয় না। কিন্তু পাশে রইল কর্তা মশায়ের অফিস—সব সময় আমায় আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হবে, মন খুলে গলা ছেড়ে পড়াশুনোও তো করতে পারব না !

অনীতা ভেবে দেখে। কিন্তু অন্য ঘরই বা কোথায় ? নিচে আর খালি ঘর নেই। বড্ড বিপদে ফেলেন আপনি।

ফটকের লাগোয়া সঙ্কীর্ণ এক কুঠুরি—দারোয়ান থাকার জন্য তৈরি বোধ

হয়, এখন ভাঙাচুরো আসবাবে বোঝাই হয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত সেই কুঠুরি পছন্দ হল। যে দরের মানুষ, পছন্দ সেই রকমের হবে তো!

মিহির বলে, নিরিবিলি চমৎকার জায়গা। পড়ে পড়ে গলা ফাটিয়ে ফেললেও আপনাদের ঘুমের ব্যাঘাত হবে না। পারেন তো একটা খাটিয়া দিয়ে দেবেন এই জানালার দিকে। না হলেও ক্ষতি নেই।

অনীতা বলে, আবার এই কাঠকুটোর পাহাড় সরাবেন আমাকে দিয়ে? কি ভয়ানক জেদ আপনার মাস্টার মশাই, দয়াধর্ম একেবারে নেই।

সেই ব্যবস্থা হল। অনীতার যা-ই হোক, মিহিরের পড়া ঘোরতর জমে উঠেছে। ছুটির পরেও ল্যাবরেটারির কাজ করে, নয় তো ডুবে থাকে লাইব্রেরিতে বইয়ের গাদার মধ্যে। সপ্তাহে তিন দিন অনীতা তার কাছে অঙ্ক কষে। রোজ নয়—তা হলে অন্য সমস্ত পড়বার সময় পাবে কখন? তা ঐ তিন দিনেরই ঠেলায় দিশেহারা হয়ে উঠেছে। সাংঘাতিক মাস্টার। ভূমিকম্প জলস্তম্ভ কিম্বা দাবানলে বিশ্বসংসার লয় হয়ে যাক—পড়ার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখ, মিহির ঠিক এসে বসে আছে। মানুষ কি ঘড়ির কাঁটা? এতেই আরও বিগড়ে যায় অনীতা। কথা কাটাকাটি লেগেই আছে। নিরেট দু-দুটো ঘণ্টা লোকে পড়ে কি করে—মাঝে মাঝে ঝগড়া করে ওর মধ্যে যেটুকু ফাঁক কাটানো যায়।

মাস দেড়েক কেটেছে। মানুষটার ভিন্ন এক চেহারা ফুটেছে এর মধ্যে। মুখে বাঁকা-বাঁকা কথা—ক্ষণে ক্ষণে গরম হয়ে ওঠে। সবাই অনীতাকে কত ভালবাসে, সকল জায়গায় তার প্রতিপত্তি—কিন্তু গেঁয়ো গোঁয়ারগোবিন্দটির কাছে খাতির-উপরোধ নেই। যা কখনো হয় নি—তাড়া খেয়ে এক এক সময় বুকের মধ্যে গুরগুর করে ওঠে। বাইরে অবশ্য ভড়কে যাবার মেয়ে নয়। আরও হাসে, বেপরোয়া ভাব দেখায়।

মিহির বলে, দেখুন—কিছু করতে পারব না আমি। পণ্ডশ্রম। ঠকিয়ে নিচ্ছি আপনাদের টাকা—

অনীতা অন্য দিক দিয়ে যায়, যাকে পড়ান, 'আপনি' বলছেন তাকে! এমন কেউ বলে না।

পড়াই না তো আপনাকে—

ঘাড় নেড়ে জোর দিয়ে মিহির বলে, পড়ানো বলবে না কেউ একে। পড়বার মতো ধৈর্য বা শ্রদ্ধা আপনার নেই। বলুন তো, একটা দিন কোন-কিছু বুঝিয়েছি আপনাকে, বুঝতে চেয়েছেন? কলেজের কাজগুলো আপনার হয়ে আমি করে দিয়ে যাই মাইনের বদলে। যেমন আপনাদের রাঁধুনি রান্না করে, ড্রাইভার গাড়ি চালায়। শিক্ষক-ছাত্রীর সম্পর্ক কবে হল আমাদের মধ্যে ?

অনীতা লজ্জা পায় না।

বেশ হল তাই। কিন্তু বয়সে তো ছোট আমি। সেইজন্য অন্তত 'তুমি' বলা উচিত।

কিন্তু বড় অন্য সমস্ত দিক দিয়ে। অর্থে বড়—অহঙ্কারে বড়—

অনীতা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, 'আপনি' বলেন আর সেই সঙ্গে ইনিয়ে-বিনিয়ে গালিগালাজ করেন। তুই-তোকারি ঢের ভাল এই রকম অপমানের চেয়ে—

কণ্ঠস্বর কাঁপছে। আঁচল মুখে চেপে সে ছুটে চলে গেল।

হতভম্ব হয়ে বসে আছে মিহির। সত্যি, কথাগুলো রূঢ় হয়ে গেছে। আর যাই হোক, মেয়েটা অহঙ্কারী কখনো নয়। বয়স কী-ই বা! তার উপরে বাড়ির একটিমাত্র মেয়ে—মা নেই—বাপের প্রশ্রয় পেয়ে এমনটি হয়ে উঠেছে। মা না থাকলে যে কি দুঃখ, তার মা যদি চলে যান—সে অবস্থা মিহির ভাবতে পারে না।

এমনি ভাবছে সে বসে বসে। চুপচাপ বসে আছে। অনেকক্ষণ কাটল। সীতা যাচ্ছে—এ-ও এক মেয়ে, দেখ। শান্তশিষ্ট স্থিরবুদ্ধি। অনীতা ছাড়া অন্য মেয়ে আছে এ-বাড়িতে, তা কেউ টের পাবে না। সীতাকে বলে, শুনুন—আপনার বোনকে ডেকে দিন তো! আমি বসে আছি।

সীতা বলে, সে তো বেরিয়ে গেছে।

জানে না সীতা। অবমানিতা অনীতা আছে বাড়ির মধ্যে কোন-না-কোন জায়গায়। আহা, কেমন করে চলে গেল মিহিরের সামনে থেকে। হয়তো বা কাঁদছে শয্যার উপরে মুখ গুঁজে, ক্রন্দনের আবেগে সর্বদেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে। সীতা এসব জানে না।

ওঁর নিজের ঘরটা একবার দেখুন না। কিংবা আর যদি কোনখানে মনে করেন।

সীতা বলে, বেরিয়ে গেল আমার সামনে দিয়ে। মাকে নিয়ে কালীঘাট গেছে। সে তো অনেকক্ষণ! আপনি বসে আছেন জানলে যেতে দিতাম না। তা কিচ্ছু বলল না কাউকে।

কি আশ্চর্য! এগজামিন এসে যাচ্ছে—

এগজামিন তো বয়ে গেছে—ঐ সব ভাবে নাকি? নতুন খেয়াল চেপেছে, সাঁতার শিখবে। সকালবেলাটা সেই হুল্লোড়ে প্রায় কেটে যায়। বিকেলে এটা-সেটা এমনি লেগেই আছে। বজ্জাতি বড় বেড়েছে, আপনি মামাকে বলুন—

তাই, এ অবস্থা আর চলতে দেওয়া হবে না। অপমানের ব্যাপারও বটে। মুখের কথাটা না বলে সরে পড়ল, আর বসে আছি তীর্থকাকের মতো, মনে মনে কত রকমের দুশ্চিন্তা! পড়াবার জন্যে রয়েছি এখানে, তা সমস্তই হচ্ছে কেবল সেই আসল কাজটা ছাড়া।

বসে রইল হিমাংশুর অপেক্ষায়—নিজের ঘরে গেল না। হেস্তনেস্ত করে তবে যাবে। কেমন মেয়ে দেখ তো ঐ সীতা—নিখাদ সোনা—অতি-বড় শত্রুও খুঁত বের করতে পারবে না। অতখানি ভাল হওয়া উচিত নয় অবশ্য। পটেও তো কত সুন্দর করে ছবি আঁকে! ছবির নড়াচড়া নেই—যেখানে রাখে, সেইখানে থাকবে। ঘর-ব্যবহার চলে কি তার সঙ্গে?

হিমাংশু এসে পড়লেন। একটু সকাল-সকাল এসেছেন—ক্লাবে তেমন জমে নি বুঝি! কিছুই বলতে হল না তাঁকে!

একলাটি বসে আছ মিহির, ছাত্রী পলাতক?

যেন ভারি এক মজার ব্যাপার। হো-হো করে হেসে উঠলেন। হাসিতে গা জ্বালা করে। এ বাপের মেয়ে অমনি হবে নয় তো কি!

ও পাজি মেয়ের সঙ্গে কেউ পেরে ওঠে না—তুমি তো ছেলেমানুষ! বাঘা মাস্টার মুকুন্দবাবু—হাঁক শুনে আমাদেরই গা কাঁপত—তাঁকেও নাজেহাল করেছে। পালিয়েছে যখন, আজ আর নাগাল পাচ্ছ না। যাও বাবা, ঘরে গিয়ে নিজের পড়াশুনো করোগে।

কিন্তু এমন করলে—ধরুন, অঙ্কে ফেল করে তো ক্লাসে উঠেছেন আবার এক পরীক্ষা ক'দিন পরে—এবারে পাশ তো করতেই হবে।

হিমাংশু সায় দেন, বটেই তো! তা বলে একটু যদি ভয় থাকে! দেখতেই একটু বড়-সড়—কিন্তু কি বলব বাবা, পাঁচ বছুরে খুকির যে জ্ঞানবুদ্ধি থাকে, তা-ও নেই। নইলে এমন করে?

আপনার একটু কড়া হওয়া উচিত—

হিমাংশু জ্বলে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। একটু কি বলছ! বাড়ি ফিরুক না আজকে, বেত মারব। বেত হাতে বসে থাকব যতক্ষণ না ফেরে। ও-মেয়ের উপর মায়া দেখানো পাপ—

রাগে গরগর করতে করতে, বোধ করি বেত-সংগ্রহের চেষ্টায় নিজের ঘরে চললেন।

৭

পরের দিন সন্ধ্যা। খেলা শেষ হয়েছে। অনীতা উপরে গিয়ে সেজেগুজে আবার নিচে নামছে। হেনকালে মূর্তিমান যম! ফটক পার হয়ে আসছে। পায়ের আঘাতে পথের নুড়ি-পাথর ছিটকে—নিজের ঘরে ঢুকল না, সোজা এই দিকে চলে এলো।

অনীতা বলে, জর্মনির কোন প্রফেসারের বক্তৃতা আছে না আপনাদের কলেজে?

পড়াবো বলে আমি চলে এলাম।

সে তো সোম-বুধ-শুক্কুর তিন দিন—আজকে মঙ্গলবার। অমন একটা ভাল জিনিস ছেড়ে বেদিনে কেন আসতে গেলেন?

মিহির বলে, কাল আসার দিন ছিল—ফাঁকি দিয়ে সরে পড়লেন। তারই বদলে এসেছি।

কি করি বলুন। গন্ধ-মহারাজ এসেছেন কালীঘাটে, ঘেঁটু-পাতা থেকে গোলাপের গন্ধ বের করেন—তাই দেখিয়ে আনলাম পিশিকে। কদিন থেকে আমায় বলছেন—

থামল একটুখানি, মনে মনে এক গল্প রচে নিল। তারপর মুখ-চোখ ঘুরিয়ে কানের দুল দুলিয়ে বলে, আপনার গালমন্দ খেয়ে বড্ড দুঃখ হল মাস্টার মশায়। এ প্রাণ রেখে কাজ কি, ত্রিভুবনে কেউ আমায় যখন দেখতে পারে না? ছাতে উঠে আলসের কাছে দাঁড়ালাম—দিই লাফ। পিশিমা এসে এমনি সময় পিছন থেকে হাত ধরলেন, কালীঘাটে যাই চল—

মিহির কিছু নরম হয়ে বলে, বলে গেলেন না কেন?

রাগ হল যে আপনার 'পরে! বিষম রাগ। তখন হুকুম নিতে গেলে আমার মান থাকে কোথায়?

মিহিরের মুখের দিকে অনীতা অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু ভবী ভোলে না।

আজকে পিশিমার কোন ফরমাশ নেই নিশ্চয়—

অনীতা তবু দাঁড়িয়ে থাকে। বলতে চায় কথাটা যে, তৈরি হয়ে নেমেছে বেরোবার জন্য। ভরসা পায় না। অলক ওঘর থেকে এসে ঢুকল। সে-ই বলে দেয়, পড়া আজও হবে না মাস্টার—রিহার্সালে চলেছেন।

আপনার সঙ্গে ?

হেসে উঠে অলক বলে, বরঞ্চ বলুন—আমি সঙ্গে যাচ্ছি। কিংবা আমাকে দয়া করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন।

তা তো যাবেন। অঙ্কের পরীক্ষা আর ক-দিন পরে—

অনীতা তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, পাশ করে যাবো।

যেমন করেছিলেন অ্যানুয়েল পরীক্ষায়—

দেখবেন—

দেখবো বলেই তো অমন সুন্দর বক্তৃতা ছেড়ে চলে এসেছি। কাল চালাকি করে সরে পড়েছিলেন, আজকে হবে না।

কথার ধরনে অলক স্তম্ভিত হয়ে মিহিরের দিকে তাকায়। বলে, বাঃ রে—

তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মিহির অনীতার দিকে চেয়ে বলে, একটা পথ বেছে নিতে হবে আপনাকে। হয় পড়াশুনো করবেন, নয় তো স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেবেন আমাকে।

অনীতা কঠিন এক দৃষ্টি মিহিরের দিকে হেনে অলকের হাত ধরে টানল, আসুন—

গোলঘরে গেল।

দেখলেন তো ? কি রকম অভদ্র বুঝুন এবার। চোখ গরম করেন—কচি খুকি যেন আমি। সেই কোন মোক্তারের মেয়ে পড়াতেন, আমাকেও তাই ভেবেছেন। আপনি আমার একটু কাজ করে দিন অলকবাবু। দয়া করে কলেজে গিয়ে রেবাকে বলুনগে চালিয়ে-চুলিয়ে নিতে। আমি যাবই একবার, কিন্তু কাজ বন্ধ করে ওরা বসে না থাকে—

অলক বল, জানি তো রেবা দেবীকে। ওঁকে কেউ মানবে না, আপনি না গেলে কিছুই হবে না। স্কুল-বিহার্সালের দিন, গোড়া থেকেই আপনার থাকা উচিত।

উচিত তো জানি, কিন্তু হচ্ছে কি করে ? খেলার তালে না গিয়ে আগেভাগে বেরিয়ে পড়লে হত। কিন্তু মঙ্গলবারের দিন এসেও এইরকম হানা দেবে, বুঝব কি করে ? এখন আর উপায় নেই। মেজাজ দেখলেন না— গেঁয়ো মানুষগুলো গোঁয়ার হয় ঐরকম।

আজকের দিনটা বলে কয়ে যদি কোন রকমে—

অনীতা আগুন হয়ে ওঠে, বলতে যাবো কি জন্যে? মাইনেও দেওয়া হচ্ছে, এমনি নয়। পড়ি বা না পড়ি—অত শত দেখবার কি? মাসে মাসে ওঁর পাওনাটা পেয়ে গেলে হল।

অলক সোল্লাসে সায় দেয়, আমিও বলি তাই। বড্ড বেশি ওঁর মাতব্বরি। বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, হুকুমদার আপনি নন। যাবেন না আজকে পড়তে।

কক্ষণো না—

মোহিনী ঘরে ঢুকে বলে, মাস্টার মশায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন—আর তোমরা এদিকে গল্প জমিয়েছ দিদিমণি?

দাঁড়িয়ে কেন—বসতে পারলেন না পড়ার ঘরে গিয়ে? যাচ্ছি তো আমি। অলক বাবুকে সমস্ত বলেকয়ে তবে তো যেতে হবে।

অলক বলে, এই যে বললেন, যাবেন না—

কাঁদো-কাঁদো হয়ে অনীতা বলে, পেয়াদার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে—না গেলে রক্ষা আছে?

বাইরের দিকে একনজর চেয়ে একেবারে গলা নামিয়ে প্রবোধ দেবার ভঙ্গিতে বলল, এই মাসটা হয়ে গেলে বাবাকে বলে বিদেয় করে দেবো। দরকার নেই এমন অভদ্র মাস্টারের। আপনি একজন বাইরের মানুষ এখানে রয়েছেন—তা বলে একটুকু সমীহ নেই। কথায় কথায় অপমান। আপনি গিয়ে ওদের বলুনগে অলকবাবু, ঘন্টাখানেকের মধ্যে আমি গিয়ে পড়ব।

পড়ার ঘরে বসেছে। আড়চোখে বারবার মিহিরের দিকে তাকায়। শুনে ফেলেছে নাকি যা-সমস্ত বলছিল অলকের সঙ্গে? এ তো অন্যায়—ঘোরতর অন্যায়—ঘরের পাশে সিঁড়ির মুখটায় মানুষ অমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? মিহিরের মুখভাবে কিছু ঠাহর হয় না। সহজ কণ্ঠে সে বলল, কটা ফর্মুলা সেদিন বেছে দিয়েছিলাম—

সভয়ে অনীতা বলে, হয় নি।

না হবার কি? জলের মতো করে বুঝিয়ে দিলাম—

চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু হল না।

নিয়ে আসুন খাতা। কেন হচ্ছে না, দেখি।

দেখাচ্ছি।

রোখে রোখে টেবিলের ড্রয়ার তো খুলে ফেলল। এটা হাতড়ায়, ওটা নেড়েচেড়ে দেখে। কিছুক্ষণ এমনি কাটল। মিহির একটা কথাও বলছে না, মৃদু হাসি মুখের উপরে।

পেলেন না তো? পাবেন না, আমি জানতাম—

অনীতা বলে, ঝড-দা এমন হয়েছে—পুরানো কাগজপত্র পেলেই বিক্রি করে দেয়। তাকে বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করি—

নির্দোষী বুড়োমানুষের উপর দোষ চাপাবেন না।

অনীতার ওষ্ঠ থরথরিয়ে কাঁপে।

যত দোষ আমারই আপনি দেখেন। আর সকলে ভালো। আমি মিথ্যাবাদী, ফাঁকিবাজ—

শান্ত কণ্ঠে মিহির বলে, এ ব্যাপারে অন্তত তাই বটে। ফর্মুলা তারপরে আপনি তাকিয়েও দেখেন নি—

অনীতা বলে, মাথায় ঢোকে না, কি করব?

অঙ্ক তবে আপনার ছেড়ে দেওয়া উচিত।

অনীতা রাগ করে বলে, কখনো না। আপনি বোঝাতে পারেন না—

তবে তো আমাকেই ছাড়ানো উচিত। সেই কথাটা বলছেন পাকে প্রকারে।

এর পরে অনীতা কথার খেই খুঁজে পায় না।

উঁহু, বোঝান আপনি অতি চমৎকার। সেদিন কেমন যেন হয়ে গেল। আচ্ছা, আজকের দিনটা যাক—কাল দেখতে পাবেন, সমস্ত কাজ করে রেখেছি। একটাবার দেখুনই না বিশ্বাস করে।

মিহির হেসে বলে, তবে দেখুন, জেনে-বুঝেও আপনি ফাঁকি দেন। এগজামিন সামনে—একেবারে ছেলেমানুষটি নন আপনি—

রেগে উঠল অনীতা। ছেলেমানুষ নই, সেটা কি মানেন আপনি? এমন ব্যবহার করেন যেন একফোঁটা মেয়ে। বাইরের মানুষজন মানবেন না, কিছু না। তাইতে আরো মন খিঁচড়ে যায়, রাগ হয়, কাজকর্ম করতে পারি নে।

আচ্ছা, আমার সামনে বসে করুন এবার—

অনীতা দাঁড়িয়ে আঙুলে শাড়ির প্রান্ত জড়াচ্ছে, আবার খুলছে।

সামনে করবেন না, টাস্ক দিলেও করে রাখবেন না। তা হলে আমায় বাড়িতে রেখে পোষা কেন অনর্থক? আচ্ছা, উঠি—

ভয়ে ভয়ে অনীতা বসে পড়ল। কিন্তু অকূল সমুদ্র—তীর নেই, তল নেই। সেদিন অনেক যত্ন করে বুঝিয়ে দিয়েছিল বটে—রাতের স্বপ্ন দিনমানে মনে করার মতো স্মৃতিতে অল্প অল্প ভেসে আসছে। চুরি করে এক একবার তাকায় মিহিরের দিকে—এই বুঝি ক্ষেপে ওঠে! ভয়েব দরুন মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে আরও। অনেক কষ্টে যা-হোক কবে তবু গোটা দুই হযে গেল।

দেখুন—

আনন্দস্মিত মুখে মিহির বলে, বাঃ চমৎকাব! চেষ্টা করলে বেশ তো পারেন। করে ফেলুন দেখি বাকিগুলো—

অনীতা বলে, করে রাখব—একটাও বাদ থাকবে না। আমি বলি কি প্রফেসাবেব বক্তৃতাটা শুনে আসুনগে আপনি। কলেজের বাঁধা-ধরা কাজের চেয়ে এই সব অনেক বেশি দবকারি।

মিহির বলে, লোভ তো হয়। কিন্তু এখন অতদূব আবার ছুটোছুটি করে যাওয়া—থাক গে, কাজ নেই।

কেন আলসেমি করছেন? দেরি করবেন না—অনেকক্ষণ চলবে এখনো। আরও বড কথা, আলাপ-পরিচয় হবে—আপনার মতো ছাত্রকে নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে।

আহত কণ্ঠে বলে, বিশ্বাস করেন না আমায়? ভাবছেন, পালাব। এই যে বসেছি—এক নাগাড চলল এখন। দশটা বাজুক, বারোটা বাজুক, সমস্তগুলো শেষ করে উঠব। আপনার বসে থেকে কি হবে?

এর পরে আর বসা চলে কেমন করে? তা ছাড়া বিদেশি অধ্যাপকের কথাগুলো শোনবারও দুরন্ত লোভ। উঠে দাঁড়িয়ে মিহির তবু বলে, ঠিক তো? তা-ও বটে—বেঠিক কথা কবে বলে থাকেন? আচ্ছা চলি। দশটা-বারোটায় কাজ নেই—ঘণ্টাখানেক অন্তত বসবেন—

অনীতা জেদ ধরে, উঁহু—বারোটাই।

ঘাড় তুলল না। বেশি কথার সময় কোথা? গভীর মনোযোগে অঙ্ক কষে যাচ্ছে। মিহির নিচে নেমে যেতেই তড়াক করে অমনি উঠে দাঁড়াল।

হাতঘড়ি দেখে—উঃ, কত দেরি হয়ে গেছে! বারাণ্ডায় গিয়ে দেখে, ফটক পেরিয়ে মিহির রাস্তায় নামল। কাপড়-চোপড় পরাই আছে, আয়নায় একবার দেখে নেবে—কিন্তু সেটা আবার শোবার ঘরে। সিকি মিনিটও নষ্ট করা চলবে না—হিমাংশু গাড়ি নিয়ে গেছেন, ট্রামে যেতে আরও তো আধঘণ্টা।

হন হন করে চলেছে। পিছনে মিহিরের গলা। কি সর্বনাশ! নাঃ, ভাল ছেলে না হাতি! বাইরে থেকে অমনি শোনা যায়। তা হলে অত বড় বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা শুনতে ছুটে চলে যায় না?

মিহির বলে, বেরিয়ে পড়েছেন? বারোটা-দশটা বেজে গেল আমি উঠতে না উঠতে?

অনীতা শুনতে পাচ্ছে না। অন্যদিকে মুখ করে যাচ্ছে। মিহিরও কি ছাড়বার পাত্র—দ্রুত তার কাছে চলে গেল।

আমি সঙ্গে যাচ্ছি আপনার—

থতমত খেয়ে অনীতা বলে, কোথায়?

যেখানে যাবেন আপনি। রাত হয়ে গেছে—ওদিকটায় লোকজন কম, একলা যাওয়া ঠিক নয়। আমি পৌঁছে দেবো।

কলেজে যাচ্ছিলেন, তাই চলে যান না! আমার জন্য ভাবতে হবে না।

অলকবাবুকে নিয়ে বেরুচ্ছিলেন, আমি মাটি করে দিলাম। দোষ আমার, প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে। উঠুন, ট্রাম এসে গেছে।

হেসে আবার বলে, অলকবাবুর কাজটা করে দিয়ে আসছি। শুধু এই একটা দিন—

গা জ্বালা করে ঐ মুখে এ ধরনের কথা শুনলে। অলক হলে খানিক বেশ কথার পাঁচ খেলানো যায় তার সঙ্গে। কিন্তু এ মানুষ অলক হতে যাবে কেন? অনীতার মনে হল—বলে দেয়, যেতে হবে না মশায়ের দয়া করে। অবোলা মেয়ে নই যে সঙ্গে করে পৌঁছে দেবেন। আবার ভাবল, আসছে আসুক না—দেখে যাক মেয়েদের মধ্যে কি রকম খাতিরটা তার। পাড়াগেঁয়ে লোক—থিয়েটার বলতে অভব্য কিছু ভাবে হয়তো। চোখে দেখে নিঃসন্দেহ হোক।

কলেজের দরজায় এসে ডাকে, আসুন—একটুখানি বসে যান, বন্ধু কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। হল-ঘরে রিহার্শাল। গান হচ্ছিল সেই সময়টা—পাশের রাস্তায় লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছে। তা বয়ে গেছে মিহিরের, এসব ব্যাপারে ভিড়লে যেন তার ইজ্জত হানি হয়। গটমট করে চলে গেল, অনীতার অনুরোধ কানে নিল না।

সন্ধ্যাবেলার সেই গতিক। রোজ না হলেও মিহিরেরই সময় ওটা—অত্যাচার না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু সকালেও ক্রমশ হামলা শুরু হয়ে যাচ্ছে।

একজামিন কাছাকাছি—এখন আর সকাল-সন্ধ্যে কিম্বা সোমবার-মঙ্গলবার বাছাবাছি চলবে না। বলেন তো আমি না হয় কলেজ কামাই করে আর খানিকটা এগিয়ে দিই। খেটেখুটে পড়ুন দিকি এই কয়েকটা দিন, একটু মনোযোগ করুন।

সকালবেলাটা সাঁতার শেখা—সাঁতারের নামে খানিক হুড়োহুড়ি করে আসা বান্ধবীদের সঙ্গে, তাতে বেশ স্ফূর্তি পাওয়া যায়—পড়ায় আরও মন বসে। কিন্তু মিহির তা বুঝবে না—সমস্ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার ঠেলায়। একটা কথা হামেশাই আজকাল মুখে—পড়াশুনো না করতে চান তো কেন মিছে আমায় রাখা? সোজাসুজি বলে দিন, বিদায় হয়ে চলে যাই। নিজের পড়াতেও তবে তো ইস্তফা পড়বে! সেইটেই আসল মতলব—কিম্বা, জঙ্গিপাড়ায় ফিরবার ছুতো কিনা কে জানে! মোক্তারের মেয়ে সেই লক্ষ্মীছাড়িটা চিঠিপত্র লেখালেখি করছে নাকি এখানে?

সে যাই হোক—পড়তে পড়তে হঠাৎ মনে পড়ে গেল সাঁতারের কম্পিটিশন আজকে। নিজে না নামলেও একটুখানি না দেখে পারা যায় কি করে? সারাক্ষণ দেখবে না—গিয়ে ক্লাবের মেয়ে কটাকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাহবা দিয়ে চলে আসবে। বই খোলাই রইল, ফিরে এসে পড়বে আবার।

ফটকের কাছাকাছি এসে অনীতা মিহিরের জানালার দিকে তাকায়। একমনে কি লিখছে সে। অতি উত্তম, ভালো ছেলেরা এমনিই করে! সাবধানে এইটুকু পার হতে পারলে হয়।

বেরুচ্ছেন কোথা?

অনীতা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। পা টিপে টিপে চলেছে—তিলেক সাড়া-শব্দ নেই। নজর না তুলেই তবু টের পেয়ে গেল কি? আচ্ছা এক দরোয়ানি হল তো, বাড়ির মাছিটাও উড়ে যেতে পারবে না! ফটকের ধারের

ঘর পছন্দ এই কারণে বুঝি? বাবা সেই যে হাসতে হাসতে বললেন তাকে জব্দ করবার কথা—উঃ, কি ক্ষণে কথাটা পেড়েছিল যে!

এবার ঘরে বসে মিহির অনীতার মুখোমুখি তাকাল।

কাল থেকে, ঠিক করলাম, সকালেও গিয়ে বসব আপনার পড়ার ঘরে—

অনীতা বলে, রাত্রে পুরা দশটা অবধি চেয়ারে এঁটে বসে থাকেন। আবার সকালে বসবেন, দুপুরে বসবেন—এই করবেন তো মিছিমিছি ভর্তি হতে গেলেন কেন? এম. এস-সি. পাশ করা, বুঝলেন, অত ফাঁকি দিয়ে হয় না।

মিহির বলে, আপনাকে যে ঠেকানো যায় না—কি করি! সকালটা হল সব চেয়ে ভাল পড়বার সময়—আর চুপিসারে আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন।

পালাচ্ছি কে বলল? এইখানে দাঁড়িয়েছি একটু—

অনীতা ক্ষেপে গিয়ে বলে, আপনি আমার ফাঁকি ধরে বেড়ান—দেখব না, আপনি কি করছেন ঘরের মধ্যে বসে বসে? বইয়ের দিকে চোখ দুটো রেখে তাবৎ দুনিয়া দেখে বেড়ানো—ওকে পড়া বলে না। অভিনিবেশ চাই—ঘাড়ের ওপর দিয়ে হাতি চলে গেলেও হুঁশ হবে না, এমনি।

মুচকি হেসে মিহির বলে, যেমন আপনার?

মাস্টারই তো আদর্শ হবেন! আপনার পড়ার এই গতিক, আমাদের মনোযোগ আসবে তবে কেমন করে?

রাগে জ্বলতে জ্বলতে অনীতা আবার উপরে গিয়ে ওঠে। বাড়িতে এনে বসিয়ে এখন বিষম যন্ত্রণা—ভারি এক মাস্টার হয়েছেন কিনা, অষ্টপ্রহর একেবারে ওত পেতে আছেন। তবু যদি বই বগলে কলেজে দৌড়াতে না হত! খাঁটি মাস্টারেরা কিন্তু এমন করে না।

কলেজ থেকে ফিরে ঝড়ুর প্রমুখাৎ অবগত হওয়া গেল, দিদিমণি পড়বে না আজ—অসুখ করেছে। সকালবেলার শোধ নিচ্ছে অতএব। বেরুতে দিলে না—দেখ তবে, অনধ্যায় গোটা দিন ধরেই। সত্যি, কি দায় পড়েছে অত চাপাচাপি করবার? বড়লোকের মেয়ে কলেজে নামটা রেখে দিয়েছে—কলেজের ছাত্রী হওয়া হাল আমলের ফ্যাশান বলে। পড়ে শুনে সে পাশ করতে চায় না, পড়েও না তাই। মিহির রাজার হালে আছে এখানে,

খাচ্ছে-দাচ্ছে ভালো, তার উপর মাসে মাসে নিয়মিত তঙ্কা পাচ্ছে পেন্সনের মতো। এতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত—অনীতার হিত-চেষ্টায় কোমর বেঁধে লাগবার প্রয়োজন নেই। দয়া করেছে মেয়েটা তোমায়, সেই দয়ার উপর জুলুমবাজি হচ্ছে নাকি? বাক্যস্ফূর্তি না করে অতএব নিজের আখের গুছিয়ে যাও। বিবেক-বৃশ্চিকটাকে গরজের ডাণ্ডা পিটিয়ে মেরে ফেল, ওটা যাতে সময়ে অসময়ে দংশন করতে না পারে!

পরের দিনটা গেল অমনি, তার পরের দিনও। জ্বরটা নাকি যাচ্ছে না। এগজামিন না কাটিয়ে যাবে না, বোঝা যাচ্ছে। বোকা মেয়ে নয় তো—ফলাফল ভাল রকম জানে আগে থেকেই। কিন্তু অনীতা দেবী রোগী হয়ে চুপচাপ বিছানায় পড়ে আছেন—শাস্তি অনেক বেশিই তো হচ্ছে এগজামিনে বসার চেয়ে।

পুরো হপ্তা কেটে গেল। যা ভেবেছে তা নয়—ব্যাপার সত্যি গুরুতর। ঘুসঘুসে জ্বর, অথচ অশেষ রকম পরীক্ষা করেও ব্যাধিটা ধরা যাচ্ছে না। সেইটেই ভয়ের। রোগ ঠিক হলে তার চিকিৎসা আছে, যথাবিধি ব্যবস্থা করা যায়।

হিমাংশুর আদালত বন্ধ—সারাদিন মেয়ের শয্যার কাছাকাছি ঘোরেন। রাত্রিবেলা ঠেলেঠুলে শুতে পাঠানো হয় তাঁকে। শুয়ে পড়লেই যদি ঘুম হত! উঠে এসে বারম্বার দোরগোড়ায় দাঁড়ান, দোরের পাশ থেকে ঘরের ভিতরের শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ শোনেন।

অলক প্রকাণ্ড মোটরগাড়িতে ডাক্তার নিয়ে এলো। মস্ত বড় ডাক্তার—সে আর বলে দিতে হয় না। হিমালয়ের দোসর দেহ—অকৃত্রিম কষ্টি খুদে যেন তৈরি। ডাক্তার সাহেবের চেহারা দেখেই রোগের ভয় পেয়ে পালানোর কথা। তাঁকে নিয়ে অলক সোজা দোতলায় উঠে গেল, নেমে এলো আবার খানিক পরে। মোটর সগর্জনে ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল। মিহির তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে।

নিঃশব্দ, নির্জন। মিহিরের জানালায় উঁকি দিতে আসে না এখন কেউ। সে যে কত অবান্তর, বাড়ির এই বিপদের মধ্যে চৌপহর বুঝতে পারছে। হিমাংশু তাকে একেবারে যেন ভুলে গেছেন, সামনাসামনি পড়ে গেলেও কথা

বলেন না। মিহিরও আগ বাড়িয়ে কিছু বলবার ভরসা পায় না অমন থমথমে মুখ দেখে।

তোলেন নি শুধু কমলবাসিনী। যত্ন দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। খাওয়ার ব্যাপারে একটু গড়িমসি হলে বারম্বার তাগিদ পাঠান। রকমারি খাবার এতবড় বিপদের মধ্যেও প্রতেক দিন নিজের হাতে বসে বসে তৈরি করেন। মিহির নামই জানে না অনেক জিনিসের। সেই পয়লা দিন সামনে বসে যেমন খাইয়েছিলেন, তেমনি ধারা আজও চলছে। ডাকহাঁক করে সীতাকে নিয়ে আসেন সেখানে। এটা দে, ওটা দে—মাছি বসছে, পাখা কর একটু বসে বসে। বলেই হয়তো উঠে চলে গেলেন।

মিহিরকে বলেন, আজকাল অত ডাকাডাকি করতে হয় কেন? তোমার খাওয়াও অর্ধেক হয়ে গেছে।

ঘাড় গুঁজে খেয়ে যাচ্ছে মিহির।

বড্ড যেন মনমরা হয়ে পড়েছ। অসুখে পড়ে আছে মেয়েটা—আমাদেরও কি ভাল ঠেকছে? তা বলে কোন কাজটা না করলে চলে? আবার তা-ও বলি—

গলা নামিয়ে বলেন, কাউকে বোলো না বাবা। একটু জ্বর হয়েছে তো তো সৃষ্টি রসাতলে গেছে একেবারে। আমার সীতারও এমন কতবার হয়েছে। কাকপক্ষীতে তা জানতে পারে না। আর ও-মেয়ের হাঁচিতে সাগর উথলায়।

খাওয়া শেষ করে নিঃসাড়ে মিহির উঠে চলে গেল।

ঘুসঘুসে জ্বর ছিল—বড় ডাক্তারের ওষুধ খাওয়ার পরে জ্বরটা বেড়ে গেল হঠাৎ। আর এক বিষম উপসর্গ—অবিরত হিক্কা উঠছে। সেই হিমালয়টি এসেছেন আবার। মনের উদ্বেগে হিমাংশুর কথাবার্তার কিছু হেরফের হয়েছিল বুঝি! ডাক্তার সাহেব চটেমটে আগুন।

আমার ওষুধে হয়েছে? আমার ওষুধ যারা খায় না, তাদের হয় কি জন্যে?

নিজের কুঠুরি ছেড়ে মিহির একদিকের বারাণ্ডায় চলে এসেছে, ডাক্তারের সঙ্গে যেখানে হিমাংশুর কথা হচ্ছিল। সে-ও আজ রোগীর ঘরে চলল তাঁদের পিছু পিছু। হিমাংশু চেয়ে দেখলেন, কিছু বললেন না। ঘরে ঢুকে একটু দূরে

দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। রোগী কি দেখবে—ঘরের দিকে চেয়ে পলক পড়ে না। এমন জায়গায় থাকে অনীতা! নিচের তলার ঘরগুলো কিম্বা পড়ার ঘরের তুলনা চলে না এর সঙ্গে। ঘরের মেঝে চলে ফিরে বেড়াবার জায়গা—সেইখানেই বা কি রঙের বাহার, কত কারুকর্ম! পা ফেলা বর্বরতা মনে হয় এই মেঝের উপরে। দেয়ালে দেয়ালে ছবি—ছাত থেকে রকমারি আলো ঝুলছে। আর আয়তনে কি প্রকাণ্ড! এত বড় ঘরে ঐ এক মেয়ে অনীতা থাকে।

আর ঐ যে মেয়ে—দিন পনেরো দেখে নি, কি হয়ে গেছে আহা এর মধ্যে! মিহির সন্তর্পণে তাকাচ্ছে। জল এসে না পড়ে চোখে। কি আশ্চর্য, রোগিণীর দৃষ্টিও যে তার দিকে।

নতুন দৃষ্টি—নিতান্ত অপরিচিত। সুস্থ অবস্থায় এমন করুণ চোখে চাইতে পারত না অনীতা। বিশ্বাস করা যায় না যে এই মেয়ে হুল্লোড় করে বেড়িয়েছে সেদিন অবধি। অঙ্কের বইয়ের এক জায়গায় একটা সরলরেখার নিচে মিহিরের নাম লিখে রেখেছিল; অর্থাৎ সরলরেখার মতোই লম্বাটে তার চেহারা। মিহির পাল্টা বলেছিল, এই বৃত্তের নিচে তবে তো আপনার নামটাও লিখতে হয়। মানে দাঁড়াল, তোমারও দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মধ্যে বড় বেশি তফাত থাকছে না ওহে শ্রীমতী। বাড়িয়ে বলেছিল অবশ্য অনীতাকে ক্ষেপাবার জন্য—তার দুষ্টামির শোধ নেওয়া। সেই বৃত্ত-দেহ সূক্ষ্ম হয়ে প্রায় শূন্যাকার হয়ে উঠেছে। অতবড় পালঙ্কের মাঝে এতটুকু জায়গা নিয়ে গুটিসুটি হয়ে আছে। নজরেই পড়ত না, অবিশ্রান্ত এই হেঁচকির আওয়াজ যদি না উঠত! কামারের হাপরের মতো টানের সঙ্গে হাড় কখানা গুটিয়ে আসছে। লড়াই চলেছে যেন দেহ-পিঞ্জরে প্রাণটুকু আটকে রাখবার জন্য। এ কষ্ট চোখে দেখা যায় না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। ছুটে পালাল যেন।

ডাক্তার তারপরে নেমে এসে যথারীতি ভিজিটের টাকা পকেটে ফেলে গাড়িতে উঠলেন। তাঁকে তুলে দিয়ে হিমাংশু আচ্ছন্নের মতো থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এদের কোন ব্যাপারে থাকে না কখনো মিহির—নিজের অবস্থা ডিঙিয়ে কেন যাবে ঘনিষ্ঠতা করতে? আজকে কি হয়েছে তার—থাকতে পারল না। হিমাংশুর কাছে গিয়ে দীন কণ্ঠে বলে, দেখুন—আমাদের পাড়া-

গাঁয়ের মুষ্টিযোগ আছে, চাট্টি মুড়ি ভিজিয়ে সেই জল খাইয়ে দেয়। আপনাদের ওষুধপত্তোর যেমন চলছে চলুক—মুড়ির জল খাইয়ে দেখবেন দু-এক ঢোক?

হিমাংশু ঘাড় নাড়লেন—হাঁ কি না বললেন, বোঝা যায় না। মিহির ততক্ষণে মুড়ি কিনতে ছুটে বেরিয়েছে। মেয়ের সম্পর্কে বাইরের ছেলের উৎকণ্ঠা দেখে হিমাংশু বিচলিত হলেন। মুড়ির ঠোঙা হাত থেকে নিয়ে মিহিরের মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, এক্ষুণি খাইয়ে দিচ্ছি। কিছুতে কিছু হচ্ছে না—আর এ কোন খারাপ জিনিসও নয়। কেন খাওয়াবো না?

মুড়ির জলে হিক্কা বন্ধ হল, ওষুধও চলছিল—কোনটার জন্য হল, ঠিক অবশ্য বলা যায় না। কষ্টের উপশম হয়েছে, এতেই তৃপ্তি।

তবু চুপিসারে একটা কথা চলছে, অনীতা হয়তো বাঁচবে না। আঁচলে চোখ মুছে কমলবাসিনী বলেছিলেন মোহিনীকে। সেখান থেকেই আরও ছড়িয়ে গেল। হিক্কা তো উপসর্গ মাত্র, আসল রোগ বেড়েই যাচ্ছে। রাতদিন জ্বর বইছে ইদানীং। এমন উৎকট কাশি—কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে যায়। এর উপরে গোঁ ধরেছে, ওযুধপত্র খাবে না। দাঁতে দাঁত চেপে থাকে। জোর করে মুখে ঢাললে ওয়াক করে উগরে দেয়। এমনি তো আধপাগলা চিরকাল—এবারে পুরোপুরি মাথা খারাপ হবার সূচনা। এমন অবস্থায় আর কদিন?—অস্থিসার দেহ বিনা চিকিৎসায় কতদিন আর যুঝবে?

হায় রে! পাঁচটা মিনিট চুপ করে থাকতে পারে না, সেই প্রাণোচ্ছল মেয়ে দিনের পর দিন শয্যা আঁকড়ে আছে। আর ওরা বলছে, শয্যা ছেড়ে উঠে বসবে না আর কখনো।

রাত বারোটা, নিঝুম সমস্ত বাড়ি। উপরের সেই ঘরটার দিকে চেয়ে চেয়ে মিহির নিশ্বাস ফেলল। কি-ই বা করবার আছে সঙ্গোপনে এই নিশ্বাসটুকু ফেলা ছাড়া? মুখ ফিরিয়ে খোলা বইয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে আবার।

আরও অনেকক্ষণ গেছে। ছিল পড়ার মধ্যে, চুড়ির ঝিনিমিনিতে চমকে তাকিয়ে সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। বিজীর্ণ ভয়াবহ এক ছায়ামূর্তি তার ঘরে। সেদিন এত ভয়ঙ্কর লাগে নি—বিছানার সঙ্গে একেবারে লেপটে ছিল বলে। অনীতা কে বলবে—তার শুষ্ক কঙ্কাল হেঁটে এসে ঘরে ঢুকেছে। চুড়ির আওয়াজ বলে মনে হয়েছিল—তা হয়তো নয়, হাড়ে ঠোকাঠুকির শব্দ। এক

অদ্ভুত আতঙ্কে পেয়ে বসে মিহিরকে। মৃত্যু হয়েছে বোধ হয় মেয়েটার। সকলে ঘুমুচ্ছে, রাতদিনের যে নার্স টাকে রাখা হয়েছে সে অবধি—শবদেহ পড়ে আছে ঘরের মধ্যে, কেউ এখনো টের পায় নি। প্রেতমূর্তি তারপর হাড় বাজিয়ে মিহিরের কাছে চলে এসেছে। খলখলিয়ে হেসে উঠবে, কই মাস্টার মশায়, এগজামিন যে এসে গেল—পড়াতে যাও না আর কেন? নিউটনের নিয়ম তিনটে ভাল করে বুঝিয়ে দাও, সেইজন্যে নেমে এলাম···—

দু-হাতে বইয়ের গাদা ঠেলে দিয়ে তক্তাপোশের উপর অনীতা মুখোমুখি বসে পড়ল। প্রথম এই বসল সামনাসামনি এমন করে চোখ চেয়ে, এই পলস্তরা-খসা সঙ্কীর্ণ কুঠুরিতে আধময়লা ছেঁড়া সতরঞ্চির উপর। অসুখের মধ্যে বুদ্ধিজ্ঞান লোপ পেয়েছে বলেই পেরে উঠল।

কোটরের ভিতর বড় বড় চোখ—চারিপাশে কালো দাগে ঘেরা। মুখ দিয়ে নয়—ভয়াবহ ঐ চোখ দুটোয় যেন কথা বলে উঠল, অনেক অবাধ্যপনা করেছি মাস্টার মশায়, অনেক রকমে জ্বালিয়েছি। আজকে মাপ চাইতে এসেছি। না এসে পারলাম না। বাবা আছেন, আর এই আছেন আপনি—আপনারা দু-জন ছাড়া কেউ নেই আমার এ জগতে।

কি বকছে প্রলাপের মতো! সন্ত্রস্ত হয়ে মিহির থামিয়ে দিতে চায়।

আরে সর্বনাশ, বিছানার উপরেও উঠে বসতে মানা—আর এদ্দূর হেঁটে চলে এলেন? কিচ্ছু জ্বালাতন করেন নি কোন দিন। আপনার জন্যেই আমার পড়াশুনো চলছে, এমন আরাম করে আছি।

বলতে দিল না—কথার মাঝখানে আর্তনাদের মতো অনীতা বলে ওঠে, আজ একটা দিনের জন্য অন্তত 'তুমি' বলুন মাস্টার মশায়। আমি মরে যাবো, বাঁচতে আমায় দেবে না—মারবার জন্য সকলে মিলে ষড়যন্ত্র করছে। বাবা বোকা, কিচ্ছু বোঝে না, এসব কথা বলতে গেলে কানেই নেয় না—

এমনিই চিঁচিঁ করে বলছিল, হঠাৎ আরও গলা নামিয়ে দিল। শোনা যায় কি না যায়।

অসুখ-উসুখ কিছু নয় মাস্টার মশায়। শুনুন তবে, পিশি আমায় বিষ খাইয়ে দিয়েছে। আপনার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবে। ভেবেছে, পথের কাঁটা আমি—সরিয়ে দিয়ে পথ খালি করবে, বাবার সর্বস্ব দশ হাত মেলে ভোগ করবে।

বাড়িসুদ্ধ লোকের আদরের পুতুল, এমন কথা বেরোল তার মুখ দিয়ে। আর সীতাকে ঠেঁশ দিয়ে বলছে, যে সীতাকে চোখে হারায় সব সময়। কমলের মনে সত্যি সত্যি গূঢ় মতলব আছে কিছু—মিহিরকে এত যত্ন তবে কি সেইজন্যে? সে যাই হোক—সন্দেহ নেই, অনীতার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কমলের রটনা নিতান্ত মিথ্যা নয়।

অনীতা বলতে লাগল, চোখেই তো দেখে এলেন মাস্টার মশায়। কি কষ্ট! কি কষ্ট! দম বেরিয়ে যায়, তবু কারো দয়া হয় না। মুড়ির জল দিয়ে আপনি বাঁচিয়ে দিলেন, নইলে চোখ উলটে তখনই মরে যেতাম—

মিহির বলে, কি যা-তা বলছেন। ওসব মুখে আনতে নেই। অন্যলোকে শুনে কষ্ট পায়। অসুখ তো প্রায় সেরেই গেছে।

বিষ খেলে বাঁচে কেউ? ভাগ্যিভোগায় যদি বেঁচে উঠি, তাই ওষুধের নাম করে দু-বেলা এখনো বিষ খাইয়ে যাচ্ছে। নার্স টাকেও দলে টেনে নিয়েছে। দিনরাত তার ফিসফিস-গুজগুজ পিশির সঙ্গে!

আকুল হয়ে কেঁদে পড়ল।

চেঞ্জের নাম করে কোন তেপান্তরে পাঠাচ্ছে এবার। বাবা ভালমানুষ—দু-কথায় তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আপনার সঙ্গে সেটা চলে না—ঐ মুড়ির জল খাওয়ানো থেকে বুঝে ফেলেছে। তাই সরিয়ে দিচ্ছে আপনার চোখের উপর থেকে। মোহিনী ঐ দলে—তাকে সঙ্গে দিয়ে পাঠাচ্ছে। এমনি না মরি তো শেষটা একদিন বেঘোরে গলা টিপে মারবে।

হাত জড়িয়ে ধরল মিহিরের। বলুন—আপনি আমায় মাপ করেছেন, রাগ নেই আমার উপর? নয়তো আমি মরেও শান্তি পাবো না। বলুন, বলুন—

মফঃস্বলের মুখচোরা ছেলে—কি বলবে সে হেন অবস্থায়? অনীতারই শাড়ির আঁচল নিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিল। দেখছে একদৃষ্টিতে। শীর্ণ মুখে এই অশ্রুধারার পাশাপাশি ফুটে ওঠে দাম্ভিক আর এক মেয়ের হুমকি দিয়ে ওঠা বাপের উপর, হাত-ইসারায় মিহির উপরে নিয়ে তুলে নাম সই করতে বলা……। সেই অনীতা কখনো তুমি নও—এ মুর্তি অপরিচিত, আগেকার সঙ্গে একটু মেলে না এই সব কথাবার্তা। নিশ্চয় তুমি আর একজন।

রাজরাজেন্দ্রাণী ভিখারি হয়ে কাকুতি জানাচ্ছে, চোখ মেলে আমি দেখব কি করে!

অনীতাও চেয়ে ছিল মিহিরের মুখে। আবদারের ভঙ্গিতে সহসা সে বলে ওঠে, না গো—হাসতে হাসতে বিদায় দিতে হবে। কান্না আমি সইতে পারি নে। পুরুষের চোখে জল—কী তুমি!

মিহিরকে দিয়ে 'তুমি' বলাবার আকুতি—তার আগে নিজেই তুমিতে নেমে এলো।

তিমিরমগ্ন রাত্রি দরজার বাইরে নিরুদ্ধশ্বাস হয়ে রয়েছে যেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল, কারো মুখে কথা নেই। তারপরে আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে মিহির বলে ওঠে, ঘরে যান অনীতা দেবী—

কেন?

হাসছে মিটিমিটি। দাঁতের ছড়া বেরিয়ে পড়ছে, কত উজ্জ্বল তবু সেই হাসি! বলে, ভয় কিসের গো? তোমার এ গুদামঘরে কেউ ঢুকছে না। জেগেও নেই কেউ—নার্সটা অবধি নাক ডাকছে। কার দায় পড়েছে, রাত দুপুরে উঠে আমার খোঁজখবর নিতে আসবে? কত ভালবাসে কিনা সব!

মিহির অনুনয় করে বলে, যান—

উঠে দাঁড়াল অবশেষে। বলে, ধরে নিয়ে চল তবে আমায়—

সেটা প্রয়োজন বটে! পা টলছে। উত্তেজনার মুখে কেমন করে যে এসে পড়েছিল, সে এক প্রহেলিকা। একা একা যেতে দেওয়া যায় না—সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় গড়িয়ে পড়তে পারে। মিহিরের কাঁধের উপরে অনীতা ঝুঁকে পড়ল; সমস্ত শরীরে ভর রেখে আস্তে আস্তে চলেছে। কড়ার মতো দুটো অস্থিসার হাতে এঁটে ধরেছে মিহিরকে। একমূর্তি হয়ে চলেছে দু-জনে!

হঠাৎ কমলবাসিনী সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এসে চিলে ছোঁ দেওয়ার মতো অনীতাকে ধরে নিলেন। তাই বটে—লন পার হয়ে আসার সময় মনে হচ্ছিল কে যেন উপরের বারাণ্ডা থেকে তাক করছে। মিহিরের উপর অগ্নিদৃষ্টি হেনে কমলবাসিনী বলে উঠলেন, যাও—ছেড়ে দিয়ে চলে যাও তুমি—

কি ব্যাপার, কি ভেবে বসলেন উনি? যাকে নিয়ে আসছিল অনীতা নয় তো সে। না চেহারায়, না মনে। নারীই নয় আদপে—রক্তমাংসশূন্য একআঁটি

হাড়। হাড়ের আঁটি নিয়ে যাচ্ছিল—সাবধানে দোতলায় তুলে খাটের উপর নিয়ে রাখবে। এর মধ্যে দোষ-গুণ কোথায়?

পরদিন অনেক বেলায় ঝড়ু মিহিরের ঘরে এলো। জলখাবারের জন্য ডাকতে আসে নি অন্য দিনের মতো—জলখাবার হাতে করে নিয়ে এসেছে। চা আর খানকয়েক বিস্কুট।

মিহির অবাক হল।

তুমি কেন আনতে গেলে ঝড়ু-দা? নিজে গিয়ে খেয়ে আসতাম। চা এনেছ—চা তো খাই নে আমি। বিস্কুট খাওয়াও আমার অভ্যেস নয়।

ঝড়ু তা জানে। বলে, খাবার-টাবার কিছু হয় নি। পিশিঠাকরুন আজ ঘর থেকে বেরুলেন না মোটে। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। মোহিনী বলতে গেল, তা জবাবই দিলেন না। আমি গেলে তেড়েফুড়ে উঠলেন। ওরা যে যার মতো জল ফুটিয়ে চা করে খেয়ে নিল। তুমি একটা মানুষ সকাল থেকে বাসিমুখে রয়েছ, সেটা কারো হুঁশ নেই।

মিহির বলে, কারো তো মন ভাল নেই—হয়ে যায় এরকম। সামান্য জিনিস নিয়ে তোমার এত ব্যস্ত হবার কি আছে ঝড়ু-দা?

ঝড়ু বলে, মোহিনী আমায় একবাটি চা এনে দিল। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করতে, তখন সে একহাত জিভ কাটে। যাচ্ছেতাই কাণ্ড—নিজেদের যা-ই হোক, বাইরে মানুষটার সুখ-সুবিধে দেখতে হবে না? দিদিমণি কত যত্ন করে তোমায় বাড়ি নিয়ে এলো—সমস্ত জানি আমি। মেয়েটা আজ বিছানায় পড়ে, চারিদিকে অমনি ভূত্যের নৃত্য শুরু হয়েছে। দিদিমণি মানুষ এতটুকু, কিন্তু তার নজর সকল দিকে ঘোরে।

মিহির তাড়াতাড়ি বলে, পিশিমা খুবই তো আদর-যত্ন করে থাকেন। আজকে শরীরটা তাঁর খারাপ হয়ে থাকবে।

কিছু না, কিছু না। ঐ যে যত্ন দেখানো আর ইনিয়ে-বিনিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা—ওসব সত্যি বলে ভাবো? সমস্ত মেকি, পুরোপুরি স্বার্থের ব্যাপার। আজকে চলে যাচ্ছে ওরা, সর্বেশ্বরী হয়ে পড়ছেন—এখন থেকেই নবাবি চড়ে

উঠছে। যা ভেবেছেন, সেটি হচ্ছে না—আমিও থাকছি, কতদূর উড়তে পারেন দেখে নেবো। কিন্তু চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে দাদা, খেয়ে নাও—

মিহির বলে, তুমি হাত করে এনেছ—একখানা বিস্কুট নিয়ে নিচ্ছি ঝড়ু-দা। চা আমি খেতে পারি নে। এসব নিয়ে যাও—

ঝড়ু চলে যাচ্ছিল—মিহির ডেকে বলে, চেঞ্জে থাকবেন ওঁরা কতদিন ?

ভগবান করুন, খুব শিগগির যেন ফিরে আসতে পারে! বাবুর বাইরে যাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়—কত মক্কেলের জীবন-মরণের ব্যাপার! কিন্তু মেয়ের বড় কি আছে বলো, আমাদের দিদিমণির মতন মেয়ে! জ্বরটা কাল থেকে নেই—এটা খুব ভাল লক্ষণ। তোমরা আশীর্বাদ করো, যেন ভালো হয়ে স্ফূর্তিতে ড্যাং-ড্যাং করে ফিরে আসে!

তাই তো বটে! গায়ের উপর অনীতা এলিয়ে ছিল, তখন জ্বরের তাপ পাওয়া যায় নি। রেহাই দাও ওগো মৃত্যু, আনন্দ-প্রতিমা বেঁচেবর্তে থাক—নতুন স্বাস্থ্য নিয়ে ফিরে এসে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে জীয়ন্ত করে তুলুক আবার এই নিরানন্দ বাড়ি।

কমলবাসিনী ঘর থেকে বেরিয়েছেন এবার। ঝড়ু চা ফেরত নিয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে মুখোমুখি। ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, মেয়েটার ঐ অবস্থা—লুচিমণ্ডা বানানো আসছে না আমার। সকলের চলছে, আর একজনের যদি না চলে, দুটো-পাঁচটা দিন দোকানে গিয়ে জলখাবার খেয়ে এলে তো হয়! আমি পারব না, অত লাটসাহেবি কিসের ?

বাইরের বারাণ্ডা অবধি চলে এসে বলছেন। নিতান্তই দু-হাতে কান চাপা না দিলে বাক্যবাণ রোধ করা যায় না। বলছেন, মাসে মাসে গুচ্চের নগদ টাকাও তো নিচ্ছে পড়ানোর নাম করে। পড়ানো যা, মা-সরস্বতী জানেন। সে টাকা বাপের হাড়—সিকি পয়সা ভাঙবে না তার থেকে, ষোল আনা তবিল করবে।

সীতা ছুটে এসে মাকে টেনে নিয়ে যায়। কমলবাসিনী গর্জন করে ওঠেন, থাম্ রে হতভাগী। যে জন ভাগ্যি নিয়ে এসেছে, তার জন্য যমে-মানুষে টানাটানি—আর শতেকখোয়ারি তোকে সাত কুমীরে খেয়ে শেষ করতে পারে না। মর্ মর্—মরিস্ নে কেন রে তুই—

৯

মাস দশেক পরে অনীতারা ফিরল। ডাক্তার অনেক আগে ফিরতে বলেছিল, হিমাংশুই গড়িয়ে গড়িয়ে এতদিন কাটালেন। চলুক না এমনি—শরীরটা সারুক আরও ভাল করে! অর্থাৎ মক্কেলদের নাগালের বাইরে নিজেও লম্বা ছুটি ভোগ করে নিলেন এই অজুহাতে। নানান জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন তাঁরা।

বিধাতা যেন আর একবার গড়ে পিটে অনীতাকে নতুন করে বানিয়েছেন। স্বাস্থ্য ফেটে পড়ছে, আলোর ফিনকি ফুটছে তার চোখে-মুখে। দেখা করতে এসে অলক দৃষ্টি ফেরাতে পারে না।

সর্বাঙ্গে হিল্লোল তুলে অনীতা বলে, কি দেখছেন?

পাহাড়-রাজ্যে এই দশ মাস ধরে যতো ফুল ফুটেছিল, সমস্ত একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি অনীতা দেবী। যেন নতুন জন্ম। আগেও ভাল ছিলেন, কিন্তু আজকের সঙ্গে তুলনাই হয় না।

অনীতা বলে, সত্যি তাই—মরে গিয়ে ফিরে এসেছি। আবার দশটা মাস সবুর করুন, শহরের ধুলোধোঁয়ায় ঠিক সেই আগেকার কালিমূর্তি বেরিয়ে পড়বে।

অলক বলে, দশ মাস কি বলেন, দশটা দিনও যে সবুর সইছে না।

বলে ফেলে মৃদু হেসে কথা ঘুরিয়ে নেয়, কর্তারা বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বাবা কাল চিঠি দিয়েছেন, ছুটি নিয়ে খুব শিগগির কলকাতা এসে পাকাপাকি করবেন, আর ঝুলিয়ে রাখবেন না। আপনাদের কলকাতা ফিরবার খবর ওখান থেকে দেওয়া হয়েছিল নিশ্চয়।

ছাড়া-বাড়ির মতো হয়েছিল, অনেক মিস্ত্রি-মজুর লাগানো হয়েছে। ঘরে ঘরে কলি ফেরানো, বাইরেটায় নতুন রং। ইতিমধ্যে একদিন হিমাংশু কোর্টে দেখা দিয়ে এলেন। মক্কেলরা আসতে লেগেছে, জুনিয়াররাও আসছেন।

তাঁদের বলেন, এতদিন স্ফূর্তিতে কাটিয়ে এলাম—সেই মেজাজটা এখনো চলছে, কাজকর্মে মন বসে না। তা বলে ছাড়বে কি তোমরা? যাবো এইবার—আসছে হপ্তা থেকে জোয়াল পুরোপুরি কাঁধে নেবো।

একজনে হাসতে হাসতে বলেন, বাড়ি-ঘর-দোরের সজ্জা দেখে মনে হচ্ছে স্থর—

বলো, কি মনে হচ্ছে—

শিগগিরই যেন নেমন্তন্ন পাবো আমরা।

হিমাংশু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, সেই আশীর্বাদ করো তোমরা ভাই, সুপাত্রে মেয়ে দেওয়া ভাগ্যের কথা। ওদের আগ্রহ বরাবরই—তা আসল কথা খুলে বলি, আমাব নিজের গড়িমসি ছিল। সাতটা নয় পাঁচটা নয়, ঐ এক মেয়ে—বিয়ে দিলে তো পর হয়ে যাবে, কাছে কাছে যদ্দিন রাখা যায়। অন্তর্যামী তাই বুঝেই বোধহয় একটা ঝড় বইয়ে দিয়ে গেলেন। যা হবার হয়েছে, আর নয়। অবনী এসে যাচ্ছে, শ্রাবণের শেষাশেষি দিন ঠিক করে ফেলব।

খবরটা ঘরে-বাইরে চাউর হয়ে গেছে। কমলবাসিনী আহ্লাদে থই পাচ্ছেন না। অনীতার মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করে অনেকক্ষণ আশীর্বাদ করলেন, সর্বসুখী হও মা, একশ' বছর পবমায়ু হোক, পাকাচুলে সিঁদুর পরো।

বলতে বলতে মুখচোখেব ভাব কেমন হয়ে যায়। হিমাংশুর দিকে ফিরে বলতে লাগলেন, সন্ধ্যেবেলা তোমরা চলে গেলে দাদা, রাত পোহালে শুনি মাস্টার ছোঁড়াটাও উধাও। কত যত্নআত্তি করতাম, দশে-ধর্মে দেখেছে। তা এমনি ছ্যাঁচড়া, যাবার সময় মুখের একটা কথাও বলে গেল না।

সীতা ঘরের ভিতরে বোধ হয। সেই দিকে কটমট দৃষ্টি হেনে বলেন, হতভাগীর এমনি কপাল—নল-রাজার মতন পোড়া-শোলমাছও জ্যান্ত হয়ে জলে পালিয়ে যায়।

অনীতা বলে, দিদির ভোগে রুই-কাতলা। শোলমাছ পালিয়ে গেছে, ভালই তো হয়েছে!

কি হল কমলবাসিনীর—খপ করে আজকে তিনি অনীতার হাত জড়িয়ে ধরলেন।

তুই একটু দেখ্ মা, থুবড়ো মেয়ের একটা গতি করে দে। ইচ্ছে করলে সব'

তুই পারিস। বড় ভাল মন তোর, ঠাকুর ভাল করবেন। মিহির যেদিন এলো, তুই-ই তো কথাটা প্রথম ধরিয়ে দিলি—শেষে দাদাও বললেন। তখন থেকে মনে মনে ভেবে আসছি, গরিব হোক যা-ই হোক লেখাপড়ায় এত ভালো—শুধু ছেলেটা দেখেই মেয়ে দেবো। মেয়ের কপালে থাকলে ঘরবাড়ি ধনদৌলত পরে আসবে। সে আশায় ছাই পড়ে গেল। কি বলব মা, মেয়ের ভাবনায় চৌপহর রাতের মধ্যে আমি চোখের দু-পাতা এক করতে পারি নে।

বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন। অনীতারও চোখ ভারী হয়ে ওঠে।

কিছু ভেবো না পিশিমা। হবে একটা উপায়—আমি বলছি, নিশ্চয় হবে। তুমি ঠাণ্ডা হও।

নিজে সে আঁচলের প্রান্তে কমলের চোখ মুছে দিল।

বেরোবার মুখে এখনো অনীতা ফটকের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। বাপরে বাপ! ঘরটা যেন এক বিভীষিকা হয়ে ছোট জানলার পিটপিটে চোখে নজর রাখছে, বাড়ির কোন মানুষটা কাজকর্ম ফেলে বাইরে পালাচ্ছে। গা শিরশির করে সেই একরাত্রির কথা ভাবতে গিয়ে। মিহির চলে গেছে—ভাগ্যিস গেছে চলে এবাড়ি ছেড়ে! সেই কাণ্ডের পরে আবার তার মুখোমুখি দাঁড়ানো যেত কেমন করে?

অসুখে পড়ে একটা বছর নষ্ট হয়ে গেল। কি করা যাবে—উপায় ছিল না। কলেজে গিয়ে আবার অনীতা ভর্তি হয়ে এলো।

দিল্লি থেকে অবনী আসি-আসি করছেন। খুবই আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু শুভকর্মের পরবর্তী অবস্থা ভাবতে গিয়ে হিমাংশুর মন কেমন ঝিমিয়ে আসে। অলক প্রাকটিশ জমাতে পারছে না—ধৈর্যও নেই। তাই অবনী উঠে পড়ে লেগেছেন ছেলের একটা চাকরির জন্য। অবনী যখন লেগেছেন, জুটবেই চাকরি। চাকরি নিয়ে কলকাতা ছাড়লে তো দু-মাসে ছ-মাসেও মেয়েটাকে চোখের দেখা দেখতে পাবেন না। ম্লান হেসে হিমাংশু বলেন, ভর্তি হলি বেবি, কিন্তু অবনী রেখে যাবে তো কলেজে পড়বার জন্য? আমার মতন ভালমানুষ বাবা সকলে নয়।

অনীতা ঘাড় দুলিয়ে চলে, যে বাবা ভালো তারই কাছে থাকব আমি। হিল্লি-দিল্লি যাবোই না মোটে।

হাসেন হিমাংশু পাগলির কথায়। সে যাই হোক, যখনকার কথা তখন হবে, চলুক আপাতত পড়াশুনো। এই কলেজে পড়াই বরঞ্চ এক ছুতো পাওয়া যাবে মেয়েকে কাছে রাখবার।

মেয়েগুলো অনীতাকে ঘিরে ধরেছে, কি জব্দটা করলে ভাই অসুখ করে বসে। এত আয়োজন করে সমস্ত বরবাদ। শারদোৎসব শেষ অবধি হয়েছিল পাঁচটা গান আর গোটা তিনেক রেসিটেশন দিয়ে।

অনীতা বলে, আমার পার্টটা আর কাউকে দিয়ে দিলেই হত—

সে চেষ্টা হয় নি বুঝি? কেউ রাজি হল না। মুখস্থই হত না ঐ ক-দিনে। তার উপরে রিহার্শালের সময়ে তুমি যা সব কেদরানি দেখাতে, তাতেই আরও ঘাবড়ে গেল সকলে।

রেবা বলে, যা হবার হয়েছে। শোন্—কলেজের পঁচিশ বছর পুরে গেল, দেড় হপ্তা পরে রজত-জয়ন্তী। তুই এসে পড়েছিস, নাটকটা এই বাবে নামিয়ে দেবো।

অনীতা না-না করে। রক্ষে কর্ তোরা ভাই, এমনিই তো বিদ্যেসাগর—তার উপরে ঐ লম্বা অসুখবিসুখ মনের উপরে যেন রবার ঘষে ঘষে সমস্ত মুছে দিয়েছে। ভর্তি যখন হয়েছি, এবারে পড়াশুনো করব—হৈ-হল্লার মধ্যে আর নয়।

জানি গো জানি, খবর রাখি সমস্ত। হৈ-হল্লায় ইতি দিয়ে কোমর বেঁধে সংসার সামলাবি এবার।

রেবা তার গালে মিষ্টি ঠোনা দিল। বলে, তাই করিস ভাই। কিন্তু এদিককার সমস্ত তৈরি আছে, কিচ্ছু খাটতে হবে না তোকে। স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে শুধু তোর নিজের কথাগুলো বলে আসবি। ব্যস—

আর একটি মেয়ে বলে, অনেকদিন ধরে আমরা বড্ড আশা করে আছি অনীতা-দি—

রেবা হাত ধরে অনুনয়ের ভাবে বলল, 'না' বলিস নে তুই। শেষ বারই হয়তো তোর পক্ষে। কেমন লোক তারা, কে জানে—বউ হলে তার পরে কি আর স্টেজে নামতে দেবে?

পড়াশুনো মন থেকে একেবারে মুছে গেছে, এটা কথার কথা নয়—দু-চার দিন কলেজ করে অনীতা ভালরকম টের পাচ্ছে। কূল নেই, তল নেই—যেন অথই সমুদ্দুর। আর সেই প্রফেসর ঘোষ! তীক্ষ্ণ হাসি হেসে অনীতাকে তিনি আহ্বান করলেন, এসো এসো—বসে পড়ো ঐ ডাইনের বেঞ্চে। শরীর ভালমতো সেরেছে তো? অর্থাৎ অঙ্কের মুষলাঘাত সহনযোগ্য শরীর হয়েছে কিনা, সেই কথাটা শুভার্থীরূপে প্রথম দিন ঝালিয়ে নিলেন।

এ হেন বুনো-ওলের উত্তম প্রতিষেধক যে বাঘা-তেঁতুল—অসুখের মধ্যে কোথায় সে ছিটকে গেল! ঘোষে আর মিহিরকুমারে বরাবর যেন প্রতিযোগিতা চলেছিল—উনি কত অঙ্ক দিতে পারেন, আর মিহির কত কষে তুলতে পারে! অত চেষ্টাতেও হারাতে পারেন নি ইনি মিহিরকে। অনীতা নিমিত্ত মাত্র—দুই সেনাপতির সংগ্রামে সে শুধু ভগ্নদূতের কাজ করে গেছে। ঘোষের দেওয়া অঙ্ক টুকে নিয়ে এসেছে বাড়ি; আর মিহিরের কষা অঙ্ক পরিচ্ছন্ন ভাবে টুকে ঘোষকে নিয়ে দেখিয়েছে। এইটুকুতেও মাঝে মাঝে আলস্য লাগত—মিহির কষে দিয়েছে, ঠিক সেই আদি অবস্থায় নিয়ে দেখিয়েছে ক্লাসে। কেন, এক লোকের হাতের লেখা দুই রকম হতে পারে না বুঝি? বাড়িতে খুব যত্ন করে ধরে ধরে লেখে কিনা, তাই লেখাটা আলাদা ঢঙের হয়ে গেছে ক্লাসের থেকে।

বিপাকে পড়ে সেই একজনকে মনে পড়ছে কেবলই। বাড়ি এসে বাপের সঙ্গে শুষ্কমুখে কলি-তত্ত্ব আলোচনা করতে বসে, বাবা এ যুগে মানুষের ধর্মজ্ঞান নেই।

কি হল রে?

গাছে তুলে দিয়ে মই সরিয়ে নেয়। আমি অথৈ জলে, মানুষটা সেই সময়ে ডুব মেরে বসল। একটা দিন চোখের দেখাও দেখতে এলো না।

হিমাংশু বলেন, জানবে কেমন করে যে আমরা ফিরে এসেছি?

চলে যাবারই বা কি গরজ হয়েছিল? তুমি তো বলে যাও নি যে, তোমার বাড়ি থাকতে দেবে না।

অভিমান-স্ফুরিত কণ্ঠে বলতে লাগল, আপদ-বিদায় হয়ে গেল, আর ফিরে আসবে না—জেনে বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে সরে পড়েছে। কিন্তু তোমার

যে একগাদা টাকা জলাঞ্জলি দিয়ে ভর্তি হয়েছিল—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছ কেমন করে ?

হিমাংশু রাগ করে ওঠেন, অমন বলিস নে বেবি। টাকা আমার নয়, তারই খাটনির টাকা। যা-কিছু তার বাবদে খরচ করেছি—আমি জানি, কড়ায় গণ্ডায় সে খেটে শোধ করে গেছে। আর সেই মুড়ির জল খাইয়ে অত কষ্ট থেকে তোকে বাঁচিয়ে দিল, ছুটে গিয়ে ক-পয়সার মুড়ি কিনে আনল—সে-পয়সার ঋণ হাজার টাকা দিয়েও শোধ যাবে না। চিরজীবন আমি মিহিরের কাছে দেনদার হয়ে রইলাম।

একটু থেমে বললেন, দোষ আমারই। যাবার সময় তাকে মুখের কথাটা যাই নি, মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। অভিমানী ছেলে—কোন জোরে তারপরে সে আমাব বাড়ি পড়ে থাকবে ? আজকেই খোঁজখবর নেবো—কোথায় আছে, কেমন আছে।

হিমাংশুর কোন-কিছু মনে থাকে না—কিন্তু পরমাশ্চর্য ব্যাপার, এই প্রতিশ্রুতি মনে রেখেছেন। কোর্ট থেকে ফিরে খেতে খেতে সেই সব হচ্ছিল মেয়ের সঙ্গে।

ফোন করে ওদের কলেজে খবর নিলাম। পড়াশুনো চলছে ঠিকই। আছে—সোনারপুরের দিকে মামার একটা বাড়ি পেয়েছে, সেখানে। ফোন কবার পর মনটা কি রকম হল—কতদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই, চোখেই দেখে আসি একবার। হাকিমকে বলে এক ঘণ্টার জন্য কেস মুলতুবি রেখে বেরিয়ে পড়লাম।

বিরসমুখে বললেন, কষ্টেই আছে, বুঝতে পারলাম। ডেলি-প্যাসেঞ্জার হয়ে কলেজ করে। একা-একা থাকে, নিজে রান্না করে খায়। পায়ে ব্যাণ্ডেজ—বলতে চায় না কিছুতে—জেরা করতে করতে বেরুল, গরম ফ্যান পড়েছে। চেহারা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে।

অনীতা বলে, হবেই তো—হওয়া উচিত। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। পা গেছে—ওর উপর একটা শক্ত রোগ-টোগ হলে মান করে পালিয়ে থাকা

বেরিয়ে যাবে। খবরদার বাবা, এখানে থাকবার কথা-টথা কক্ষণো ছোট হয়ে তুমি বলতে যেও না।

তা-ও তো বললাম রে—অনেক করে বললাম—কানেই যোটে নিল না। শেষটা তোর নাম করে বললাম, বেবি এসে অবধি বলছে তোমার কথা—

মুখ রাঙা করে অনীতা বলে, আমি বলতে গেলাম কবে? বেশ মানুষ! এতও বলতে পারো বানিয়ে বানিয়ে!

বলছিলি তো—

ভ্রূভঙ্গি করে অনীতা বলে, বয়ে গেছে! কিছু তোমার খেয়াল থাকে না। আমি এক রকম বলেছি, তুমি শুনেছ অন্য।

হিমাংশু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, তা সে যাই হোক—এত করে বলেও তো আনতে পারা গেল না। ক-খানা নোট গুঁজে নিতে গেলাম—তা মুখে হাসছে, কিন্তু হাতের শক্ত মুঠি। ভারি শক্ত ছেলে!

অনীতা বলে, সোনারপুরের কোন জায়গায় থাকে, জেনে এলে না কেন ভাল করে?

কি দরকার—আসবেই না যখন।

আমার বাবার অপমান করে—গিয়ে শুনিয়ে আসব আচ্ছা করে?

হিমাংশু সন্ত্রস্ত হয়ে বলেন, সে কি কথা—অপমান করল কিসে? তার যদি এখানে না পোষায়। শহরে মাস্টারের অভাব নেই। বল্ তুই, কি রকম মাস্টার চাস—

অনীতা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, তার ঐ কায়দার পড়ানো আর কোন্ মাস্টার পারবে বাবা? ঘোষের সঙ্গে টক্কর দিয়ে চলত—অমন যে বাঘা প্রফেসর অঙ্ক কষে কষে তাঁকে একদম থ বানিয়ে দিত।

নিরিবিলি বসে অনীতা মিনিট খানেক ভেবে নিল।···হয়েছে। অত সহজে রেহাই পাচ্ছেন না মশায়। বাবার মতন ভালমানুষ সংসারের সকলেই নয়। চলো ভাই ঝড়ু-দা, বেড়িয়ে আসিগে। সেই যে একদিন জুতো দিয়ে এসেছিলে —মেসটা তোমার মনে আছে তো?

ঝড়ু বলে, মেস নয় দিদি, মৌমাছির চাক। মাস্টার আবার সেইখানে উঠেছে নাকি?

সে তবু মন্দের ভালো। যতই হোক শহরের ভিতরে। গেছে কোন ধাপধাড়া গাঁয়ে। যে দরের মানুষ, তেমনি জায়গা চাই তো। ভাল ঘরবাড়িতে হাঁফ ধরে যায় ওদের। তাই দেখলে না—তোমাকে চিলেকোঠায় পাঠিয়ে কত কষ্টে একটা ঘর সাফসাফাই করলাম, সেটা বাতিল করে দিয়ে দারোয়ানের গুমটিতে উঠল। সেখানেও সোয়াস্তি হয় নি, আমার অসুখের গোলমালে আবার ছিটকে পড়েছে।

ঋড়ু সায় দিল না, এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিম্নস্বরে বলে, না গিয়ে করবে কি বেচারা? যা কথার ধার পিশিঠাকরুনের! জানো না তাই। গায়ে মানষের চামড়া থাকলে সে সব কথার পরে কেউ টিকে থাকতে পারে না।

অনীতা বলে, আমার অসুখে বাড়িসুদ্ধ সকলের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ঋড়ু-দা। একটু হেসে বলে, আমার নিজেরও।

ঋড়ু বলে, ঐ অসুখের মধ্যেই আবার কত যত্ন দেখেছি! নিত্যি নতুন নতুন খাবার বানিয়ে খাওয়ানো। তোমাদের চলে যাবার দিনটায় হঠাৎ কি হয়ে গেল। যেন দাঁতে পিশে মারেন ছেলেটাকে! সামান্য চায়ের ব্যাপার—চা-বিস্কুট কোনদিন সে খায় না—তাইতে বলে দেওয়া হল, টাকা খরচ করে বাইরে গিয়ে খেতে।

অনীতা রাগ করে বলে, বাবা যত্ন করে বাড়িতে এনে রাখলেন, আর পিশি তাড়িয়ে দিলেন?

তাইতো হয়ে দাঁড়াল দিদিমণি—

অনীতা ভেবে নেয় অবস্থাটা। তারিখ হিসাব করে দেখে। গিয়ে পড়বে নাকি কমলবাসিনীর কাছে—সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করবে, মনে মনে কি ভেবে বসে আছ, এত সঙ্কীর্ণ মন তোমার? রাগ করতে গিয়ে কিন্তু হাসি পেয়ে যায়। অনেক দিনের লালিত আশা ভেঙে চুরমার হল, তাই পিশির ঐ পাগলামি। হাসি নয়—আর ভাবতে গেলে অনীতার চোখে জল এসে যাবে। আঁচল দিয়ে সেদিন পিশির চোখের জল মুছে দিয়েছিল—এই যত ছেলেমানুষি সেই চোখের জলেরই রকমফের। মিহিরের তো ঐ অবধি হয়েছে, আর সীতার উপরেও চোরা-গোপ্তা কতদূর হামলা চলেছে, কে জানে!

অনীতা বলে, অকূল পাথারে পড়েছি ঋড়ু-দা। ঐ মাস্টার ছাড়া কেউ

আমায় তরাতে পারবে না। বাবা তো ফেল হয়ে ফিরে এসেছেন—চলো দিকি, আমরা দু-জনে গিয়ে পড়ে হাতে-পায়ে ধরে যদি রাগ ভাঙাতে পারি।

বলতে বলতে খিল-খিল করে হেসে ওঠে, পা ধরা যাবে না তো—হাতে ধরে যদ্দুর হয়। পায়ে এত বড ব্যাণ্ডেজ। ফ্যান গালতে গিয়ে সমস্ত ফ্যান পায়ের উপর ঢেলেছে।

ঝড়ু শিউরে ওঠে, বলো কি গো?

অনীতা প্রশ্ন করে, ফ্যানে পুড়ে গেলে কি হয় ঝড়ু-দা?

হাঁটতে পারে না—

সে তো ভালোই। শুয়ে থাকে বিছানায়, বিশ্রাম হয়—খারাপ শরীবের পক্ষে সেটা ভালো। কিন্তু তা হচ্ছে কই? কলেজে যাতায়াত চলছে ঐ অবস্থায়—অদ্দুর থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জাব হয়ে। পুড়ে-টুড়ে গেলে আর কি হতে পারে, তাই বলো—

ঝড়ু প্রণিধান করে বলে, জ্বালাযন্ত্রণা হয়, টাটায়—

অধীর হয়ে অনীতা বলে, হোক গে। বলি, প্রাণের ভয়টয় নেই তো?

ঝড়ু বলে, আছে বই কি। শীলেদের বাড়ির বউটার কি হল—গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিযেছিল। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ঘা আরাম হল, কিন্তু সর্বশরীর ধনুকের মতন বেঁকে মরে গেল।

কি সর্বনাশ বলো তো! একা একা থাকে মানুষটা—ধনুষ্টঙ্কার হলে ডাক্তার ডেকে দেবারও যে লোক হবে না, খবর নিয়ে আসা উচিত, কি বলো ঝড়ু-দা?

ঝড়ুর হাঙ্গামা পোয়াবাব উৎসাহ নেই। বলে একটু ছ্যাঁকা লাগলেই কি হয় রে দিদিমণি?

অনীতা বলে, না হলেই ভাল। কিন্তু বাবা বলে দিয়েছেন গিয়ে একবার দেখে আসতে। বাড়িব কর্তা—তাঁর কথা ফেলবে কি করে? এদ্দিন এখানে ছিল—বাবার বড্ড মায়া পড়ে গেছে। তোমারই মতন ঝড়ু-দা। গাড়ি নিয়ে যাবো—শহরের বাইরে বেশ হাওয়া খেয়ে আসা যাবে, কষ্ট হবে না। আগে মেসে গিয়ে জায়গাটা ভাল করে জেনে নিতে হবে। সেই যে কোন আত্মীয় আছেন, তিনি ঠিক বলে দিতে পারবেন—

চাঁপাতলার মেসে একতলা দোতলা তেতলায় হীরালালকে খুঁজছে। মেসের লোকেরা জবাব দেবে কি—হাঁ হয়ে দেখছে পরমাশ্চর্য মেয়েটাকে। প্রসাধনের স্নিগ্ধ সুবাস মেসের ঘরে ঘরে প্রথম এই সঞ্চরণ করে, হাই-হিল জুতোর ঠুক-ঠুকানি এই প্রথম শোনা যায়।

হীরালাল ফেরেন নি এখনো অফিস থেকে। দশ জায়গায় খদ্দের জোটানো ওঁর কাজ—কখন ফিরবেন, ঠিকঠিকানা নেই। দুর্ভোগ একটু-আধটু। শেষটা অনীতা রাস্তার মোড়ে মোটরে গিয়ে বসে। আর সদর-দরজার কবাট ধরে দাঁড়িয়ে রইল ঝড়ু। হীরালাল যখনই আসুন, এই পথ ছাড়া ঢোকবার জো নেই।

ঠিকানা পাওয়া গেল। জায়গাটা ঠিক সোনারপুর নয়, সোনারপুর থেকে অনেকটা যেতে হয়। শহরের কাছাকাছি এমন জঙ্গুলে জায়গা থাকতে পারে, চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না।

রাস্তার ধারে চালাঘর—হীরালাল যেমন-যেমন বলে দিয়েছেন। হাটের দিন এখানে বসে তেল-কেরাসিন বিক্রি করে ; এখন ফাঁকা। ডান-দিক দিয়ে সুঁড়িপথ গিয়েছে। গাড়ি বড়-রাস্তায় চালাঘরের পাশে রেখে তারা ডাইনের পথে নামল।

ঝড়ু আগে আগে চলেছে। বাঁশঝাড় আশশ্যাওড়া ও বনকচুর জঙ্গল—তারই মাঝে মাঝে অস্পষ্ট পথচিহ্ন। আর এক মুশকিল—বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগে, এখানে ওখানে জল জমে আছে। পা টিপে টিপে সামাল হয়ে এগুতে হয়। নয়তো আছাড় খাবে, অতন্ত পক্ষে জল ছিটকে উঠে স্নান হয়ে যাবে অবেলায়।

আর কদ্দুর রে বাবা !

বুড়োমানুষ ঝড়ুর কষ্টটাই বেশি। সে খিঁচিয়ে ওঠে, চলো চলো—বলেই তো দিল আধক্রোশ পথ। ওসব মানুষের হল ডাল-ভাঙা ক্রোশ—একটা ডাল ভেঙে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন পাতা শুকিয়ে যাবে, তখনই ক্রোশ পুরল। হয়েছে কি এখনো—যা গতিক, পায়ে খিল ধরে যাবে রাজবাড়ি গিয়ে উঠতে এমন জায়গায় মানুষে আসে।

অনীতা বলে, ইচ্ছে করে যাচ্ছি বুঝি ! বাবা যে হুকুম করে বসলেন—না না এলে রক্ষে ছিল ? আমার হয়েছে বিষম জ্বালা—হুকুম তামিল করতে করতে জীবনটা গেল।

বিস্তর কষ্টে পৌঁছানো গেল অবশেষে। ঘোর হয়ে গেছে। পুরানো একতলা বাড়ি, ডালপালা-মেলা বটগাছ সামনের উঠানে। অতএব এই বাড়ি

সন্দেহ নেই। পা টিপে টিপে এগুনো যাক—অবাক করে দিতে হবে মিছিরকে।

কা কস্য পরিবেদনা! মানুষজন নেই কোন দিকে। দালানের দরজায় এই-বড় এক তালা ঝুলছে।

অনীতা চিন্তান্বিত হয়ে বলে, পোড়ো-বাড়ির মতন মনে হচ্ছে। ভুল হল কিনা, কে জানে!

ঝড়ু রোয়াকে বসে পড়ে হাঁপাচ্ছিল। মুখ বিকৃত করে বলে, মামার বাড়ি মুফতে পেয়েছে। মাংনা পেলে লোকে আস্তাকুড়ে আস্তানা গড়ে। এ তবু মাথার উপরে ছাত, চারদিকে ইটের দেয়াল—

অনীতাও স্বর বদলে বলে, না—নিন্দের এমন কি! বাড়িটা একটু পুরানো—কিন্তু কি সুন্দর জায়গা, বেশ কেমন ছবির মতো!

ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে ওঠে হঠাৎ।

উঃ, কত পেয়ারা হয়ে আছে দেখ না—

পেয়ারা এখন চার আনায় কুড়ি বিকোচ্ছে।

কিন্তু এমন গাছের পেয়ারা—

সব পেয়ারাই গাছে ফলে দিদিমণি—

মুখ বেজার করে বসে আছে ঝড়ু। বটের গুঁড়ি ঠেসান দিয়ে সে চোখ বুজল। আফিঙের ধাত—মৌতাতের সময় হয়ে এলো, কোন কিছু আর ভাল লাগছে না।

ঢপাস করে এক আওয়াজ। গাছ থেকে তাল পড়লে যেমনটা হয়। গা ঝাড়া দিয়ে ঝড়ু চোখ মেলে। কিন্তু তাল পাকবার সময় এটা নয়, তাল হবে কি করে? তালগাছ নেইও ওদিকে।

দিদি দিদিমণি! এই সর্বনাশ, দিদিমণি তুমি পড়ে গেছ?

বেকুবের হাসি হাসছে অনীতা, না রে—

তবে পেয়ারা তলায় কেন?

ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা জায়গাটা—এই গড়াচ্ছি একটু।

কাপড় ছিঁড়ে ফালি-ফালি, সর্বগায়ে কাদা লেপটে গেছে। ভিজে গাছে চড়েছিলে তুমি—পড়ে গেছ।

অনীতা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, বকাবকি না করে হাতটা ধরো ঝড়ু-দা। ওঠা যাচ্ছে না দেখতে পাও না?

ধরে তুলতে হয়, এমনি অবস্থা। লেগেছে খুবই—ও মেয়ে বলেই টরটর করে কথা বলছে, হাসছেও। হাড়গোড় ভাঙলো কিনা কে জানে?

ঝড়ুর শঙ্কিত মুখের দিকে চেয়ে অনীতা বলে, কিছু হয় নি রে—একেবারে কিছু না। পুকুরঘাটে যাই চলো, কাদাটাদা ধুইগে।

এই ডাকাতপনার জন্যে মারা পড়বে একদিন—

তোমাদের শাসনের ঠেলায় যাবো মরে। একবার বাবা শাসন করবে একবার তুমি। তার উপরে আবার জুটেছেন এখন পিশি।

এককালের বাঁধানো পুকুরঘাট এখন ভেঙে চৌচির। ফাঁকের ভিতর দিয়ে গাছগাছালি উঠে জঙ্গল এঁটে গেছে। ঝড়ুর উপর ভর দিয়ে অনেক কষ্টে একটা সিঁড়ির ধারে গিয়ে বসল। অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে আসে, মাগো—

সঙ্গে সঙ্গে সামলে নেয়, কিছু না। আঁচলা ভরে জল দাও তুমি ঝড়ু-দা। কাপড়-চোপড় গা-হাত-পা ধুয়ে ফেলি।

মিহির বাড়ি ফিরে ঘাটে আসছে হাত-পা ধুতে। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, অল্প অল্প জ্যোৎস্না উঠেছে। ঝোপজঙ্গলের মধ্যে ভাল ঠাহর হয় না, থমকে দাঁড়াল।

কে?

অতিথ আমরা মশায়, অনেক দূর থেকে আসছি। ক্ষিধে পেয়েছে, রান্না চাপান দিকি গিয়ে। খুব নাকি রান্নাবান্না করেন একা একা—কেমন করে রাঁধেন দেখব, আর কেমন রাঁধেন তা-ও খেয়ে যাবো।

পায়ের দিকে তাকিয়ে অনীতা বলে, খোঁড়াচ্ছেন কই মাস্টার মশায়?

খোঁড়াতে যাবো কেন?

ভাত রাঁধতে গিয়ে ফ্যান নাকি গামলায় না ঢেলে পায়ের উপর ঢেলেছিলেন?

মিহির হেসে বলে, দু-এক ফোঁটা পড়ে একটু ফোস্কা উঠেছিল—দু-দিন নারকেল তেল দিতে সেরে গেছে। তার যশ এদেশ-সেদেশ ছড়িয়ে পড়েছে, দেখতে পাচ্ছি।

মিহির বিমুগ্ধ চোখে দেখছে অনীতাকে। মুখ টিপে হেসে অনীতা বলে, অমন চেয়ে আছেন কেন ?

সলজ্জে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে মিহির তাড়তাড়ি বলে, কেমন করে বাড়ি খুঁজে এলেন, বলুন তো ?

আপনি পয়লা দিন যেমন করে খুঁজে খুঁজে পৌঁছেছিলেন—

আমার হল মামাব বাড়ি—সেই বৃন্দাবনের মামা। এখানে অন্য এক আত্মীয় ছিলেন—তাঁরা চলে গেলেন। বাড়ি খালি পড়ে থাকলে রিফিউজিরা দখল করবে—আমায় তাই বাববাব লিখছিলেন। আমিও ভেবে দেখলাম, ভর্তি যখন হওয়া গেছে,—পাশ কবতেই হবে। পড়াশুনোব পক্ষে এমন নিরিবিলি জায়গা আব কোথাও পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন কবে, কতক্ষণ এলেন ? বসেছেন এ আয়গায কেন ?

আপনি ছিলেন না—কি কবব, স্বভাবেব শোভা দেখছি। বাবা বললেন, পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আপনি চলাফেবা কবছেন। পোডাঘায়ে বড্ড ধনুষ্টঙ্কাব হয়—আমায় তাই পাঠিয়ে দিলেন, জোব কবে আপনাকে শুইয়ে বেখে ডাক্তার ডেকে অষুধ-পথ্যির ব্যবস্থা কবতে।

ঝড়ু বিরক্ত মুখে বলে, নিজেবই এখন ডাক্তাব ডাকাব ব্যাপাব—

মিহির ব্যস্ত হয়ে ওঠে, কি হয়েছে ?

ঘাড নেড়ে অনীতা উডিয়ে দেয়, কিছু না ঝড়ু-দাব যেমন কথা! পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম একটু। শুনুন, পরশু থেকে যাবেন কিন্তু পড়াতে। বাবাকে ফিরিযে দিয়েছেন, কিন্তু আমার সঙ্গে পেবে উঠবেন না। পরশু সোমবার আছে, আপনাব নিজেব বাব। আব এদ্দিন পরে কালকে সেই থিয়েটার হচ্ছে আমাদের। আপনাকে নেমন্তন্ন করতে এলাম। যাবেন কিন্তু। যাবেন, যাবেন, যাবেন। দেখবেন গিয়ে, খুব একেবারে নিন্দের হবে না।

মিহির বলে, তাইতো মনে হয়। যা খাটনি খেটেছিলেন—এগজামিন বলে একটু গ্রাহ্য করতেন না।

যাচ্ছেন তা হলে ?

আমি বুঝি নে ও সব—

অনীতা বলে, গিয়েই দেখুন না। খাস বঙ্গভাষায় কথা বলবে ঘরের মেয়েরা না বোঝবার কিছু নেই—

মিহির বলে, গেঁয়ো মানুষ আমরা—মেয়েদের গৃহস্থালির রূপটাই দেখি। হাজার জনের মন-ভোলানো এই সব ব্যাপারে আমাদের ধাঁধা লেগে যায়।

অনীতা বলে, হাজার লক্ষ নিয়ে যে জগৎ! আমরা শুধুই আর ঘরেরটি নই, জগতের। কিন্তু এ সমস্ত আপনার রাগের কথা। ঐ যে পালিয়ে ক'টা দিন রিহার্সালে গিয়েছিলাম। সে তো প্রায় বছর হতে চলল—এখনো তাই মনে গেঁথে রেখেছন। এবারে কথা দিয়ে যাচ্ছি কালকের দিনটার পরে পরশু থেকে বাড়ি ছেড়ে এক পা নড়ব না। দেখতে পাবেন এবারে। উঃ, কি ভয়ানক রাগি লোক আপনি!

মিহির হেসে বলে, রাগের কথা নয়। মা এসে পড়েছেন—আমার সময় হয়ে উঠবে না।

অনীতা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কই, দেখতে পেলাম না মাকে—

এলেন এই এখনই। তাঁকে আনতে স্টেশনে গিয়েছিলাম।

কেমন এক বিহ্বল কণ্ঠে অনীতা প্রশ্ন করে, আপনার মা?

মিহির বিরক্ত হয। উকিলের মেয়ে জেরা করছে। বলে, হ্যাঁ, গরিব মানুষেরও মা থাকে।

অনীতা বলে, বড়মানুষের থাকে না। গরিবেরা ভাগ্যবান।

গলা ধরে আসে যেন। অনীতা উঠে দাঁড়াল ঝুঁকে-পড়া পিত্তিরাজের ডালটা ধরে।

মার কাছে যাই চলুন—

মিহির ইতস্তত করে। আকুতি-ভরা চোখে মিহিরের দিকে তাকিয়ে অনীতা বলে, যাবেন না নিয়ে?

মা হলেন নিতান্ত সেকেলে। আপনারা—মানে এই আধুনিক মেয়েরা—

অনীতা বলে, আধুনিক আমরা যত ইতরই হই, মায়ের অসম্ভ্রম কখনো হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

মিহির বলে, বরঞ্চ উল্টোটাই ভাবছি। মা যদি কোনরকম কিছু বলে বসেন! সেকেলে মানুষ—ওদের কথাবার্তার ধরন আলাদা কি না?

যা কথা বলবেন মেয়ের সঙ্গে—তার আবার ধরনধারন কি? আপনার ভাবতে হবে না মাস্টার মশাই—যখন এসে পড়েছি, মায়ের সঙ্গে দেখা না করে কিছুতে যাচ্ছি নে। তা যতই আপনি তাড়াবার ফিকির করুন।

কিন্তু এ কি হয়েছে বলুন তো, এই কাদামাখা কাপড়চোপড়—

তা বটে! যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায় অনীতা। নিজের দিকে নজর বুলিয়ে হাসে। কাদামাখা হলেও ক্ষতি ছিল না—পেয়ারার ডালে ছিঁড়ে কুটিকুটি হয়েছে—পাগলের সজ্জায় গেলে মায়ের কাছে তাড়া খেয়ে মরব। একখানা কাপড় দিন না, শাড়িটা বদলে নিই—

আমার তো ধুতিকাপড়—

ধুতিই দিন। মায়ের কাছে যাব, সাজবাহার কিসের?

এ খেয়ালীকে নিরস্ত করবে, হেন সাধ্য ত্রিভুবনে কারো নেই। জুতোজোড়া খুলে রেখে দিল ঝড়ুর কাছে। গুটিগুটি পরম এক লজ্জাবতী যেন চলেছে।

মিহির বলে, পরুন না জুতো। রোয়াকে উঠে তারপর খুলে রাখবেন। খালি-পায়ে চলা আপনার অভ্যাস নয়—দূর্বাঘাস পায়ে ফুটছে।

মিহিরের কথায় অনীতা মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে, মেয়েছেলে নরম-সরম হয়ে চলব না—লড়াইয়েব সওয়ার হব নাকি?

সামনে রোয়াক, ওদিকে দরদালান—তার পিছনে পাশাপাশি ঘর দুটো। দালানের দেয়ালে মাঝারি গোছের আয়না ঝোলানো। হেরিকেন তুলে ধরে অনীতা আয়নায় দেখে নিচ্ছে ভাল করে। চেহারা দিব্যি খুলেছে তো! মুখের পাউডার, ঠোঁট আর গালের রং ধুয়ে নিশ্চিহ্ন। বিনুনি খুলে ভিজে চুলের রাশ ছাড়িয়ে দিয়েছে কাঁধের দু-পাশ দিয়ে।—এমন দীর্ঘ ঘন কালো চুল তার! মিহিরের মোটা ধুতি পরনে, ডান হাতে দু-গাছা মাত্র চুড়ি—বাঁ-হাত কাপড়ের নিচে ঢেকে দিল, হাতঘড়ি নজরে এসে ছন্দোভঙ্গ না হয়।

অন্নপূর্ণা আহ্নিকে বসেছেন। মিটিমিটি দীপ জ্বলছে কুলুঙ্গিতে। কোন গরিব ঘরের শামলা মেয়ে জড়সড় হয়ে ঘরে ঢুকল।

দাঁড়াল এক মুহূর্ত। তারপর বসে পড়ল খালি মেঝের উপর। আহ্নিক শেষ করে অন্নপূর্ণা তাকালেন। অনীতা ধুতির প্রান্ত গলায় বেড় দিয়ে গড়

হয়ে তাঁকে প্রণাম করল। এত-ও জানে! রীতিমতো এক অভিনয়—আগামীকাল যে নাটক করবে, তার চেয়ে কম কিসে? শান্তশুচি ভক্তিমতী বঙ্গকুমারীর পার্ট অভিনয় করে যাচ্ছে।

দালান থেকে উঁকি মেরে দেখে হাসতে হাসতে মিহির বেরিয়ে পড়ল। একটু মিষ্টি মুখ তো করাতে হবে—দোকানে চলল সেই যোগাড়ে।

এক নজরেই মেয়েটিকে অন্নপূর্ণার ভাল লেগে গেল।

কোথায় থাকো তুমি?

অনেক দূরে মা—নিমতলার ধারে সেই কাঠের গোলাগুলো আছে না, সেই পাড়ায়। আপনার ছেলে পড়াতেন আমায়। আজকাল আর যাচ্ছেন না। আবার শোনা গেল, গরম ফ্যানে পা পুড়ে গেছে নাকি। পোড়া-ঘা থেকে অনেক সময় খারাপও হয়ে দাঁড়ায় কিনা—বাবা তাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, বাসায় গিয়ে দেখে আয় একবার বাছাকে। বাবা খেটে খেটে সময় পান না, ঝড়ু-দাকে নিয়ে চলে এসেছি। এসেছি কি এখন? বিকেল থেকে এসে বসে আছি মা—

কথার তুবড়ি মেয়েটা, শুনতে বেশ লাগে। মিষ্টি গলা, যেন গানের সুর। কষ্টের কথা বলছে, চোখ দুটো হাসছে তবু। অন্নপূর্ণা গলে গেলেন। মিহির একা পড়ে থাকে এই জায়গায়—নির্বান্ধব স্থানে একজন তবু আছেন, পায়ে একটু ফ্যান পড়েছে শুনে যিনি ব্যস্ত হয়ে মেয়ে পাঠিয়ে দেন।

অন্নপূর্ণা বলেন, তা যাচ্ছে না কেন পড়াতে? কি বলল?

জিজ্ঞাসা করে দেখি নি—

পায়ের নখে মেজেয় দাগ কাটতে কাটতে বলল, বাবা সে রকম কিছু দিতে পারেন না তো! বুঝলেন মা, পড়াশুনোর বড্ড ইচ্ছে আমার। কষ্টেস্থষ্টে কোন গতিকে চালিয়ে যাওয়া—নইলে অবস্থা আমাদের সে রকম নয়।

অন্নপূর্ণার কষ্ট হচ্ছে। আহা গরিব-ঘরের মেয়ে—লেখাপড়ার জন্যে এতদূর অবধি চলে এসেছে! এসে তবু লজ্জায় কিছু বলতে পারছে না মিহিরকে।

অনীতাও বুঝে ফেলেছে তাঁর মন। ঠিক সময়ের ঠিক কথাটা মুখে যেন হাজির থাকে।

কাইন্সালের এই বছরটা যদি একটু পড়িয়ে দেন দয়া করে—

অন্নপূর্ণা অভয় দেন, আমি বলে দেবো ওকে। আমার শ্বশুর ঠাকুর বাড়িতে ইস্কুলের ছেলে রাখতেন, তাদের মাইনেপত্তোর যোগাতেন। আর ওটা এমনি

ব্যবসাদার হয়ে উঠেছে—তুমি ভেবো না মা, কাল থেকে যাতে যায় আমি তার ব্যবস্থা করব।

জয়ের হাসি ঝিকমিকিয়ে উঠল অনীতার মুখে।—আর যে সময় হবে না মোটেই! মায়ের কথা—হাইকোর্টের রায় তার স্বপক্ষে। এবারে কেমন করে 'না' বলা হয়, দেখা যাবে।

অন্নপূর্ণা একটু ভেবে ঘাড় নাড়লেন। উঁহু, কাল নয়—বিয়ের কথাবার্তা চলছে, সাত নয় পাঁচ নয় একটি ছেলে আমার—নিজে আমি বউ পছন্দ করতে এসেছি। ক'টা দিন খুব ছুটোছুটি আছে এখন।

অনীতা হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। অন্নপূর্ণা আপন মনে বলছেন, বৃন্দাবনে দাদাব শরীর বড খাবাপ হয়ে পডেছে। বাব বাব লিখছেন, তাঁর কাছে গিয়ে থাকতে। আমারও সেই ইচ্ছে—গোবিন্দজীব পাদপদ্মে ভাইবোনে বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দেবো। কিন্তু এখানেও আমার যে অনেক গোবিন্দ! ভাসুরপোরা আছে—তাদের ছেলেপুলে সকাল হতে না হতে ট্যাঁ-ভ্যাঁ লাগিয়ে দেয়। কোমরে আঁচল বেধে এতগুলো গোবিন্দেব সেবা করবে, তারই এক শক্ত সেবাইত খুঁজছি। তার কাঁধে ভাব চাপিয়ে আমার ছুটি। যে-সে মেয়ের সাধ্য আছে এত ধকল সামলানো?

অনীতা হঠাৎ চুপ হযে যায়।

অন্নপূর্ণা বললেন, তুমি মুখ আঁধাব করছ কেন মা? তিনটে কি চারটে দিন এই সব হাঙ্গামা। তারপবে আমি চলে যাচ্ছি। বলে যাবো, ঠিক মতো যাতে পডাতে যায় এবার থেকে।

অনীতা বলে, তার জন্য কি হয়েছে মা? তিন-চার দিন পরেই বা কেন, মাঝখানে আবার কামাই হবে তো—শুভকর্ম মিটে যাক, গণ্ডগোল চুকে গেলে তার পবে না হয়···কবে বিয়ে?

অন্নপূর্ণা বলেন, এ বিয়ে হয় কি না হয়! চল্লিশ ভরি সোনা গায়ে নিয়ে আসবে বউ—কিন্তু মনে মনে কি ওজনের দেমাক বযে আনবে, সে তো জানি নে!

খুব বড়লোকের মেয়ে বুঝি?

ঢডকবাড়ির ঘোষেরা। ছেলের কথা শুনে বড্ড ঝুঁকেছে। বলছে, শহরে

বাড়িও করে দেবে মেয়ে-জামাইর জন্য। ঐ শুনে আরও ভয় হয়েছে। আমার অমন সংসার তবে কি উচ্ছন্ন দিয়ে এসে উঠবে ?

আবার বলেন, আমার বেহাই সম্পর্কের একজন থাকেন এখানে, তিনি বড় ধরাপাড়া করছেন। কিন্তু একটি মাত্র ছেলে আমার—পরের কথায় নাচলে তো হবে না ! মেয়ে নিজের চোখে দেখতে এসেছি সেইজন্য। কাল সকালে বেহাই এসে মেয়ের বাড়ি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

অনীতাকে বলেন, তোমার নামটা তো কই এখনো বললে না মা—

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেন কুলশীল গাঁইগোত্র। অনীতা কতটুকুই বা জানে, কি জবাব দেবে ! অন্নপূর্ণার ভাব বুঝে লজ্জায় আরো যেন কথা বেরোয় না মুখ দিয়ে। আহা, বড ভালো মেয়েটা, অন্নপূর্ণা বুকের মধ্যে জডিয়ে ধরলেন।

তবে তো পালটি ঘর আমাদের !

হাত দু-খানা ধরে অনীতাকে বললেন, আমায ঘরেব লক্ষ্মী হবে তুমি ? ছেলে বরাবর জলপানি পেয়েছে, ঝুলোঝুলি করছে চড়কবাড়ির ওরা। কিন্তু বড়লোকের ঘরে আমি কাজ করতে চাই নে। বড়লোকের মেয়ে ভাল হয় না—বডলোকের বাবু-মেয়ের সাধ্যি আছে আমাব সংসারের ধকল সামলানো ? আমাদের যেমন অবস্থা, তেমনি ঘরের মেয়ে আনা উচিত। কি বলো ?

অনীতা মিটিমিটি হাসে।

তা-ও তো বটে ! তোকে এসব কথা জিজ্ঞাসা কবি কেন ?

মুখখানা তুলে ধরে হেসে বললেন, তা শুনেই নিলাম না হয় মনের কথাটা। মায়ের কাছে এত লজ্জা কিসের রে ?

তখন অনীতাব মুখে কথা ফোটে, মাগো—যা করে বেডায় বড়লোকের মেয়েরা।

অন্নপূর্ণা বলেন, এক বড়লোকের মেয়েকে পড়াত মিহির—থাকত সেখানে। সে বাডি ছেড়ে দিয়ে এখন এই কষ্ট করে আছে। এমন ঘেন্না হয়েছে—কি বলে জানিস ? মরে গেলেও মা, কারো বাড়ির অন্নদাস হব না আর কখনো।

অনীতা প্রশ্ন করে, মেযেটা খুব বাঁদর বুঝি ?

মেয়ের দোষ কি অন্য কারো দোষ—সে আমি জিজ্ঞাসা করি নি। কিন্তু বড্ড বেশি লেগেছে ওর মনে। ছেলে আমার কম দুঃখে এত বেঁকে বসে নি।

অনীতা চুপ করে থাকে। কিন্তু কতক্ষণ! তারপরে বিপুল উৎসাহে চলল ঐ বড়লোকের নিন্দেমন্দ। মেয়েরা আবার মেয়েদের দেখতে পারে না কিনা! অনীতা বলে, হতে পারে মেয়েটাই যত নষ্টের গোড়া।

অন্নপূর্ণা ঘাড় নাড়েন, তা বটে! বড়লোকের মেয়েদের ঝাঁজ বড্ড বেশি। ভিতরে সারবস্তু থাকে না কিনা—

অনীতা রসান দেয়, সারাদিন কেবল সাজই করছে, সাজই করছে। এ শাড়ি পরল একবার, সেটা ছেড়ে আর এক শাড়ি—

অন্নপূর্ণা হেসে বলেন, বাইরের চমক শুধু। চিংড়িমাছের দাঁড়া-খোলা। সেগুলো ফেলে দিলে আর তখন তাকানো যায় না—

অনীতা বলে, মুখে রং মাখে—নখে রং। নাচনা-গাওনা করে মানুষ-জনের সভায়। মাগো মা—

খুব জমেছে। ঝড়ু বার কয়েক তাগিদ দিয়ে গেছে ফিরবার জন্য। অনীতা কানে নেয় না। শেষটা ঝড়ুরও সাড়া নেই, ঝিমোচ্ছে কোন জায়গায় বসে।

তারপর মিহির এসে পড়ল! হেসে বলে, বড়লোকের মেয়েরা লজ্জায় দেশ-ছাড়া হয়ে গেছে এতক্ষণে। আর কাজ নেই। চাঁদ ডুবে গেল, উঠে পড়ুন এবারে—

অনীতা নালিশ করে, শুনলেন মা? ছাত্রী আমি তো বটে, তা মাস্টার মশায় কেবল 'আপনি' 'আপনি' করবেন।

অন্নপূর্ণা গর্বের দৃষ্টিতে ছেলেব দিকে চেয়ে বললেন, ঐ রকম! মেয়েছেলের সামনে একেবারে জবুথবু—আজকালকার ছেলের মতো নয়।

আমার যে লজ্জা করে। বলে দিন না, 'তুমি' বলে ডাকতে। থুথুড়ে বুড়ি নাকি যে অত বড় বিদ্বান মানুষটা সমীহ করে চলবেন?

অন্নপূর্ণা আদর করে বলেন, বুড়ি কেন হবে? আমার তুলতুলে একরত্তি মা টুকুন—

আর, বলে দিন সেই কথা—সেই যে আমায় পড়াতে যাবেন—

যাবি পড়াতে মিহির। কি নিষ্ঠা রে লেখাপড়ায়! দিশা না পেয়ে এন্দুর বেচারি ছুটে এসেছে।

এক নজর মিহিরের দিকে বিজয়দৃষ্টি হেনে পায়ের ধুলো নিল অনীতা। কেমন মশায়, পড়াতে যাওয়া হবে না যে! অন্নপূর্ণা তার চিবুকে হাত দিয়ে আঙুলগুলি ওষ্ঠে ছোঁয়ালেন। বললেন, আমি তো চলে যাচ্ছি। তোমার বাবার মত থাকলে একবার যেন যান আমাদের গাঁয়ে। খোড়োঘর অবিশ্যি— কিন্তু দুটো গোলা, আটটা দোওয়া-গাই গোয়ালে। আমি আর কি বলব, নিজে গিয়ে চোখে দেখে আসবেন।

অনীতা ঘাড় নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। স্নেহকণ্ঠে অন্নপূর্ণা বললেন, কি পাগলের মতো বকছি! বিয়ের কনে কথা তুলবেই বা কি করে? আমারও গায়ে পড়ে চিঠি লেখা চলে না। দেখি, কোন ঘটক যদি লাগানো যায়—

মাথায় কাপড় তুলে দিল অনীতা—ঘোমটা-দেওয়া এক বউ চলেছে। কুমারী মেয়ে মাথায় কাপড় দেয় না—কিন্তু এ সব তত্ত্ব অনীতার অজানা। কিসে কোন দোষ ঘটবে, তাই একটু অধিক মাত্রায় সামাল হয়েছে। অন্নপূর্ণারও লাগল বেশ ভালো। চতুর্দিকে ধিঙ্গিপনা—এমনটি তাব মধ্যে কদাচিৎ নজরে পড়ে।

মোড় ঘুরে গিয়ে—মাথাব ঝাঁকুনিতে ঘোমটা খসে পড়ল লজ্জাবতীর। গতি-বেগ বাড়ছে। অন্নপূর্ণার সামনে মিহিরের সঙ্গে একটা কথা বলে নি সোজাসুজি। তারপর সুঁড়িপথে একটু-আধটু ফিসফাস। যত এগিয়ে যাচ্ছে, কথার জোর বাড়ছে ততই। পথের ধাবে কেশো-রোগি ভোলা চাটুজ্জের বাড়ি। বকবকানি শুনে চাটুজ্জে জানলা খুলে হাঁক দেয়, রাত দুপুরে রাস্তার উপর ঝগড়া বাধিয়েছ তোমরা কারা গো?

উঃ, কতদূর গিয়ে তবে সেই চালাঘর—মোটর রেখে এসেছে যেখানে? রাস্তার যেন শেষ নেই।

ঝড়ু-দা!

দু-তিন ডাকে তবে সাড়া মিলল। অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলছে না কি? ঘুমিয়ে পথের উপর পড়ে না যায়!

মিহির বলে, অনেক রাত হয়ে গেছে—আপনি মোটে উঠতে চান না।

মায়ের কাছ থেকে ওঠা কি সোজা?

ফিক করে হেসে অনীতা বলে, আপনার বিয়ের কথাবার্তা শুনছিলাম মাস্টার মশায়।

হীরালাল বাবুর কাণ্ড। তিনি মাকে খবর দিয়ে নিয়ে এসেছেন। মনিববাড়ির মেয়ে—বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে ওঁর কিছু খাতির বাড়বে বোধ হয়।

তারপর বলে, মা আপনাকে অনেক কথা বললেন। সেকেলে মানুষ—ওঁরা বলেন অমনি। আপনি কিছু মনে করবেন না।

সে কথার ভালমন্দ জবাব না দিয়ে অনীতা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল। কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে ওঠে। বলে, আঠারো দিনের মেয়ে ফেলে মা চলে গিয়েছিলেন—আঠারো বছর পরে আবার যেন মা পেলাম। সমস্ত রাত কাটিয়েও কথা শেষ হত না। নিতান্ত লোকে কি বলবে, তাই উঠতে হল।

হাসতে হাসতে বলে, অন্য লোক বড় কেয়ার করি নে লোক একটাই।

বিমূঢ়ভাবে মিহির প্রশ্ন করে, কে?

বিয়ে আপনার শুধু নয়। আমারও হচ্ছে। আজকে নয়, অনেকদিন থেকে হচ্ছে কথাবার্তা। অসুখের আগে থেকেই। কোন্ জগতে থাকেন মাস্টার মশায়, এতদিন ছিলেন, কিচ্ছু জানেন না?

আবছা আঁধারের মধ্যে মিহিরের মুখ দেখবার চেষ্টা করে। সকৌতুকে বলে, আন্দাজ করুন দিকি কার সঙ্গে—

আমি বলব কি করে? অলকবাবুর সঙ্গে নাকি?

তবে? যদু নয়, মধু নয়—অলক। কেমন করে টের পেলেন বলুন না। বলতেই হবে।

হাত তো এড়ানো যাবে না, এই প্রশ্ন চলতেই থাকবে এখন। আমতা-আমতা করে মিহির বলে, ঘোরাফেরা করেন কিনা তিনি—

ঘোরাফেরা কত লোকে তো করে থাকে! ঐ যে ঝড়ু-দা—দিনরাত সে পড়ে রয়েছে, আর স্বজাতও আমাদের। ওদের কারো নাম তো করলেন না—

মিহির বলে, আপনারা হলেন বড়লোক। আকাশের চাঁদ-তারার সঙ্গে আপনাদের উপমা হয় তো ঝড়ু-টড়ু হল পাতালের পোকা—

কথা বড্ড বেশি আড়ে-আড়ে চলেছে, আফিংখোর গোবেচারা স্থবির ঝড়ু বেয়ারাকে উপলক্ষ করে তীর এসে পড়েছে দু-দিক থেকে। মিহির প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে দিতে চায়।

মায়ে-ঝিয়ে বসে বসে খুব তো বড়লোকের মেয়ের নিন্দেমন্দ হচ্ছিল—

অনীতা বলে, খারাপ হলে নিন্দে করব না?

আমি যদি বলে দিতাম!

গভীর কণ্ঠে অনীতা বলে, তাই বুঝুন, কত খারাপ আমরা! অভিনয় করে এলাম মায়ের সঙ্গে। এমন ভালমানুষ মা—তাঁর কাছেও মিথ্যাচার। দুনিয়ার কেউ এইজন্যে ভালবাসে না বড়লোকের মেয়েকে—

একটু থেমে থমথমে গলায় বলে, ঐ অলকবাবুই যা একটু-আধটু—

মিহির বলে, ভাল আবার বাসে না! নানারকম কথা বানিয়ে ঝগড়া করে, রাগ করে—ভালবাসা যে ছিনিয়ে নেওযা হয়! না ভালবেসে উপায় আছে? এই আমার শুচিবেয়ে সেকেলে মা—কিসে কি হয়ে গেল—দু-হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। চোখে দেখেও বিশ্বাস করা শক্ত।

কিন্তু মায়ের ছেলেটা তো গালিগালাজে ভূত ভাগিয়ে দেন, রাগ করে ওদিককার ছায়া মাড়ান না, বনের মধ্যে অজ্ঞাতবাসে পড়ে থাকেন। মায়েব কাছে এসে তাই আবার সুপারিশ ধবতে হয়।

ভয়-দেখানো সুরে মিহির বলে, সমস্ত বলে দেবো আমি মাকে।

মাযের সামনে তা হলে কোন দিন আব দাঁড়াতে পারব না, জানেন?

মিহির বলে, মিথ্যে করে বলে বলে আপনি জিতে যাবেন, আমি হেবে থাকব—তাই বা কি করে হয়? ভাবছি আমি থিয়েটাবের কার্ডখানা মাকে দিয়ে দেবো—বড়লোকের মেয়েদের রং মেখে নাচনা-গাওনা একটুখানি দেখে আসবেন।

অনীতা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, পুরুষমানুষ অমনি বটে! এক হতভাগী কোনদিন জীবনে মাকে দেখে নি—সে মার কাছে গিয়েছে, মা তাকে আদর করেছেন, অমনি হিংসার জ্বলুনি আরম্ভ হয়ে গেছে।

পাকা-রাস্তায় উঠল এতক্ষণে। সুঁড়িপথে অন্ধকার, রাস্তার উপরটা তেমন নয়। আর অনীতারও সঙ্গে সঙ্গে আর একরকম সুর। এতক্ষণের ঐ সমস্ত আর কারা যেন বলাবলি করছিল, অনীতা তার মধ্যে নেই।

দেখুন, দেখুন—ড্রাইভার দু-হাত জায়গার মধ্যে কেমন আরামসে নাক ডাকছে। পারেন ?

ফিরে যাচ্ছে মিহির। অনীতা আবার কয়েক পা তার সঙ্গে এগিয়ে মুখের কাছাকাছি মুখ নিয়ে প্রশ্ন করে, আমাদের বাড়ি কেন যেতে চান না—সত্যি কথাটা বলুন দিকি। ভয়ে—আমার ভয়ে ?

আপনাকে ভয় কেন হবে ?

খিল-খিল করে হেসে অনীতা বলে, সেই যে এক অভিনয় করেছিলাম এক রাত্রে—

মিহির গম্ভীর হয়ে বলে, অভিনয় কিনা বলতে পারব না। কিন্তু যিনি করেছিলেন, তিনি যে অনীতা দেবী নন সেটা জানি। বিকারের রোগি—একেবারে ভিন্ন মানুষ। বিকারের প্রলাপ কেউ কি মনে গেঁথে রাখে ?

অনীতা বলে, যাকগে—রক্ষে পেলাম। আপনার মতন এমনি করে ভাবত যদি সকলে! পিশি যদি ভাবেন এই রকম, অলক যদি ভাবে!

অলকবাবুরও কানে গেছে ?

না যায়, তাই তো চাচ্ছি। সেই এক কাণ্ড—তার উপরে আজকের এই সমস্ত যদি টের পেয়ে যায়, তা হলে গেছি আমি! কোন রকমে রক্ষে নেই।

মিহির চমকে ওঠে, আজকের কি ?

কি নয় বলুন ? আজকে রোগপীড়া নয়—রীতিমতো সুস্থদেহে বহাল-তবিয়তে এদ্দূর অবধি ছুটে এসেছি। এসে এত রাত অবধি কাটিয়ে গেলাম আপনার সঙ্গে। জঙ্গলে পথে অন্ধকারে দু-জনে। ঝড়ু-দা তো মানুষের মধ্যে পড়ে না! এই সব টের পেলে—অলকবাবু নিজে যদিই বা না হন—তাঁর পিতৃদেব বিগড়ে যাবেন। বড্ড কড়া লোক, শুনেছি। বিয়ে পাকাপাকি করতে চলে আসছেন তিনি—দেখবেন, আজকের এসব জানাজানি না হয়ে পড়ে!

মিহির তটস্থ হয়ে বলে, সে কি কথা! কেউ জানতে পারবে না! দোষ কিছু তো করেন নি—বাজে কথা বলে বেড়াব কেন ?

সে জানি। বড়লোক মন, তাই তো এমন ভালো! অলকবাবু হলে কি ছাড়ত? আমি কৃতজ্ঞ থাকব। নমস্কার!

বলে মুখ ফিরিয়ে অনীতা দ্রুত গাড়িতে ঢুকল। সশব্দে দরজা বন্ধ করল, ছেড়ে দিল গাড়ি।

নিশিরাত্রে ফাঁকা পথ পেয়ে হু-হু করে মোটর ছুটেছে। সিটের পিছনে ঠেশান দিয়ে আছে অনীতা, আধেক-বোঁজা চোখ। অনেক দূরের কোন এক গাঁয়ে বাড়ির ঐ যে বর্ণনা দিলেন মা—সেই বাড়ি চোখে দেখতে পাচ্ছে। গোবর-নিকানো তকতকে উঠানে জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে পড়েছে, খড়ের চাল সোনার মতো ঝিকমিক করছে। বাতাস উটছে এক-একবার, গোলার দুয়ারে টাঙানো ধানশীষের মালা দুলছে; লাউ-মাচার লকলকে ডগাগুলো জড়জড়ি করছে, বাতাবিলেবু-গাছে পাখির বাসায় ছানাগুলো ভয় পেয়ে চিঁ-চিঁ করে ডাকছে। সকাল হয়ে গেল বুঝি—ওলো বউ, ছড়াঝাঁট পড়বে কখন গৃহস্থ-বাড়ি? বাছুর হাম্বা-হাম্বা ডাকছে গোয়ালঘরে, সন্ধ্যে থেকে আটকা আছে, ক্ষিধে পেয়েছে ওর—গাই দোওযার ব্যবস্থা করো তাড়াতাড়ি! ও বউ, ওঠো—ছেলেপুলেরা জেগে উঠবে এখনি, ক্ষিধে-ক্ষিধে করবে—তার কি করতে হবে, দেখ।···তোমার ডাকের আগে কখন উঠে পড়েছে বাড়ির বউ। বাসিপাট সেরে ফেলেছে—আকাশে পোহাতি তারা ছিল তখন। ভারি লক্ষ্মীমন্ত বউ—ঘোমটাটা তোল গো, মুখ দেখি······

খুকখুক করে অনীতা হেসেই খুন। নিজের মুখ নিজ চোখে দেখা যায় নাকি?

বাড়ি এসে অনীতা দেখে, হিমাংশু উপবের পড়ার ঘরে চুপচাপ একখানা পাঠ্য বই উল্টাচ্ছেন।

দেরি হয়ে গেল। তুমি খেয়ে নিলে না কেন বাবা?

হিমাংশু বলেন, ক-দিন বা খেতে দেবে আর একসঙ্গে? যে ক'টা দিন পাচ্ছি, তার মধ্যে একটা বেলাও ফাঁক দেবো না।

অনীতা জেদ করে বলে, চিরকাল একসঙ্গে খাবো আমরা—বাবা আর মেয়ে।

হিমাংশু সংশোধন করে দেন, উঁহু—মা আর ছেলে। তারপর ম্লান হেসে বলেন, মা বুঝি মতলব করেছে, বুড়ো ছেলেকে আগলে কলকাতায় পড়ে থাকবে। তাই হতে দিল আর কি অবনী!

মেয়ে বলে ওঠে, তাই তো বলছি বাবা, কাজ নেই ওখানে—

তবে কোথায় রে? তা সে যেখানেই হোক, অনাথ মানুষটার কথা কেউ ভাববে না। অত কারো মাথাব্যথা নেই।

তাই বটে! যে যার নিয়ে ভাবে, দয়াধর্ম নেই সংসারে। ওলো ঘোমটা-দেওয়া হাসকুটে বউ, বাপ ছেড়ে পারবে তো পরগাছা গোবিন্দ-গুষ্টির ভোগ যোগাতে?

রবিবার সন্ধ্যা। পোশাকে প্রসাধনে অনীতা ঝলমল করছে। সীতার কাছে হানা দিয়ে পড়ে, কি এত ভাবিস বল দিকি অন্ধকারে বসে বসে? বিয়ে তোর হবেই—পিশিমাকে আমি পাকা-কথা দিয়েছি। তাড়াতাড়ি ওঠ—সময় নেই।

সীতা কাতর হয়ে বলে, আমায় কেন ভাই—

তাই তো, তুমি কি জন্য যাবে? যত বামুন-বোষ্টম সাধু-দরবেশের জন্যে আমাদের থিয়েটার।

সীতার খেয়াল ছিল না, এবার মনে পড়ল।

থিয়েটার আজকে বুঝি?

অনীতা বলে, কতজনের কত গালমন্দ খাচ্ছি থিয়েটার নিয়ে। এই—কাল অবধিও। আমায় মানুষ বলে মানিস নে কেউ—একধার দিয়ে তাই কার্ড বিলিয়েছি। দেখসে এসে, অভিনয় দেখে তাজ্জব হয়ে যাও। এই খিলখিল করে হাসছি, আবার এই কেঁদে ফেললাম—চোখের জল গাল বেয়ে পড়ছে টপটপ করে!

মনের ভিতর ছাঁৎ করে ওঠে, মিহিরের কার্ডখানা নিয়ে অন্নপূর্ণা সত্যি সত্যি যদি হলে এসে বসেন নাচনা-গওনা দেখবার জন্যে? কন্যা-দেখানো কথা বলেছে মিহির—কিন্তু কথা আবার ক্ষণে অক্ষণে পড়ে যায় কি না! স্টেজে বেরিয়ে, ধরো, দেখতে পেল—সুমুখের এক চেয়ারে বসে তিনি ভ্রূ কুঁচকে অনীতাকে চিনি-চিনি করছেন—

মুচকি হেসে সহসা অনীতা বলে, একচোখো বিধাতাপুরুষ। অকর্মা উড়নচড়ুই যেটি, সংসার তার উপরে হামলা দিয়ে এসে পড়ছে। আর একজন ওদিকে রূপ আর গুণের বোঝা নিয়ে স্বপ্ন দেখে মরছে দিন-রাত্তির। কি স্বপ্ন দেখছিলি বল্ না দিদিভাই—কি রকম তোর ঘরবাড়ি? দুটো গোলা, গোয়াল-ভরা গরু, গোবর-নিকানো তকতকে উঠোন—না, ঝকঝকে মোজেয়িক মেঝে, ফ্যান-রেডিও, মোটরগাড়ি ব্যালকনির নিচে? ঘটকী হয়েছি আমি—সকল কথা শুনে নিয়ে তবে তো লাগতে হবে!

বলে, গাড়িতে বসে শুনব। ফিরে এসে আরও শুনব। শিগগিরি তুই কাপড় পরে নে।

দু-হাতে জোর করে ধরে তাকে দাঁড় করাল।

সাজের কিছু দরকার নেই গো! বিধাতা আমাদের দেখতে পায় নি—যত রূপ ভাণ্ডারে ছিল একজনের উপর উজাড় করে ঢেলেছে, নিজ হাতে সাজিয়ে দিয়েছে যেটুকু যেখানে হলে ভাল দেখায়। এমন হিংসে হয় দিদি তোর উপরে।

অনেক রাত্রি। অভিনয়ের শেষে ফিরছে এবার। অনীতা বলে, লাগল কেমন বল্—

সীতা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছে। বলে, এত তোর ক্ষমতা!

বড্ড জমেছিল। ভাল হবে জানতাম—কিন্তু এতদূর আশা করতে পারি নি। সকলে ধরাধরি করছে, এই পালা আবার করতে হবে পুজোর সময়।

নিশ্বাস ফেলে বলল, ওরাই সব করবে। আমি তখন রাজধানীর কারাগারে—

সীতা বলে, ভয় পাচ্ছিস কেন? শ্বশুরবাড়ি যাওয়া তো খুশীর ব্যাপার।

অনীতা বলে, হ্যাঁ—কতবার গিয়ে গিয়ে সর্বজ্ঞ হয়ে আছিস! তাইতো বলছিলাম—খুশীব ব্যাপার যার কাছে, সে বেচারি হা-পিত্যেশ করে থাকে। টানাটানি আর একজনকে নিয়ে।

মোটরের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। উঠছে না।

হল কি?

অলককে এক নজর দেখলাম অডিটোরিয়ামে। স্টেজের দরজায় গিয়ে বোধ হয় দাঁড়িয়ে আছে। এত শিগগির বেবিয়ে পড়বার কথা তো নয়, কিন্তু অত লোকের মধ্যে তুই হাঁপিয়ে উঠছিস—তোর জন্যে আমি তাড়াতাড়ি এলাম।

তারপব মুখ টিপে হেসে বলে, অলক বসেছিল একেবারে তোর পাশটিতে। লোক-দেখানো খান দশ-বারো চেয়ার ছেড়ে দিয়ে অবশ্য। কি কাণ্ড! আগুন দেখলেই কি পোকামাকড় লাফিযে ঝাঁপিয়ে এসে পড়বে?

সীতা বলে, আমি চিনি নে তোর অলককে।

এত আসা-যাওয়া, খেলাধুলো হল এতদিন—মানুষটাকে চিনলি নে মোটে? হতে পারে না, বিশ্বাস কবি নে তোব কথা।

সত্যি বলছি, যে-দিব্যি কবতে বলিস—

অনীতা বলে, এটা কিন্তু দেমাকেব কথা হচ্ছে দিদি। বড্ড বেশি রূপের গরব।

বেকুব হয়ে গিয়ে সীতা আমতা-আমতা করে, দেখেছি নিশ্চয়। আবছা মতন দেখেছি—ঠিক ধরতে পারছি নে। কেমন দেখতে বল্ দিকি?

খুব কালো আর খুব রোগা—

তা হলে বুঝলাম, খুব ফর্সা আর বেশ মোটা—

তবে যে ন্যাকা সাজলি, দেখিস নি? ডুবে ডুবে জল খাস দিদি, মতলব খারাপ!

থিয়েটারি ভঙ্গিতে বলে ওঠে, পাপীয়সী, মনোবাঞ্ছা কিবা তব বলহ আমারে—

হেসে ফেলল সীতা। ভাব দেখে না হেসে পারা যায়? বলে, না যদি দেখে থাকি সত্যিই অন্যায় আমার। চিরকাল পাড়াগাঁয়ে কাটিয়ে এমন হয়েছে, বাইরে তাকাতে বুক দুরু-দুরু করে। শহরের মানুষ এরা যেন আজব জাত!

সামলে নিয়ে বলে, অলকবাবুর কথা অবশ্য আলাদা। আমার বোনের বন্ধু-বর হলেন তিনি—অতি মহাশয় ব্যক্তি।

বলতে বলতে অলক এসে পড়ল। রজনীগন্ধা গোলাপ আর পদ্মফুলের প্রকাণ্ড তোড়া হাতে। এই কিনতে মার্কেটে ঢুকেছিল। রাস্তার উপরটায় ধুলো-ময়লার মধ্যে ঠিক হাঁটু গাড়ল না—খানিকটা নিচু হয়ে ফুলগুলো এগিয়ে দিল অনীতার দিকে। তারপর সীতার দিকে তাকাল।

অনীতা বলে, আমার দিদি। অমন করে দেখতে নেই অলকবাবু। এমনিই বলছে, শহরে মানুষ আজব এক জীব—

গোটা কয়েক বড় বড় গাছ জায়গাটা আচ্ছন্ন করে আছে। রাস্তার আলো অনেকখানি দূরে—ভাল করে দেখবার উপায়ও নেই। হাত তুলে অলক নমস্কার করল।

সীতার মুখখানা অলকের দিকে তুলে ধরে অনীতা বলে, দেখ্ দিদি, মিলিয়ে দেখে নে—যে রকম বলেছিলাম ঠিক সেই চেহারা কিনা!

অলক বলে, অনেক বুঝি কথা হয়েছে আমার সম্বন্ধে? কারও আলোচনার বস্তু হতে পারি, এমন অহমিকা আমার ছিল না।

অনীতা ভালমানুষের ভাবে বলে, কি করব, দিদি ছাড়ে না। বলে, অতি মহাশয় ব্যক্তি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

যাঃ—

এই একটুখানি কথা বলতে হয় অনীতাকে সামলাতে গিয়ে। যা বজ্জাতি শুরু করে দিয়েছে!

অনীতা বলে, আজকাল তেমন আর যাচ্ছেন না কেন অলকবাবু? বুড়োরা কি সব মতলব আঁটছে, তার জন্য আমাদের খেলা বন্ধ করবার কি হয়েছে? কাল থেকে যাবেন। দিদির সঙ্গে আলাপ-সালাপও হবে।

অলক বলে, এমন ভাগ্য হবে আমার! আপনাদের বাড়ি এতদিন ধরে

যাচ্ছি, তা ওঁকে চোখেও দেখেছি মনে হয় না। ঐ যে আজব জীবের কথা হল—তাই-ই হবে—সামনা-সামনি বেরোন না সেজন্য।

অনীতা এবার সীতার দিকে। বলে, না—অমন করে বলবেন না। ওর দোষ নেই। বেরোবার উপায় ছিল না বেচারার। কি করবে?

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে এমনি ভাবে তাড়াতাড়ি অনীতা অন্য কথা পাড়ে। রাত্রিবেলা সূর্য লুকিয়ে থাকে কেন বলুন তো? তারা ঢাকা পড়ে যায় বলে। বেচারিরা মিটমিট করে—সূর্য দয়া করে তাদের ঐটুকু কেড়ে নেয় না। দিদিরও হল তাই—বোনের উপর দয়া। ঐ দেখুন লুকোচ্ছে আবার—গাড়ির খোপে ঢুকে পড়ল।

সীতা ভিতর থেকে বলে, আবোল-তাবোল বকবি—কান পেতে কতক্ষণ লোকে শুনতে পারে?

তুই বল্ তবে ভালো কথা। আমার কথা শুনবেই না তখন কোন লোক।

অলককে বলে, শুনলেন? দিদি কথা বলছে, তা-ও যেন গান। উঃ, হিংসেয় জ্বলে জ্বলে কালো হয়ে গেলাম। নইলে যা দেখেন, এতখানি কালো আমি নই—

খিলখিল খিলখিল করে পর্বতের ঝরনার মতো অনীতার হাসি ছড়িয়ে পড়ছে, ছিটকে পড়ছে।

গাড়ি চলে গেল। তারপরে অলক দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। অন্ধকার হলেও একবার দেখে নি কি সীতাকে? কাপড়চোপড়ের প্যাকিং-এ জবড়জং লজ্জা একখানি। আর ঐ মেয়ের সম্বন্ধে ব্যাখ্যান শোন অনীতার মুখে! অলক কিছু কিছু শুনেছে ওদের কথা। কিছু বলে ডাকতে হয়, অনীতা তাই ডাকে দিদি। ওরা আশ্রয় দিয়েছে, আর যা কেউ দেয় না—দিয়েছে সম্মান। কি সুন্দর তুমি অনীতা—আকাশের এক মুক্ত বিহঙ্গী। সুন্দর তুমি মহত্ত্বে আর প্রাণোচ্ছলতায়। দেহের কানা ছাপিয়ে প্রাণ যেন উছলে পড়ে যে জায়গায় তুমি একটুখানি দাঁড়াও। কতক্ষণ চলে গেছ—এখনো যেন ঝলমল করছ, তোমার রেশ রয়ে গেছে এখানে।

অলক এসেছে পরের দিন।

দিদিকে ডাকছি দাঁড়ান।

কেন রোজ ওঁকে টানাটানি করা? বেশ তো আছি। উনি সোয়াস্তি পাবেন না, আমরাও না—

এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিম্ন কণ্ঠে অনীতা বলে, ওর দোষ নেই, মিছে আপনি রাগ করে আছেন। সোয়াস্তি পাবে কি করে বেচারি? ঘরের বাইরে এলে রক্ষে ছিল? এখন অবশ্য আর কোন বাধা নেই—

ফিক করে হেসে বলে, কাজ গোছানো হয়ে গেছে কিনা, এখন আর কেউ কিছু বলবে না।

অলক বুঝে উঠতে পারে না।

কি কাজ?

মেয়েদের যা জীবনের মোক্ষ। বল্লরী কিনা আমরা! মাচায় তুলে না দিয়ে আপনজনের সোয়াস্তি নেই। তা আমার জন্যে মাচা বাঁধা হয়েই তো গেল! নয়াদিল্লির মস্ত বড় মাচা। লেকরোডের উপরেও অস্থায়ী একটা আছে। কি বলেন?…এই দেখুন, সমস্ত বলে বসি—কোন-কিছু লুকোতে পারি নে আপনার কাছে।

খুশী হয়ে অলক বলে, তাই তো স্বাভাবিক। জীবন সুখের হবে এমনি যদি আমরা থাকতে পারি চিরদিন।

একটু ইতস্তত করে অনীতা বলে, শুনুন তবে, খুলেই বলছি—আপনার সামনে দিদির এদ্দিন বেরুনো মানা ছিল।

কেন? আমি বাঘ না ভালুক?

তা বুড়োরা ঐ রকম হিংস্র জন্তু ভাবেন ছেলেদের। পাছে দিদিকে আপনার মনে ধরে যায়। নইলে নিজের ইচ্ছেয় দিনরাত সে অমনি চার দেয়ালে আটক

থাকত, তাই ভাবছেন? তার উপর দিদিরা ছিল কত কাঁকার মধ্যে! বাড়িটাই নাকি বিশ বিঘের উপর, জানালা দিয়ে মেঘনার পাল-তোলা নৌকো দেখা যায়। গিয়েছেন কখনো পূর্ববাংলায়?

অলক কি ভাবছিল, অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়ল। গিয়েছে সে একবার। ম্লান হেসে বলে, আপনাদের ধারণা দেখতে পাচ্ছি খুব উঁচু আমার সম্বন্ধে?

অনীতা বোঝাচ্ছে, দোষ দিলে হবে কেন? আমার মা নেই—একলা বাবা মা-বাপ দুই হয়ে আছেন। মেয়ে কালোকুচ্ছিৎ হলে ভয় তো হবেই।

আবদারের ভঙ্গিতে বলে, অন্যলোকের কথা ধরি নে—আপনি বলুন অলকবাবু, সত্যি সত্যি কালো কি আমি?

অলক বলে, কোন চোখে কালো বলে জানি নে। এই যদি কালো রং হয়, তবে তো বাঙালি মেয়ে শতকরা নব্বুইটার দিকে চোখ তুলে চাওয়া যায় না।

সোয়াস্তির হাসি হেসে অনীতা বলে, আমিও তাই বলি বাবাকে। অলকবাবু সে রকম নন, ওঁর চোখ আলাদা। বুঝলেন অলকবাবু, আপনি যখনই আসবেন, ওঁরা আমায় সেজেগুজে রং মেখে থাকতে বলেন। বলুন দিকি, ঘরের মধ্যেও থিয়েটারি মেক-আপ ভালো লাগে?

অলক চমকে উঠে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল। সে চমক অনীতার চোখ এড়ায় না!

কই, এমন কি বেশি টয়লেট করেন আপনি?

হেসে উঠে অনীতা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে হাত পাকা হয়েছে তবে। উঃ, মেয়েদের চেহারা এমন-অমন হলে কত যে ভোগান্তি! আপনাদের পুরুষদের এ হাঙ্গামা নেই। স্টেজের উপর কাল আরও খোলতাই দেখাচ্ছিল—কি বলুন? বেবা তো জড়িয়ে ধরল একেবারে। দিনরাত অমনি ফ্লাশ-আলোর সামনে থাকতে পারতাম, বাবার তা হলে ভাবনার কিছু থাকত না—

বলা নেই কওয়া নেই—অনীতা বেরিয়ে চলে গেল। অলক বেকুবের মতো ঠায় বসে। রাগ হচ্ছে—কালকে এত করে বলা হল আসবার জন্যে, এ কি ব্যবহার? খেলাধুলো হবে, তারও কোন লক্ষণ নেই। চলে যাবে

কিনা ভাবছে। কিন্তু অতি-মধুর-লগ্নটি আসন্ন হয়ে উঠেছে, মন-কষাকষি কোনরকম হতে দেওয়া হবে না এ সময়টা।

অনীতা এসেছে সীতার কাছে। হাত ধরে টেনে বলে, চল্—

ঘাড় নেড়ে সীতা আপত্তি করে, সঙের বেশে কিছুতে আমি যাবো না। এ তো বড বিষম মেয়ে—তোর খেয়াল মতো সবাইকে চলতে হবে?

সঙ হলি কিসে? আয়নায় দেখ্—মুণ্ডু ঘুরে যাবে তোর নিজেরই।

মুণ্ডু ঘুরোবার কোন দরকার তো নেই। আচ্ছা, তুই-ই বল্—মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে বল্ দিকি—বড বোন হয়ে এমন সাজে তোদের মধ্যে দাঁডাই কি করে?

অনীতা বোঝাচ্ছে, সাজের দোষ নয় দিদি, দোষ হল বিধাতাপুরুষের। নিখুঁত এই রূপের মূর্তি যিনি গড়েছেন। কাদামাখা হীরে একটুখানি জল দিয়ে ধুয়ে দিলেই জলজ্বলিয়ে ওঠে—আর কিছু করতে হয় না। কী এমন সাজিয়েছি বল্—জড়োয়া চাপিয়েছি গায়ে, বেনারসি পরিয়েছি?

বিরক্ত হয়ে শেষে হুমকি দিয়ে ওঠে, যাবি কিনা স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দে। একলাটি বসে আছে। এমনিই নিন্দেমন্দ করছিল, যা দেমাক—আলাপ-সালাপ করতে বয়ে গেছে তাঁর, আজব জীবের সামনে আসবেনই না ঘেন্নায়।

সীতা শঙ্কিত হল। মুখচোরা স্বভাবই কাল হয়েছে। কমল ঠেলেঠুলে হিমাংশুর কাছে পাঠান, যা না রে মুখপুড়ি, দাদাব কাছে গিয়ে একবার দাঁড়া। অনীতার মতো সে-ও জুতোর ফিতে খুলে দিক, কারণে অকারণে দশবার ঘোরাফেরা করুক সামনে দিয়ে। তা বুক ঢিবঢিব করে তার, দু-পা গিয়েই ফিরে চলে আসে। এর জন্যে অহরহ কম বকুনি খায মায়ের কাছে! এতদিন রয়েছে এখানে, হিমাংশু বোধ হয় দু-দণ্ড তার দিকে চেয়ে দেখবারও সুযোগ পান নি। আর নতুন যে জামাই হতে যাচ্ছে, সে-ও ইতিমধ্যে যা-তা ভাবতে লেগেছে। বাড়ির একমাত্র জামাই—সে-ই তো সর্বেসর্বা হবে হিমাংশুর পরে।

সীতা ব্যাকুল হয়ে বলে, দেমাকের কথা বলিস—কি আছে দেমাক করবার? ঘরবাড়ি মানসম্ভ্রম সমস্ত ছেড়ে এসেছি—দয়ার পাত্র আমরা। ওসব কথা কিসে ওঠে, বুঝতে পারি নে।

সীতা ভাবে অনেক, শৈশব থেকে এই বয়স অবধি ভাবে সে আপন

মনে—কিন্তু এমন করে মুখ ফুটে বলে না কখনো। আজকে যেন কি হয়েছে! তা বলে অনীতা ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। বলে, মোটে তুই সামনে যেতে চাস নে। কালকে দেখা হল—বললি তিনটে কি চারটে গোনাগুনতি কথা। আমি আগডুম-বাগডুম বকে সামাল দিলে কি হবে—লোকে উল্টো বোঝে।

সীতা বলে, আমার ভয় করে ভাই। জানিস তো, প্রথম এসে এই শহরে 'কোন জায়গায় উঠেছিলাম। পথের ধুলো থেকে তোরা রাজ-অট্টালিকায় এনে তুলেছিস—আমি কি জানি শহরের আদব-কায়দা, কি বলতে হয় ওঁদের সঙ্গে?

বলতে হয় 'প্রাণেশ্বর'। দেখলি নে থিয়েটারে, রেবা সেজেগুজে রাজপুত্তুর হয়ে দাঁড়াল—আমি কেমন গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বললাম?

সঙ্গে সঙ্গে হাত মুঠো করে কিল উঁচিয়ে বলে, তা যদি বলেছ, দেখো কি করি! খুন করে ছাইয়ের গাদায় পুঁতে কালকের সেই রাজকন্যার মতো সত্যি সত্যি সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবো।

সব সময় রসিকতা, সকল কথায় হাসি। আহা, এ হাসি কোনদিন যেন না মোছে ওর মুখ থেকে!

সীতা বলে, যাচ্ছি তোর সঙ্গে—কিন্তু কথাবার্তা তুই শিখিয়ে দিবি। নইলে যাবো না।

বাপরে বাপ! থিয়েটারে পার্ট শেখাই, আবার ঘরেও? সত্যি মিথ্যে যা মনে আসে বলে যাবি। বেদপাঠ হচ্ছে না তো! কথাই শুনতে চায় ওরা, চোখ-মুখের ঝিলিক-হানা দেখে—

অনীতা আর সীতা হাত ধরাধরি করে এসে দাঁড়াল।

ফাঁকা লন—পশ্চিমে বহু দূরে এক বড় বাড়ির মাথায় সূর্য। আকাশে মুঠো মুঠো সোনা ছড়ানো। কি চমৎকার দেখাবে, কেউ যদি ভাবনা ভুলে এমনি মুহূর্তে চারিদিক চোখ মেলে তাকায়! কন্যাসুন্দর বেলা বলে পাড়াগাঁয়ে —কুৎসিত মেয়েটাও অপরূপ হয়ে ওঠে এই গোধূলি-আলোয়।

এসেই অনীতার একরাশ কথা।

বই পড়ছিল দিদি—দুনিয়ার হেন বই নেই যা পড়ে না। এস্ট্রোফিজিক্সের

বই—দেখুন দিকি বিদঘুটে রুচি! আমায় বাপু আধ পাতা নভেল পড়তেই গায়ে জ্বর এসে যায়!

এমন বেপরোয়া মিথ্যা বলতে পারে! একটা বাংলা মাসিক-পত্র পড়ে আছে সীতার শয্যার পাশে। নক্ষত্র সম্বন্ধে একটা লেখা—সেইখানটা একটু-আধটু উল্টাচ্ছিল বুঝি, তার এই গালভরা নাম। লোকে ভাববে, না জানি কি ভীষণ পণ্ডিত।

সীতাকে আরও লজ্জায় পেয়ে বসে। লজ্জাতেই মানায় ওকে ভালো। পাতার মধ্যে আধেক-ঢাকা একটি গোলাপ। হঠাৎ অনীতা ছুটে বেরুল।

বাবা ফিরলেন যেন ক্লাব থেকে—এত সকাল সকাল? কি আশ্চর্য, এর মধ্যে ফিরে এলেন।

অনীতা আর সে রাজ্যে নেই। সীতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে। অলক বলে, বসুন—

কিন্তু বসবার জায়গাই বা এখানে কোথায়? গোলঘরে যাওয়া যাক। সঙ্কোচ লাগছে সীতার, পা চলে না। পালিয়ে যাবে—তা-ও তো সাহসে কুলায় না!

আর অনীতা যেন কি—গেছে তো গেছেই। অলককে আহ্বান করে নিয়ে এসে···কি ভাবছেন, বল তো, ভদ্রলোক মনে মনে!

কমলবাসিনী চা দিতে এলেন। বাড়ির ভাবী জামাই—চা-খাবার তাই নিজেই হাতে করে নিয়ে এসেছেন। আবছা-আঁধার ঘরের মধ্যে ওরা দু-জনে। কমলের বুক কেঁপে ওঠে, চোখে ভাল ঠেকে না এ সমস্ত। কেমন-কেমন চোখে তাকাচ্ছেন মেয়ের দিকে। সীতারও ভয়-ভয় করে। যাবার সময় কমল সুইচ টিপে আলো জেলে দিয়ে গেলেন।

কথা নেই—নিঃশব্দ মুখোমুখি দুটি প্রাণী। কিন্তু কত কথা মনে মনে! ঢাকা জেলার এক বন্ধুর বাড়ি অলক সেবারে গিয়েছিল। খিড়কির পাঁচিলের বাইরে খাল। জোয়ারের জল উঠে পাড়ের আম-বাগান ছাপিয়ে যায়; পূর্ণিমার ভরা জ্যোৎস্নায় জল ছলাৎ-ছলাৎ করে পাঁচিলের গোড়ায়। চিলের ছাতে উঠলে দেখা যায় দিগ্‌ব্যাপ্ত নদী। ধানবন সবুজ নয় সে অঞ্চলে—ঘন নীল। হু-হু করে হাওয়া বয় দিনরাত—মেয়ে তোমার আকুল কেশ উড়ছে,

তোমার শাড়ির আঁচল ফেরতা দিয়ে বাঁধো।...জলার হংসী ইটের খাঁচার ভিতর এনে পুরেছে। মানান করে নিতে পারে না সে এখানকার এই মাপের হাসি, ঠোঁটের কথা। তার ডাক ফেলে এসেছে অনেকদূরের মেঘনার পাড়ে।

আর সীতা ভাবছে, এ কি শাস্তি দিয়ে গেল অনীতা! চোখে জল না এসে পড়ে ঠাকুর, সামলে থাকতে পারি যেন অলক যতক্ষণ না চলে যাচ্ছে। এখানে, কেঁদে ফেললে বড্ড দোষ হবে।

আরও অনেক পরে এক সময় সীতা উঠে পড়ল।

দেখে আসি, অনীতা কি করছে। আসছি এক্ষুণি—

অনীতা নিজের ঘরে খাটের উপর শুয়ে পা দোলাচ্ছে দেয়ালের দিকে চেয়ে।

টিকটিকি লুকিয়ে আছে, দেখ্, পোকাটাকে ধরবে বলে। পোকা বেচারি কিচ্ছু জানে না—

আমায় বসিয়ে রেখে খাটে শুয়ে শুয়ে তুই টিকটিকি দেখছিস?

অনীতা লজ্জা পায় না।

একা ছিলি নে তো—সামনে আর একটিকে বসিয়ে দিয়ে এসেছি। বাবা এসেছেন, এমনিধারা মনে হয়েছিল। তা নয়, এত সকাল সকাল তিনি আসবেন কি করে?

দু-হাত জোড় করে একেবারে রাজসভার কঞ্চুকীর মতো অনীতা গিয়ে অলকের সামনে দাঁড়াল।

মার্জনা করুন। এমন মাথা ধরল—বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিলাম, আসতে পারি নি। চা-টা দিয়েছিলে দিদি? সত্যি, কতদূর যে অন্যায়—নিশ্চয় খারাপ লাগছিল আপনার—

সীতার দিকে এক নজর তাকিয়ে অলক বলে, খারাপ কেন লাগবে?

কথা লুফে নিয়ে অনীতা বলে, আমিও জানি তাই। দিদি রয়েছে—সেই অসুখে ধরুন যদি মরেই যেতাম, এ বাড়ি তবে কি আসতেন না? খেলাটা আজকে আর হল না। মাথা ধরল, কি করব? দোষ আপনারও কিন্তু—

অলক বলে, আমি কি করলাম?

অনেক দেরি করে এসেছেন। কাল সময় মতো আসবেন—নয় তো দেখবেন কি হয়!

অলক পরদিন সকাল সকাল এসেছে, কিন্তু কলেজ থেকে ফেরেই নি অনীতা।

কমলবাসিনী অনুযোগ করেন, অমনি কাণ্ড! ভুলে মেরেছে হয়তো। তুমি আর কি করবে বাবা? কাজকর্ম ফেলে কতক্ষণ হা-পিত্যেশ বসে থাকা যায়!

অলক বলে, কাজ তেমন কিছু নেই। বসে যাই একটু পিশিমা। বার বার করে আমায বলে দিয়েছিল—

গলা পেয়ে সীতা চলে আসে।

আপনাকে বসতে বলে গিযেছে। ফিরতে দু-দশ মিনিট দেরি হতে পারে। শেষ ঘণ্টায় প্রিন্সিপালের ক্লাস—ঘড়ি-টড়ি তিনি বড মানেন না। ভালো লাগল তো প'ড়িয়েই চললেন।

কমল কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের দিকে। মুখের উপব কিছু বলা চলে না। ছেলেটি একা থাকবে, তাই বা কেমন করে হয়! পোড়া মেয়ে নিজে থেকে অবস্থা বুঝে চলে না কেন—কি জন্য এসে পড়ে! শেষটা এই নিয়ে কথা না ওঠে! আর রাগ হচ্ছে অনীতার উপর—ডেকেডুকে নিয়ে এসে নিজের আর পাত্তা নেই। আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে দাদা এক বাঁদর তৈরি করেছেন। ছেলেদের বিশ্বাস নেই—আখের খোয়াবে হাঁদা মেয়ে নিশ্চয় এমনি করে।

দেরি দু-দশ মিনিট নয়—পাক্কা তিন ঘণ্টা। সাতটায় অলক উঠি-উঠি করছে, সেই সময় অনীতা এলো। প্রিন্সিপালের ক্লাস নয়—মুখে এলো, তাই একটা বলে গিয়েছিল। কলেজ থেকে রেবা টেনে নিয়ে গিয়েছিল তাদের বাড়ি। খিলখিল করে হাসে, যেন বিষম বাহাদুরিব কাজ করে এসেছে।

অলক বিষম বিরক্ত হয়েছে। মুখে বেশি কিছু না বলুক, মনে মনে গর-গর করছে। ছাত্রীমহলে বড় মাতব্বর, বেশতো—থাকো সেই সব নিয়ে। আমার কি দায় পড়েছে এখানে আসতে—এসে তো এমনি অবাঞ্ছিত রূপে বসে থাকা!

কমলবাসিনী মুখে হাসেন বটে, কিন্তু ভাবখানা—যেন চুরি-জুয়াচুরির তালে আছি আমি, নানান রকম ফিকির খুঁজে বেড়াচ্ছি।

কথা সত্যি, কমলবাসিনী আগুন। চেঁচামেচি করা চলে না, চাপা গলায় মেয়েকে তর্জন করেন। লজ্জাশরম নেই তোর? পথের কুকুর আদর পেয়ে এখন বুঝি মাথায় চড়বার শখ! অনেক কষ্টে একটা হিল্লে হয়েছে—ঘাড় ধরে এরা যে পথে বের করে দেবে। তোকে পার না করে আমি পাকিস্তানে ফিরবো না—আবার তা হলে সেই বস্তিতে উঠতে হবে।

অপরাধ কোথায়, সীতা বুঝতে পারে না; সভয় দৃষ্টি মেলে মায়ের দিকে তাকায়। কিছু নরম হয়ে কমল বললেন, চার চোখে এক হয়ে অমনধারা বসে থাকিস—দাদা দেখলে কি বলবেন? আর অনীতা তোর ছোট বোন—তারই বা কি মনে হবে?

সেই তো আমায় থাকতে বলে যায়—চটেমটে অলকবাবু যাতে চলে না যান। এদ্দিন আলাপ করি নি, কত কথা শুনতে হলো সেজন্যে।

কমল বিরক্ত স্বরে বলেন, সে বলবে বই কি! যে রকম বুদ্ধি, তেমনি বলে। দিনরাত নেচে বেড়াবে। কিছু কি তলিয়ে দেখে—দেখার সময়ই বা কখন?

অলক সেদিনের পর আর আসছে না। সীতা বারংবার অনীতাকে বলছে—কিন্তু কানে নেবার সময় কোথা তার? শেষটা অবশ্য রাজী হয়েছে। তুই বলছিস—আচ্ছা, লিখব একটা চিঠি আসবার জন্যে।

প্রতিজ্ঞা হয়েছিল, থিয়েটারের পর সমস্ত ছেড়েছুড়ে ষোলআনা পড়ায় মন দেবে। থিয়েটার চুকেবুকে গেছে—একটিবার এখনো তো বই খোলার ফুরসত হল না! অভিনয় নিয়ে হৈ-হৈ পড়ে গেছে। সেই স্ফূর্তিতে অনীতারা ক'টি মেয়ে শিবপুর-বাগানে বনভোজনে বেরিয়েছিল। ভোজনের পরে ডানপিটেমি। নৌকো ভাড়া করে গঙ্গায় বেড়াচ্ছিল, শেষটা মাঝিকে সরিয়ে দিয়ে হালে বসতে নৌকো আর ঠেকানো যায় না। অনেক কষ্টে বিস্তর জলকাদা মেখে পারে এসে নামল। মরতে মরতে বেঁচে এসেছে—তা হলেও মজা হল খুব।

আরে, কে এসে উঠল নিচের বারাণ্ডায়? চেনা মানুষ বলে ঠেকে—কতকাল পরে আসা হল! দু-সেকেণ্ডে যেন সিঁড়ি গড়িয়ে নেমে এলো অনীতা। আর সময় হবে না যে—বাবাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল! মায়ের কাছে ধাতানি খেয়ে এবারে ঠাণ্ডা।

কি মশায়, খবর কি? মা দেশে চলে গেছেন? কনে দেখতে আপনিও তো গিয়েছিলেন?

মিহির ঘাড় নাড়ে।

কি রকম দেখে এলেন বলুন। মুখে কথা বেরুচ্ছে না—তাজ্জব বনে গেছেন একেবারে!

ভালো মেয়ে সত্যিই—

অনীতা বলে, কি রকম? চেহারা-স্বাস্থ্য-রং-লেখাপড়া? খুঁটিয়ে বলুন সমস্ত। আমার মাস্টার মশায়ের বউ হবে—'ভালো' বলে এক কথায় কাটান দিলে আমি শুনবো না।

মিহির বলে, ভালো সব দিক দিয়ে। প্রায় নিখুঁত বলা চলে। বড়লোকের মেয়ে হলেও রান্নাবান্না সমস্ত শিখেছে। আর মা'র যেটা ভয় ছিল—কথাবার্তা-চালচলনে অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই, শান্তশিষ্ট নরমসরম ভাব—

পাংশু মুখে অনীতা উল্লাস প্রকাশ করে, বাঃ, চমৎকার! দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল তো?

হবে কি করে? মা নাকচ করে দিয়ে এলেন। হীরালালবাবু এত করে বললেন, প্রায় হাতজোড় করলেন মা'র কাছে। কিছুতে মত হল না।

হেসে বলে, মেয়েটার যত গুণ সমস্ত দোষ হয়ে দাঁড়াল। মেমের মতন ফর্শা রং—ফ্যাকাশে রক্তশূন্য, আমার ভারী সংসারের ধকল সামলাবে কি করে? গান গাইতে পারে—তবে তো সংসারের কাজ ফেলে সুরই ভাঁজবে দিনরাত। মেয়ের বাপ তিন সেট গয়না দেবেন—এই সেরেছে, এ সেট পরে আয়নায় দেখবে; সেটা খুলে আর এক সেট; গৃহস্থালি দেখবে কখন?—এত লজ্জা ভাল নয় গো বেহাই, গলে-পড়া মেয়ে আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি নে। আপনি আগে-ভাগে এদের বলে গিয়েছেন নাকি আমার পছন্দর কথা—কেমন যেন শেখানো-শেখানো মনে হচ্ছে! সত্যিকার একটা দোষ হয়েছিল মেয়েটার—থতমত খেয়ে একবার হাত তুলে নমস্কার করেছিল। মোটের উপর হীরালাল-বাবুর পণ্ডশ্রম; মেয়েটা বেঁচে গেল গরিবঘরে পড়ার দায় থেকে।

তারপরে মিহির ব্যস্ত হয়ে ওঠে, আজেবাজে কথায় সময় যাচ্ছে। চলুন—

কোথায়?

পড়াশুনো করবেন না?

ভরসন্ধ্যেয় বুঝি পড়া যায়!

সে মহেন্দ্রযোগ ক-টার সময় হবে বলুন? বলে তো এলেন বড্ড পিছিয়ে রয়েছেন—ঘুম হয় না নাকি ভাবনার চোটে!

অনীতা বলে, ভাল লাগছে না মাস্টার মশায়। নৌকা বেয়ে বড্ড খাটনি গেছে—আজকের দিনটা থাক।

মিহির বলে, বাঃ রে—এদ্দুর এলাম কেন তবে?

ভালমানুষের ভাবে অনীতা বলে, শুধু পড়ানো না-ও হতে পারে! কাব্য করে সেই যে বলেছিলেন, ভালবাসা ছিনিয়ে নিতে জানি—সে জন্যে নয় তো?

মিহির বলে, দশরকম কথায় খেলিয়ে খেলিয়ে পড়ায় ফাঁকি দেওয়া—সেই খা বরাবর করে এসেছেন। মায়ের কাছে একশ'খানা করে লাগিয়ে বকুনি খাওয়ালেন কেন তবে? কি কাণ্ড! এত মিথ্যেকথা বলেন—কিন্তু মা'র ধারণা, আপনার মতন সরল সত্যবাদী দুনিয়ার ভিতর আর নেই।

দু-পকেট ভরে পেয়ারা এনেছে। বের করে সামনে রাখল। লোভনীয় বস্তু বটে!

তবু নিস্পৃহ ভাব দেখিয়ে অনীতা বলে, এসব কেন?

সেদিন শুধু আছাড় খেয়েই এলেন। গাছের পেয়ারা কয়েকটা খেয়ে দেখুন—

বলবার আগেই অনীতা একটা তুলে কামড় দিয়েছে। বলে, সে কিন্তু ঝড়ু-দা'র রচা গল্প। পেয়ারা পাড়বার কথাটা বলে দেন নি তো মাকে? যা নিজে দেখেন নি, পরের মুখে শুনে কক্ষণো তা বিশ্বাস করবেন না।

দেখা জিনিসও তো অনেক কিছু বলা চলত। এই যেমন—গরিব-ঘরের মেয়ে, মহাকষ্টে ভাঙা কুঁড়েয় থাকেন। তার উপরে অগাধ ইচ্ছে পড়াশুনোর। যেমন আজকের এই নমুনা দেখা যাচ্ছে—

সহসা মিহির সজাগ হয়ে ওঠে, মা হুকুম দিয়ে গেছেন—মায়ের কথা আমার কাছে বেদবাক্য। পড়তেই হবে, উঠুন—

অনীতা কথা বলে না, গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

কি হল?

করুণ কাঁপা-গলায় অনীতা বলে উঠল, পাষাণ আপনি—মানুষ তো নন! এর পরেও আসে মুখে এসব কথা! পুরুষমানুষ—আপনার তো কিছু নয়, ঠাণ্ডা হয়ে স্বচ্ছন্দে পড়াতে বসতে পারেন, কিন্তু আমি উপায় কি করি এখন?

আর বলতে পারে না, মুখের পেয়ারা ছুঁড়ে ফেলে মুখ ফিরিয়ে নিল, চোখেও হয়তো বা জল এসেছে।

মিহির হতভম্ব। কি ব্যাপার?

হওয়া উচিত ছিল সাংঘাতিক। বিষ খেয়ে নয় তো আগুনে পুড়ে জীবন শেষ করে দেওয়া। অন্য কেউ হলে তাই করত। নেহাৎ ঝাঁটা-লাথি খাওয়া মেয়ে—তাই যে-মানুষকে নিয়ে এত, নিষ্ঠুর উদাসীন তিনি মুখের উপর

দাঁড়িয়ে মাস্টারি হাঁক ছাড়ছেন—আর চুপচাপ মাথা নিচু করে আমায় শুনতে হচ্ছে।

ভীত হয়ে মিহির বলে, কি বলছেন—আমি আবার কি করলাম ?

না করছেন কোনটা ? আসা বন্ধ করলেন আমাদের বাড়ি। থাকেন ধাপধাড়া জায়গায়, প্রাণের দায়ে সেখানে ছুটে যেতে হল। তাই নিয়ে কত রকম কুচ্ছো—

বলেন কি ?

সেই যা ভয় করছিলাম। আমি জানি কিনা ! রাত দুপুর অবধি কাটিয়ে এসেছি আপনার সঙ্গে। আর অসুখের সময়ের সে খবরটাও কে চাউর করে দিয়েছে। যা বলেছিলাম, সেই সর্বনাশই হয়ে গেল। অলকবাবু বিগড়ে যাচ্ছেন, আর আপনি কিনা বলছেন পড়ার কথা—

মিহির বলে, কি আশ্চর্য ! ভাল করে খোঁজখবর নিয়ে দেখলেন না, কি অবস্থায় পড়ে ঐরকম ঘটেছিল ? আপনারা যাই বলুন, ঐ অলকবাবু লোকটি—

কথার মাঝখানে অনীতা বলে, অতি মহৎ লোক ! যতই হোক—কালোকুচ্ছিত মেয়েকে ঠাঁই দিতে যাচ্ছিলেন। কত বড় দায় থেকে বাঁচাচ্ছিলেন আমার বাবাকে !

মিহির রাগ করে ওঠে, কে বলে কালোকুচ্ছিত আপনি ?

আপনিই তো !

মিথ্যে বলবেন না। কবে বলেছি আমি—

ভদ্রতা করে মুখে না-ই বলুন মনের কথা ঐ তো !

হ্যাঁ, মস্তবড় গণৎকার হয়ে পড়েছেন, মনের কথা খড়ি পেতে বলে দেন।

আর পড়াবেন না, এ বাড়ি আসবার সময় হবে না আর কখনো—ঘেন্না করা ছাড়া আর কি কারণ হতে পারে বলুন ?

মরি মরি—চমৎকার কারণ ঠাউরেছেন ! আচ্ছা বলুন তো—কোনদিন আপনাকে পড়িয়েছি ? আপনার কাজগুলোই করে দিতাম শুধু। ফাইন্যাল এগজামিন তো আপনার হয়ে দিয়ে আসতে পারব না, লাভ কি তবে যাতায়াত করে ?

কি কথা উঠল বুঝি মনে—হঠাৎ অনীতা ফিক-ফিক করে হাসে। এই এক মেয়ে—মুখের উপর এই দেখ মেঘ উঠল, এই আবার রোদ।

অলকবাবুর কাছে এক চিঠি চলে গেছে—তাতে কিন্তু ভিন্ন কথা। অলককে হিংসে করে আপনি নাকি আসতে চান না এ-বাড়ি।

মিহির অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ছি-ছি, উনি এত উঁচুতে—ওঁর পাশাপাশি আমার নাম ওঠে কি করে?

অনীতা বলে, দিল্লি থেকে অলকের বাবা চলে আসছেন—আর ঠিক সেই মুখে এই কাণ্ড! চিঠি পড়ে অলকবাবু তো রেগেমেগে দিল্লিতে টেলিগ্রাম করতে যাচ্ছিলেন—

কে লিখেছে চিঠি?

নাম দেয় নি। অলককে দোষ দিই নে—সে চিঠি পড়লে কাঠের পুতুলেরও নড়ে উঠবার কথা। সত্যি, উড়ো চিঠি কে ছাড়ল বলুন তো—এত বড় ক্ষতি কে করল? তিন জন ছিলাম—তার মধ্যে ঝড়ু-দা লিখতেই জানে না। আর আমার নিজের ব্যাপার···মেয়েলোক হয়ে ইচ্ছে করে অপযশ কে ছড়ায় বলুন?

মিহির বলে, তবে তো আমারই উপর দোষ এসে পড়ে—

অনীতা উদার ভাবে বলে, প্রমাণ নেই যখন—সে কথা আপনাকে বলতে যাবো কেন? অলক মুখের উপরে চিঠি ছুঁড়ে দিয়ে গেল, পড়ে দেখতে পারেন যদি ইচ্ছে হয়—

চিঠি আনতে গেছে তো গেছেই। উদ্বেগে মিহির বসে থাকতে পারে না, পায়চারি করছে। কাঁদতে বসে গেল নাকি বেচারা নিজের ঘরে গিয়ে? না, খুঁজে পাচ্ছে না চিঠি,—হারিয়ে ফেলেছে!

কোথায় কান্না—হেসেই খুন অনীতা। চিঠিটা মেলে ধরে পড়তে পড়তে আসছে।

দেখুন, দেখুন—দিব্যি এক গল্প বানিয়েছে। আপনি নাকি পাগল হয়েছেন—হি-হি-হি—এই অনীতা লক্ষ্মীছাড়ির জন্যে। অলকের সঙ্গে মেলা-মেশা করি, আপনি তা পছন্দ করেন না। তারই হিংসেয় সোনারপুরের বনবাসে পড়ে রয়েছেন—

আর চেঁচিয়ে পড়তে পারে না। কি লজ্জা, কি লজ্জা!

মিহির খপ করে কেড়ে নেয় চিঠি। আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে তার মুখের দিকে তাকায়।

অনীতা বলে, বাবা হয়তো আমার মুখ দেখবেন না। কি উপায় হবে, ভেবে পাচ্ছি নে। সেই যে মাকে দেখে এলাম, তাঁকেই খালি মনে পড়ছে। সেদিন মা একটা কথা বললেন—

মিহির লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে, সেকেলে মানুষ—যা মনে আসে, না বুঝে বলে ফেলেন। এই জন্যে ইচ্ছে ছিল না, তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়। কিছু মনে করবেন না। অবশ্য দোষ আপনারও আছে। যা অভিনয়টা করলেন—ঘুণাক্ষরে যদি জানতেন আপনারা বড়লোক, কখনো তা হলে বলতেন না।

সেই ভয়েই তো জানতে দিই নি।

বলতে বলতে অনীতার কণ্ঠ গভীর হয়ে ওঠে। বলে, অভিনয় করে কত সুখ্যাতি আর হাততালি পেয়েছি। কিন্তু সেদিনের অভিনয়ে মায়ের ভালবাসা কেমনধারা তাই টের পেলাম। এত বড় পাওনা জীবনে হয় নি আমার।

মিহির এক মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে থেকে বলে, কিন্তু বড়লোকে কি থাকতে পারবেন পাড়াগাঁয়ের খোড়োবাড়িতে—

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে অনীতা বলে, কপালে থাকলে ঠেকাবে কে বলুন? নইলে থাকবার কথা তো অলকদের অট্টালিকায়, ঘোরবার কথা তাদের ঝকঝকে মোটরের কোটরে! অঙ্গ মুড়ে সোনা-হীরে-মুক্তোর আধ মন বোঝা বয়ে বেড়ানোর কথা। আপনি সমস্ত বানচাল করে দিলেন।

কি জানি—আমি কিংবা অন্য কেউ! উড়ো চিঠির লেখাটা কিন্তু আপনারই মনে হচ্ছে—

রাগ দেখিয়ে অনীতা বলে, অন্যায় সন্দেহ করবেন না।

হয়তো বা এক্ষুণি লিখে আনা হল, কালি শুকোয় নি ভাল করে। চিঠি, খুব সম্ভব, পৌঁছয় নি এখনো অলকবাবুর কাছে—

অনীতা বলে, তা সে যাই হোক, কথাগুলো আপনার কিনা বলুন। মিথ্যে কি সত্যি খুলে বলতে হবে আজকে। না জেনে আর আমার উপায় নেই—

সেই জানাজানির ব্যাপার নিয়ে চলল অনেকক্ষণ। একসময়ে মিহির আবার সজাগ হয়ে ওঠে।

উঃ, কি ফাঁকিবাজ! হেসে কেঁদে নানান রকম গল্প ফেঁদে মোটের উপর পড়ায় ফাঁকি দেওয়া। সেই পুরানো চালাকি! যা ভয় ধরালেন, আমার বুক ঢিবঢিব করছিল।

ভ্রূভঙ্গি করে অনীতা বলে, পড়ার ফাঁকিরই হিসাব রাখেন মাস্টার মশায়—লাভ হয় নি বুঝি কিছু?

কি আর হল? 'তুমি'-তেও পৌঁছানো গেল না এতক্ষণ হাঙ্গামা-হুজ্জুত করে।

বয়সে বড় আপনি, আপনারই আগে ধরবার কথা—

বয়সটা ছাড়া সব ব্যাপারেই বড় যে আপনি! বুদ্ধিতেও অনেক উপরে যান—

আবার ঝগড়া।

এমনি ঝগড়া করতে করতে ভাব হল অবশেষে। পাড়াগাঁয়ের স্বল্পবাক্ ছেলেটার কি হল আজকে—মুখে অবিরত কথার খই ফুটছে। অন্নপূর্ণা ঘটক দিয়ে যোগাযোগ করবার কথা বলেছিলেন—কিন্তু সে আমলের ঝানু ঘটকেরা কই? কোমর বেঁধে অতএব নিজেদেরই নেমে পড়া ছাড়া উপায় নেই। বহুবচনের প্রয়োগ কিন্তু নিতান্তই গৌরবে। বিয়ের কনের চুপচাপ ঘাড় নিচু করে বেড়াবার কথা; মাথার উপর দশজনা থাকেন, যা করবার তাঁরাই সব করেন। কিন্তু কপাল এমনি অনীতার—সকল কাজে সর্বজনকে চালিয়েচুলিয়ে বেড়াতে হয়। নিজের বিয়ের ব্যাপারেও তাই।

বাবাকে বলা হোক তবে—

কথাবার্তা আপাতত এইভাবে চলছে। 'আপনি' বলতে ইচ্ছে হয় না, আবার 'তুমি'ই বা হঠাৎ বলা যায় কেমন করে?

বাবাকে বলা হোক, তিনি হাঁসপুকুরে মায়ের ওখানে চলে যান। ছেলের মা, তার উপরে অমন সুন্দর মা—তাঁর কাছে মেয়ের বাপ গিয়ে কাতর হয়ে বলবেন—

মিহির আপত্তি করে, কাতর-টাতর হবার কি দরকার? মেয়ের বাপ হয়ে যেন চুরির দায়ে পড়েছেন।

মেয়েটা কালোকুচ্ছিত কিনা—

মিহির রেগে যায়, ঐ রকম যদি নিন্দেমন্দ করা হয় তবে আমি চলে যাচ্ছি।

অনীতা বলে, আমি তো নিজের কথা বলছি—

নিজের মানে কি? মানুষটি ষোলআনাই বুঝি নিজের—অন্তলোকের কিছু নয়? তাই বলে দেওয়া হোক, আমি চলে যাই।

অনীতা বলে, তা অন্তলোক এখনো যদি গা এলিয়ে বসে থাকেন, আর একজনে গোটাকয়েক মন্ত্র আউড়ে চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে দিল্লি নিয়ে তুলবে। সেই যোগাড় হচ্ছে। অবলা নারী কি করতে পারে এসব ব্যাপারে? পুরুষ মানুষের ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। আমার বাবাকে গিয়ে বলা হোক—

পুরুষ মানুষটির কিন্তু প্রস্তাবমাত্রেই কপালে ঘাম দেখা দিল।

উঁহু, আমি কি করে বলব? বামন হয়ে চাঁদে হাত—রেগে যাবেন।

অনীতা বলে, চাঁদে আগ্নেয়গিরি—অহরহ আগুন ঝরছে। যে আহাম্মক তার দিকে হাত বাড়ায়—রাগ নয়, দয়াই হবে তার উপরে।

কিন্তু বক্তৃতায় কি সাহসের সঞ্চার হয়? মফঃস্বলের ভালমানুষ ছেলে—নিতান্ত ক্ষেপে গেলে তখনই যা দুটো-একটা বুলি বেরোয়। ঠাণ্ডা মাথায় এর দ্বারা কিছু হবে না।

হিমাংশু এসে দাঁড়ালেন, মিহির ধড়মড় করে উঠল। অন্য সময় হলে যা হোক কিছু বলে; আজকে ঘাড় গুঁজে নেমে গেল তাড়াতাড়ি। সস্নেহ দৃষ্টিতে সেদিকে এক নজর তাকিয়ে দেখে হিমাংশু বললেন, পড়িয়ে গেল বুঝি? বেশ, বেশ! আজকেই আবার অলকের বাপ এসে যাচ্ছে—

কেন বাবা?

কলকাতা শহর দেখতে বোধ হয়—আবার কেন?

তারপর হাসতে হাসতে বললেন, তুই আমার হাবাগবা মেয়ে কিনা—কেন, কি বৃত্তান্ত একেবারে জানিস নে! বাড়ির বউ করে ঘরে তুলবে, তা চোখে দেখে নেবে না একটিবার?

বলে দাও বাবা, তুমি এখন মেয়ের বিয়ে দেবে না—

কেন ?

তোমার মেয়ের বিয়ে দেওয়া না-দেওয়া তোমার ইচ্ছে—অন্যকে তার কৈফিয়ত-দিতে যাবে কি জন্যে ? ভেবেচিন্তে এই রকম ঠিক করলে, বলে দাও সেই কথা।

হিমাংশু স্তম্ভিত হয়ে থাকেন এক মুহূর্ত। তার পরে ক্ষেপে উঠলেন, সকলকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবি—কোন্ লাটসাহেব হয়েছিস তুই !

অত চেঁচিও না বাবা—

আলবত চেঁচাবো। এমন মেয়ে কে কোথায় দেখেছে যে বাপের কথা শুনবে না, বাপের মুখ ছোট করবে ভদ্রলোকের কাছে ?

কোন্ কথাটা তোমার শুনি নে বাবা ? মিছামিছি গাল দিলে হবে না। বলো—একটা শুধু দেখিয়ে দাও। তারপরে আষ্টেপিষ্টে আমায় জুতো মেরো—

হাতের কাছেই দৃষ্টান্ত—যা নিয়ে কথা-কথান্তর চলছে। মেয়ের ভাব-ভঙ্গিতে তবু হিমাংশু হকচকিয়ে যান। সামলে নিযে তারপর বলেন, এতকাল ধরে চিঠি লেখালেখি করে—কতরকম খোশামুদি করে দিল্লি থেকে অবনীকে টেনে নিয়ে এলাম। এখন তুই উল্টোপাল্টা বলছিস—

বেশ, বলবো না আর-কিছু। পাকা দেখতে এসেছেন—তাই দেখে পাকা-পাকি করে যান।

বাঁ-হাতের উল্টো পিঠে অনীতা চোখ মুছল।

হিমাংশু চকিত হযে মেয়ের দিকে তাকালেন। ঘনপক্ষ্ম চোখ দুটো জলে ভরে গেছে।

কি হল রে ?

তাই হোক, দাও বিদায় করে আমায়। মস্ত লোক তাঁরা, আর আমি তো আছি তোমার লাটসাহেব মেয়ে—ঠিক মিলে যাবে।

হিমাংশু বিব্রত ভাবে বলেন, কান্নার কি হল রে বেবি ?

উঁহু, কান্না কিসের ? কতবড় বাড়িতে যাচ্ছি, আমার তো আমোদ-ফূর্তি ! তুমি কেঁদো একা-একা মুখ লুকিয়ে। যত রাত ইচ্ছে মামলার নথি দেখো, যখন খুশি খেও, বাসি ময়লা কাপড়-জামা পরে সন্ন্যাসী-উদাসীনের মতো

ঘুরে বেড়িও। বজ্জাত মেয়ে বিদায় হয়ে গেছে, কেউ তখন আর ঝগড়া করতে আসবে না।

এবারে যে বুড়ো বাপের চোখও ভারী হয়ে আসে। তবু হাসির মতো ভাব করে বলেন, নিজের কিছু দেখতে পারি নে—এমনি অপদার্থ ভাবিস আমায়? তুই-ই বেবি আমায় এক অপোগণ্ড শিশু করে রেখেছিস। তা সে যাই হোক, বুড়ো ছেলেকে আগলে বেড়িয়ে চিরদিন তো চলতে পারে না। তোর ঘর-সংসার আমোদ-আহ্লাদ আছে—

বাপের মুখোমুখি চেয়ে আবদারের ভঙ্গিতে অনীতা বলে, তোমায় বাদ দিয়ে কোন ঘর-সংসার আমি চাই নে বাবা।

শোন পাগলির কথা! মাথায় কেবল বেড়েছিস, বুদ্ধিজ্ঞান এক ফোঁটা যদি থাকে!

মনে মনে হিমাংশুর একটু যেন আনন্দও হয়। এতখানি বড় হল, তবু শিশু একেবারে। অনেক ভাগ্যে অলকের মতো পাত্র মিলছে। ছেলেমানুষের খেয়ালমতো সত্যি সত্যি এমন পাত্র অবহেলা করা যায় না তো!

হিমাংশুর পিঠোপিঠি এক বোন ছিল—প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কি কান্না কেঁদেছিল সে! পাষাণ গলে যায়, এমন আর্তনাদ। ছবিটা স্পষ্ট মনে পড়ে এখনও। বছর কয়েক পরে সেই বোনকে একসঙ্গে দুটো দিন বাপের বাড়ি ধরে রাখা যেত না। না বাপু, সমস্ত নয়-ছয় হয়ে যাবে আমি এখানে পড়ে থাকলে। শ্বশুরঠাকুরের আহ্নিকের কোশাকুশিটা অবধি কেউ এগিয়ে দেবে না।···বেবির মনটা হল আরও নরম—কোথায় কি তার ঠিক নেই, শ্বশুরবাড়ির নাম শুনেই কান্নাকাটি লাগিয়েছে। এই বেবি-ও আবার একদিন বলবে, আমি না গেলে শ্বশুরঠাকুরের আহ্নিক হবে না বাবা—। তাঁর বেবি গিয়ে অবনীভূষণের খবরদারি করবে।

মুখ ফিরিয়ে হিমাংশুও কোঁচার খুঁটে অতি-সন্তর্পণে চোখ মোছেন। আহা, হোক তাই! শ্বশুর-শাশুড়ির আদরের বউ হয়ে সংসার করুকগে। মা-বাপের এর চেয়ে আনন্দ আর কিসে? বেবির মা-ও স্বর্গে বসে এমনি ধারা হয়তো আনন্দে চোখ মুছছেন।

কাল বিকালে আশীর্বাদ-লগ্নপত্র—আত্মীয়-কুটুম্বেরা আসবেন। তার মধ্যে

মুখ ভার করে বেড়াবি তো বলে দিচ্ছি বেবি, বাড়ি ছেড়ে যে দিকে দু-চোখ যায় আমি বিদেয় হয়ে যাবো।

মেয়েকে কড়া ভাবে শাসিয়ে হিমাংশু কিন্তু বেশিক্ষণ সামনাসামনি থাকতে ভরসা করেন না। তাঁর চোখে জল দেখতে পেলে সর্বনাশ—মেয়েটা একেবারে পেয়ে বসবে, আর তখন কোন রকমে সামলানো যাবে না।

সড়াক-সড়াক করে রেলগাড়ি ছুটে আসছে কলকাতামুখো। আসছে দিল্লি থেকে। গাড়ি লাইন থেকে ছিটকে পড়ুক, কিম্বা কলিশন হোক অন্য গাড়ির সঙ্গে। প্রাণের হানি হয় সেটা অবশ্য চায় না অনীতা। নিরীহ নির্দোষ মরবে কেন? কলিশনের পর পিতৃবন্ধু অবনীভূষণ হাসপাতালে গিয়ে থাকুন না দু-চার মাস! হাসপাতালে অনেক সময় বাড়ির চেয়েও আরাম। বয়স হয়েছে—নির্ঝঞ্ঝাটে বেশ থাকতে পারবেন।

তারপরে দু-মাস হোক ছ-মাস হোক, বেরুবেন তো একদিন—তখন? এতবড় বাধা পড়ল, ঐ অপয়া মেয়ে ঘরে তুলো না হে! বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ—শুভকাজে নইলে অমন বাগড়া পড়বে কেন?

ঝড়ু হেনকালে সংবাদ আনল, অলকবাবু এসেছেন—

আলস্যে দু-হাত মেলে আড়ামোড়া খেয়ে অনীতা বলে, বাড়ি নেই—বলোগে ঝড়ুদা, কোথায় বেবিয়েছে সন্ধ্যাবেলা আড্ডা দিতে। খুব গালমন্দ করোগে—

ঝড়ুর কাছে খবর শুনে অলক রাগের চোটে দিশা করতে পারে না। হিমাংশু নেই, কোন দিন এ সময়ে বাড়ি থাকেন না। ডাক দিল, পিশিমা!

কমলবাসিনী তাড়াতাড়ি এসে বলেন, এসো বাবা, এসো—

অনীতা বেরিয়েছে। ক-দিন আসতে পারি নি, অমনি এক চিঠি। চিঠি লিখে আমায় টেনে নিয়ে এলো—

তিক্তহাসি হেসে বলে, চিঠি ডাকে ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বোধকরি চিঠির কথাগুলো বেমালুম ভুলে যায়। কিম্বা মজা দেখে বেকুব বানিয়ে। আড্ডা আজকাল দেখতে পাচ্ছি রাত্রিবেলাও চলছে। আমার কাজকর্ম আছে—চিঠিপত্র লিখতে মানা করে দেবেন পিশিমা—লিখলেও আর আসছি নে।

কমলবাসিনী ঠাণ্ডা করার চেষ্টায় বলেন, ভিতরে এসে বোসো বাবা। এসে যাবে এক্ষুণি। চা পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি চলে যেও না।

একটুখানি দেখেই যাওয়া যাক তবে। শোধ নিয়ে যাবে মর্মান্তিক কিছু বকুনি নিয়ে।—চিঠির কায়দাটা রপ্ত করেছ ভারি চমৎকার! এমনটি আর কক্ষণো হবে না—এই এক কথা কত বার হল অনীতা দেবী? চিঠি যেন এক-একটা বড়শির কাঁটা—গলায় নয়, আরও নিচে বুকের ভিতরে বিঁধে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসে। টেনে আনে এ-বাড়ির লনের ধারে, সেখান থেকে বারাণ্ডায়, কোনদিন বা ঘরের ভিতর। তারপরে যথারীতি কমলবাসিনীর শুষ্ক মুখের আপ্যায়ন, সীতার সঙ্গে ধ্যানস্থ হয়ে থাকা মুখোমুখি। ফটক দিয়ে কেউ ঢুকছে অমনি সচকিত হয়ে তাকানো—ফেরা হল বুঝি এতক্ষণে! বসে বসে হাই তুলে অবশেষে উঠে পড়া একসময়। আর নয়—এবারে ইতি। আসতে হয়তো এর পর আসবে একেবারে টোপর-মাথায় দাবির জোর নিয়ে। করুণাপ্রার্থী ভিখারির মতন নয়।

সীতা ভাঁড়ারঘরে। আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে; ছানার ডালনা হবে—ডুমো-ডুমো ছানা কুটে রাখছে থালায়। আধ-অন্ধকার ঘরে ঘাড় গুঁজে একা-একা কাজ করছে। কমলবাসিনী এসে ডাকেন, উঠে আয়—একটা ফর্শা কাপড় পরে খাবারগুলো হাতে করে নিয়ে যা।

না, কক্ষণো যাবো না—

ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হয়, কথা আটকে আসে। কেন, কি দোষ আমার? অনীতাই ধরে ধরে টেনে নিয়ে যায়। অলকবাবু নাকি অপমানিত মনে করেন নিজেকে! আমার নাকি বড্ড দেমাক—ঘেন্না করি শহুরে মানুষদের। না গিয়ে তারপরে উপায় কি? আর তাই নিয়ে তুমি এত কথা শোনাবে!

আকুল হয়ে কেঁদে উঠল। কমলবাসিনীরও কষ্ট হয়। চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেন, কত জ্বালায় পড়ে বলি, সে তো বুঝিস নে মা! দোষ আমাদের অদৃষ্টের। একটু চিকচিকে আলোর আভাস পেলাম, তা-ও সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিভে গেল। অনীতা বাড়ি নেই। অলক এসে একলা বসে রয়েছে—সে-ও বিষম দোষের হয়ে দাঁড়াচ্ছে! যা মা তুই, আমার ঘাট হয়েছিল। শুভকাজটা চুকে গেলে যে বাঁচি! বলি, মা হয়ে কি পায়ে ধরতে বলিস আমায়?

উঠতে হল তখন। কাপড় বদলাতে যাচ্ছে, সেই সময় অনীতার ঘরে নজর

পড়ল। অনীতা রয়েছে ঘরে—বাঁচা গেল! মা বলল, বাড়ি নেই। দিব্যি তো শুয়ে পড়ে আছে।

অলকবাবু বসে আছেন—

বড্ড মাথা ধরেছে দিদি। উঠতে পারছি নে।

সে হয় না—

অনীতা রেগে বলে, উঠতে গেলে মাথা ঘুরে মরে যাবো। তাই চাচ্ছিস নাকি তোরা?

অলক যে-দৃষ্টি দিয়ে তাকাবে তার সামনে অনীতা আর কিছুতে দাঁড়াতে পারবে না। কিছুতেই না! ছি-ছি, ভাবতে গিয়েই গা ঘিনঘিন করে। আঙুলে কপাল টিপে সে পাশ ফিরে শুল। শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে।

চা-খাবার দিয়ে সীতা অলকের সামনে একটা চেয়ার নিয়ে বসল। বলে, মাথা ধরে পড়ে আছে বেচারি, বড় কষ্ট পাচ্ছে। উঠবার জো থাকলে ও কি শুয়ে থাকবার মেয়ে?

অলক চমকে তাকায়, আছেন বাড়িতে তবে? ঝড়ু কিন্তু বলল—

সীতা সামলে নেয়, ঝড়ু-দা জানে না হয়তো—

উপরে গিয়ে নিজে দেখে এসে বলল। আমি এলেই মাথা ধরে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে! চাকরবাকর অবধি শেখানো। ঝড়ু মিথ্যে বলছে, ওর মুখ দেখেই মনে হয়েছিল আমার।

কণ্ঠ রুক্ষ হয়ে ওঠে। বাড়িতে ডেকে এনে কি দরকার এমনিভাবে অপমান করবার? জিজ্ঞাসা করে আসুন দিকি দয়া করে।

খাবার একটুখানি তুলে নিয়েছিল, সেটা নামিয়ে রেখে দিল। সীতার মুখে নজর পড়ল। চোখ-মুখ ধুয়ে এসেছে, তরুণ ব্যারিস্টারের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তবু ধরা পড়ে যায়।

কি হয়েছে আপনার?

কিছু না—

হয়েছে নিশ্চয় বাড়াবাড়ি রকমের কিছু।

সীতা উড়িয়ে দেয়, সর্দিভাব হয়েছে একটু—

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে অলক বলে, আপনার উপর অনেক অত্যাচার হয় জানি—

কে বলল ?

আমি জানি। ঘরের মধ্যে আপনাকে নজরবন্দি করে রাখে। অন্য কেউ নয়—অনীতা বলেছে। অনীতা স্বীকার করেছে আমার কাছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে শশব্যস্তে সীতা বলে, চুপ করুন—কে শুনে ফেলবে। কিচ্ছু হয় নি আমার।

বেশ—না হোক কিছু! আমি এখন কি করতে পারি, সেইটে শুনতে চাই।

সীতা কি বলবে—ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। যতটা সম্ভব সহজ হবার চেষ্টা করে বলে, বিয়ের আগে ঝগড়াঝাটি করতে নেই অলকবাবু, পরে করবার নিয়ম। অনীতা দুষ্টুমি করছে—বেশ তো, না-ই বা এলেন এই ক'টা দিন!

উগ্র কণ্ঠে অলক বলে, আসতে মানা করছেন ?

থতমত খেয়ে সীতা বলে, শিগগিরই বিয়েথাওয়া হয়ে যাচ্ছে—কি দরকার তবে ছুটোছুটির ? অনীতা লিখে পাঠালেও এখন আর আসবেন না—মান করে থাকবেন।

যদি বলি, আসি আপনার জন্যে—আপনি আমার জীবনে আসবেন সেই আশায়—

কি সর্বনাশ, কিসে কোন কথা এসে পড়ল! সীতার সর্বাঙ্গ ঠকঠক করে কাঁপছে। পড়ে যায় বুঝি বা!

অলক থামে না। মন তার তিতবিরক্ত হয়ে গেছে অনীতার অবহেলায়। বলতে লাগল, এ বাড়ি গোড়ায় আসা-যাওয়া অনীতার সম্পর্কে। ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে—স্বীকার করছি, নিজেকে বুঝতে দেরি হয়েছে আমার। কিন্তু ধরা পড়ে গেছে তার ভিতরের হীনতা। থাকুক সে অহঙ্কার আর সস্তায় হাততালি কুড়ানোর রুচি নিয়ে—কোন মোহ নেই তার সম্পর্কে। আরও স্পষ্ট করে, বলছি, ঘৃণাই করি তাকে—

অনীতা!—প্রেতছায়ার মতো অনীতা সহসা ঘরে ঢুকল। নাটকের মধ্যে ঠিক-সময়টা যেমন স্টেজে এসে ঢোকে। নেমে এসেছে কখন—বাইরে আড়ি পেতে ছিল। উত্তেজনায় কাঁপছে।

এই ছিল তোর মতলব দিদি ? দিদি বলে আর ডাকবো না তোকে, মুখ দেখবো না জীবনে—

তারপর হাহাকারের মতো চেঁচিয়ে উঠে, শোন পিশিমা, শুনে যাও এদের কথা। আমি হীন—অলকবাবু ঘৃণা করেন আমায়—

নিঃসাড়ে চলে গেছে অলক। বাড়ি থমথম করছে। খণ্ডপ্রলয় আসন্ন—হিমাংশুর ক্লাব থেকে ফিরতে যা দেরি। ভাঙা কুড়েঘর থেকে বোন বলে ডেকে কমলবাসিনীকে তিনি বাড়ি এনেছিলেন, আবার যেতে হবে ফিরে—কোথায় ? সে কুড়ে এখন তো অন্য একদল উদ্বাস্তু দখল করে নিয়েছে।

ক্লাব থেকে ফিরে রাতের খাওয়া। আজকের টেবিলে একজনের খাবার। হিমাংশু আশ্চর্য হয়ে কমলবাসিনীর দিকে তাকান।

বেবি ?

শুয়ে পড়েছে—

আমি না আসতে বড় শুয়ে পড়ল! অসুখবিসুখ করে নি তো ?

না—

স্থির থাকতে পারেন না। বললেন, বোসো কমল—লুচিটুচি পরে দিও, বেবিকে ধরে নিয়ে আসি।

অনীতা শোয় নি—খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে। নিপাট ভালমানুষটি। এমন তো দেখা যায় না আর কখনো! পরের ঘরের বউ হতে যাচ্ছে বলে নাকি ?

হিমাংশু বলেন, দেখ—শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সভ্যভব্য হোস। আমার বাড়ি এমন বিয়ের কনে হয়ে থাকা চলবে না, আমি বরদাস্ত করতে পারি নে।

জবাব দেয় না অনীতা। কাছে এসে হিংমাশু ঠাহর করে দেখেন। ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ছে দু-গাল বেয়ে।

কান্না কেন—কি হয়েছে মা ?

অনীতা ধপ করে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ল। সর্বদেহ আকুঞ্চিত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। কি করবেন, হিমাংশু ভেবে পান না। বিছানার প্রান্তে বসে পড়ে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। তারপরে জোর করে মুখ তুলে ধরেন।

হল কি রে ?

তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না।

এই ব্যাপার! ক্লাবে যাবার আগে যা হচ্ছিল, তারই জের আর কি! ক্লাবে খবর পেলেন, অবনীভূষণ নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেছেন। সুখবর শোনার পর থেকে তাঁরও মনটা ঝিমিয়ে আছে।

অনীতা বলে, বিয়ে ভেঙে দাও বাবা। আমি মরে যাবো—

পাগলামি করিস নে। সমস্ত ঠিকঠাক, অবনীও এসে গেছে। অবনী নয়—বেহাই বলতে হবে বুঝি এখন থেকে!

জেদ ধরে অনীতা। বাপের দিকে ফিরে তেজি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, কক্ষণো যাবো না আমি এ-বাড়ি ছেড়ে। মেরে ফেল, কেটে ফেল—তোমার পায়ের তলায় পড়ে থাকব, কিছুতে যাচ্ছি নে। কার ক্ষমতা আছে, আমায় নিয়ে যাবে!

হিমাংশু রাগ করে বলেন, আশীর্বাদের নেমন্তন্ন-আমন্ত্রন হয়ে গেছে, সবাই জেনেছে অবনীর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে—আমার কথার একটা দাম নেই ?

অনীতা বলে, আছেই তো! আর-এক মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও—

হিমাংশু অবাক হয়ে তাকালেন।

দিদির বিয়ে দাও ওখানে। সে তো বয়সে বড—তার বিয়ে আগে হওয়া উচিত।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে হিমাংশু ক্ষণকাল কথা বলতে পারেন না। তারপর জ্বলে উঠলেন, এ কি বাজারে মাছ-তরকারি যে এটা সুবিধে হল না তো ঐটা? অলকের মতো ছেলে হাজারে একটা মেলে না জানিস? সে-ই বা রাজি হবে কেন?

সে চায় তো এই। আমি জানি, আমি জানি—

গলা ধরে আসে অনীতার। হিমাংশু চমকে তাকালেন, বলছিস কি তুই?

অলকবাবু আমায় ঘৃণা করেন, আমার নাম করে যাচ্ছেতাই বলেছেন আজকে।

হিমাংশু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেয়ের কাছ থেকে শুনলেন। শুনে কঠিন হলেন।

বিয়ে তোর ওখানে হচ্ছে না সে ঠিক। কিন্তু বিপদ হল, আমার চিঠির উপর নির্ভর করে অবনী অতদূর থেকে এসে পড়েছে—

অনীতা অধীর কণ্ঠে বলে, ছেলের বউ-ও তো পেয়ে যাচ্ছেন তিনি। আরো সুন্দরী বউ—

হিমাংশু চিন্তিত ভাবে বলেন, চিঠিতে পাওনাথোওনার আঁচ দেওয়া হয়েছিল। টাকাকড়ির ব্যাপারে অবনী বড হিসেবি। এত উৎসাহে ছুটে আসার তা-ও একটা কারণ বটে!

অনীতা বলে, টাকার চেয়ে তোমার সুনাম অনেক বড়। কথা যখন দিয়ে বসেছ, পেছুবে কেমন করে? তা তোমার যদি আর-একটা মেয়ে থাকত! তাই ভেবে নাও না, সীতা তোমার বড় মেয়ে—তোমার বড় মেয়ের আশীর্বাদ হচ্ছে।

আরও ভাবলেন হিমাংশু। অবস্থা গতিকে তাই তো হয়ে দাঁড়াচ্ছে! অলকের ঐসব কথার পরে আর ওখানে মেয়ে দেওয়া যায় না। মেয়ের সুখ-শান্তি সকলের আগে। ব্যাপার উডিয়ে দেবার জন্য হেসে উঠে বললেন, সে যা হয় হবে। সারারাত্তির—তারপর বিকেল অবধি ভাবনার সময় আছে। এখন খেতেটেতে দিবি আমায়, না তোর মতন আমিও মুখ গুঁজে বিছানায় গিয়ে পড়ব?

বেরোলেন বাপে-মেয়েয়। এবং যেমন হয়ে থাকে—হাসি-গল্পে খাওয়া শেষ হল। উঠবার সময় হিমাংশু কমলবাসিনীকে ডেকে বলেন, আশীর্বাদ বেবির নয়, সীতার। অবনীকে মেয়ে দেখিয়ে যদি অবশ্য রাজি করাতে পারি। মেয়ে ভালো, খরচপত্রও করব আমি—কেন রাজি হবে না? বিশেষ করে অলক যখন এতখানি রাজি। বিকেল পাঁচটা-পঁয়ত্রিশে আশীর্বাদ। সকালবেলার দিকে অবনীকে আগে আলাদা ভাবে মেয়ে দেখাবো।

খানিকটা হাঁ-না করে শেষটা হিমাংশুরই জেদে অবনী রাজি হয়ে চলে গেলেন। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল! সীতার দোষ নেই—কে মানছে সে কথা? অন্য লোকে যা ভাবুক, অনীতাকে সমস্ত বলে হালকা হতে হবে। কিছু জানি নে ভাই—বিশ্বাস কর্, আমি এসব স্বপ্নে ভাবি নি। আহা,

অনীতা বেচারি সকাল থেকে কোথাও আজ বেরোয় নি ; বাড়িখানার ভিতরে মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। অপমান কম নয় তো! নিরিবিলি চাই যে অনীতাকে একটুখানি।

উপরের বড় ঘরে বরপক্ষ এসে বসবেন, আশীর্বাদ সেইখানে। ঘর সাজানো-গোছানো হচ্ছে। সীতা ওদের মধ্যে থাকতে পারে না। পিছনে ফাঁকা দিকটায় ঝুলবারাণ্ডায় চলল সে।—অনীতা না? একলা পাওয়া গেছে অনীতাকে। বারাণ্ডা থেকে অতি সতর্কভাবে উঁকি দিচ্ছে যে ঘরে সীতা আর কমলবাসিনী থাকেন। যেন চোরের ঘরে মালের খোঁজ নেওয়া। চোরই বটে! অনীতার কত সাধ আর স্বপ্ন চুরি করে নিয়েছে। কত কাল ধরে লালিত স্বপ্ন!

পিছন থেকে গিয়ে সে অনীতার হাত জড়িয়ে ধরে। এক ঝাঁকিতে অনীতা হাত ছাড়িয়ে নিল। তাকাল তার দিকে—দৃষ্টিতে আগুন।

এই করলি তুই শেষ পর্যন্ত—বর ভাঙিয়ে নিলি? ডুবে ডুবে জল খেতিস। দিদি বলতাম তোকে—দিদি নয়, ডাকাত। সকলে আজ হাসাহাসি করবে আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে। এমন জানলে যেতে দিই তোকে অলকের কাছে?

বলতে বলতে মুখে আঁচল দিল। কান্না চাপতে চাপতে ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করল। খিল এঁটে দিয়েছে। ধপাস করে শব্দও হল যেন। মেঝেয় পড়ল আছাড় খেয়ে? বাড়ির মধ্যে অভিমানী আদুরে মেয়ে—এত বড় আঘাত পায় নি জীবনে কোনদিন।

কি করে সীতা এখন! অনুষ্ঠানের আয়োজনে সকলে ব্যস্ত। খিল-আঁটা দরজার সামনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভয় হচ্ছে। যা মেয়ে—কোন-কিছু অসম্ভব নয় ওর পক্ষে। বিষটিষ না খায়! পাবে কোথায় বিষ? বিষ তো বিষ—মনে করলে ও বাঘের দুধ দুইয়ে আনতে পারে। কলেজের ল্যাবরেটারি থেকে বিষ জোগাড় করে আনা মোটেই কঠিন নয় ও-মেয়ের পক্ষে।

দরজায় টোকা দিচ্ছে। সাড়া নেই। সীতা আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

অনি, অনীতা, দুয়োর খোল ভাই—

আছে কি মারা গেছে এতক্ষণে, কে জানে? যত ভাবছে, অধীর হয়ে

উঠছে। শেষে কেঁদে ফেলে, আমি কিছু জানিনে তাই। দরজা খোল, সমস্ত বলছি—কোন দোষ নেই আমার।

কপাটের তক্তার জোড়ে একটুখানি ফাঁক—সেখানে চোখ রেখে ভিতরটা দেখে। গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। চেয়ারের উপরে দাঁড়িয়ে অনীতা। দেয়াল ধরে আরও উপরে উঠবার চেষ্টা করছে।

কমলবাসিনী কি কাজে যাচ্ছিলেন। উত্তেজিত স্বরে সীতা তাঁকে ডাকল, মা, এসো শিগগির—সর্বনাশ হয়ে যায়—

তাই বটে! ছাতের কড়িকাঠে আংটা লাগানো। অনীতা শাড়ি বাঁধবে বোধ হয় ঐ আংটায়। আংটায় শাড়ি ঝুলিয়ে গলায় দড়ি দেবে।

মায়ে-মেয়ের দরজা ঝাঁকাচ্ছেন।

অনীতা, ওরে অনি, খোল্ বলছি—নইলে ভেঙে ফেলব। খুলবি নে? লোক ডেকে জমায়েত করি তবে?

খিল খুলে গেল। খুলে দিয়ে অনীতা মুখ ঢেকে পড়ল সীতার বিছানায়।

রকম-সকম ভাল বোধ হচ্ছে না। কিছু খেয়ে বসেছে নিশ্চয়। ভয় পেয়ে কমল কাকুতিমিনতি করছেন, অনীতা, লক্ষ্মীসোনা, মুখ তোল। কথা বল মা আমার—

কানে নেবার মেয়ে কি অনীতা? প্রাণপণে আরো মুখ এঁটে আছে।

হাঁ কর—

জোর করে হাঁ করানো হল। খেয়েছে বটে—বিষ নয়, সন্দেশ। অনেক রকম মিষ্টান্ন এসেছে—সন্দেশটা সাবধান করে তোলা ছিল আলমারির মাথায়। দেয়াল বেয়ে উঠে তাই খোঁজাখুঁজি হচ্ছিল। খিল খুলে দেবার পরেও মুখের ভিতর অবশিষ্ট ছিল কিছু। চুপিসারে সেটা শেষ করতে চেয়েছিল, হয়ে উঠল না।

ওরে বজ্জাত—অ্যাঁ, এই কাণ্ড তোমার?

মুখ এখন খালি, তাই অনীতা খিলখিল করে হেসে উঠল।

সীতা রাগ দেখিয়ে বলে, হাসি আসছে তোর? এত কাণ্ডের পরে সন্দেশ খাওয়া—মানুষ না কি তুই?

অনীতা ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, কি করব! একগাদা গালি দিয়ে গেলেন কাল

অলকবাবু—শুনলি তো নিজের কানে? সেই থেকে মনটা খারাপ হয়ে আছে—

কমল হেসে বললেন, সন্দেশ খেয়ে তাই মন ভাল করে নিলি?

অনীতা তাঁকেই সালিশ মানে, বলো পিশিমা, নিজের বিয়ের ব্যাপারে যদি সন্দেশ খেতাম নিন্দের হত। বিয়ে আমার দিদির—খাবোই তো আমি আগে! আমি বলে সকাল থেকে মতলব ছকে বসে আছি—কোথাও বেরুচ্ছি নে!

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দু-হাত মাথায় তুলে চাঙ্গা হয়ে নিচ্ছে।

উঃ, কি বাঁচা বেঁচে গেলাম! মরুকগে দিদি ঘোমটা দিয়ে ভাঁড়ার গুছিয়ে আর শতেক জনের বকুনি খেয়ে। আমি পাবি ওসব? এই দু-মাস পরে পুজোর সময় আবার থিয়েটার। তাব জন্যে কত খাটনি, কত রকম যোগাড়যন্তোর!

কমলবাসিনী বাঁকা হাসি হেসে সরে গেলেন। ঘড়েল মেয়ে বটে! মচকায় তবু ভেঙে পড়ে না। কিন্তু ঘটে যার একটু বুদ্ধি আছে, সে ভুলবে না তোমার এই একটু সন্দেশ খাওয়ার অভিনয়ে। ভোলে, ভালই—তাঁদের মা-মেয়ের উপর দোষ পড়বে না।

১৬

সমস্ত সন্ধ্যাটা সমারোহ চলল। আশীর্বাদের মুখে কনে বদল হয়েছে, ভিতরে গুহ্যতত্ত্ব রয়েছে অতএব। সেই মজায় আত্মীয়জন—বিশেষ করে মেয়েদের সমাগমটা বেশি। হিমাংশুর প্রশংসা সকলের মুখে। এ-যুগে এমনটা দেখা যায় না। পূর্ববঙ্গ-থেকে-আসা নিতান্ত পথের মানুষ বললে হয়—তাদের জন্য এতখানি কেউ করে না। ঘরে বরে এমন সম্বন্ধ, এত অর্থব্যয়! অন্য লোকের কথা কি—অবনী অবধি তাজ্জব। গোড়ায় দোমনা ভাব ছিল, কিন্তু ছেলে পছন্দ করে কথা দিয়ে বসেছে—শিক্ষিত একালের ছেলে—প্রতিকারের কিছু চোখে পড়ল না। তবে পছন্দ করার মতো পাত্রী—এটা-ও ঘাড় হেঁট করে মেনে নিতে হল।

ঠারে-ঠোরে নানান কথা চলছে। এত বড় পাকা উকিল হয়ে এমন ভুলটা হিমাংশু কেন করলেন, কেউ ভেবে পায না। সীতার মতন অত রূপের মেয়েকে কেউ রাখতে দেয় নাকি নিজের চাপা-রঙের মেয়ের পাশে? উদ্বাস্তুর দুঃখে মন কেঁদেছিল—বেশ তো, বস্তি অঞ্চলের যে-বাসায় থাকত, সেইখানে রেখেই উপকার করা চলত। তাতেই বর্তে যেতো ওরা। আহা, অনীতার মা নেই—বাড়ির গিন্নি বর্তমান থাকলে এই কেলেঙ্কারি কখনো ঘটতে পারত না। অলক হেন পাত্র—তার উপরে অবনী এক মস্ত খবর দিলেন, ছেলের জন্য মোটা চাকরি জুটিয়েছেন ঈজিপ্ট-অ্যাম্বাসিতে। আরম্ভেই এই—একটু বয়স হয়ে পাকাপোক্ত হয়ে উঠলে এ ছেলে কদ্দূর উঠবে, তেবে হদিস হয় না। বিশেষ করে অবনী যখন রাজধানীর বুকের উপর অহরহ লেগে পড়ে আছেন।
।হিমাংশু
এমন রত্ন মুঠোর মধ্যে এসে পিছলে গেল—হায় কপাল অনীতার
ভাবছেন, ততই

কমলবাসিনীর দিকে নিমন্ত্রিতেরা তাকাচ্ছেন কেমন-কেমন
এতদিন নজর
কমলের তাই মনে হয়। ছুটোছুটি আদর-আপ্যায়ন সবই তি
কারো মুখের পানে তাকাতে ভরসা হয় না। ক্যাটক্যাট
বেবি। ছেলে নেই

শক্ত কথা শুনিয়ে দেবে—হিমাংশু রায়ের বোন সেজে এসে যে কাণ্ডটা ঘটালে, বুকে বসে দাড়ি উপড়ানো বলে একে। অথচ অন্তর্যামী সাক্ষী, কমল কিছুই জানেন না। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল—স্বপ্নের অতীত এ সমস্ত। এখনো মনে হচ্ছে—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন, ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে অলীক হয়ে সমস্ত মুছে যাবে।

প্রহর খানেক রাত্রি। কাজকর্ম চুকে গেছে। বারাণ্ডার আলো নিভিয়ে দিয়ে হিমাংশু চুপচাপ বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছেন। অনীতা নিঃশব্দে এসে বাপের কাছে দাঁড়াল। কতক্ষণ ধরে আছে—ঝিনঝিন একটু-আধটু চুড়ির আওয়াজও না হয়েছে এমন নয়—বাবার তবু সাড় নেই। তখন অনীতা ফুঁপিয়ে ওঠে, আমি এসে দাঁড়িয়ে আছি টের পেলে না বাবা?

হিমাংশু চমকে ওঠেন। হাত ধরে টেনে মেয়েকে কোলের কাছে বসালেন। বেকুব হয়ে বলেন, অন্ধকার কি না—

অনীতা অভিমানে ভেঙে পড়ে। আমায় চিনতে তোমার বুঝি আলো লাগে বাবা? আলো নি কেন আলো? অন্ধকারে কেন এমন একা-একা বসে আছ?

আলো জেলে দিয়ে বাপের মুখে নজর বুলিয়ে বুলিয়ে দেখে।

বাবা, সবাই তোমায় ধন্য-ধন্য করে গেল। আর তুমি মুখ-ভার করে আঁধারে বসে আছ!

হাসির মতন ভাব করে হিমাংশু বলেন, কই—মুখ ভার তুই কোথায় দেখলি?

বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার ফিকির করছিলে! ভেস্তে গেল, তাই মনে লেগেছে। বাবা, তুমি একটুও ভালবাস না আমায় আজকাল। বিদেয় করতে পারলে বেঁচে যাও।

ন গেছি, দিন ফুরিয়ে এলো। তোর একটা সংসার না গুছিয়ে মরেও শান্তি হবে না বেবি।

ভঙ্গি করে বলে, ওঃ—মরবেন উনি! হতে দিলাম আর কি! গয়েছে তোমার, ঐ সমস্ত বলে বলে আমায় ভয় দেখাও। আর

তা-ও বলে দিচ্ছি—সংসার গোছাও আর যা-ই করো বাবা, তোমায় ছেড়ে তোমার এই বাড়ি ছেড়ে এক-পা আমি যাচ্ছি নে। ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিলে সুড়ুত করে আবার ঢুকে পড়ব।

হিমাংশু স্নেহদৃষ্টিতে চেয়ে বলেন, পাগলি!

আচ্ছা, দেখো তুমি। তোমায় না দেখে আমি যে একটা দিনও থাকতে পারি নে বাবা।

ঝরঝর করে চোখের প্রান্তে গড়িয়ে পড়ে। এটা অভিনয় নয়—অভিনয়ে এতদূর হয় না। হিমাংশুরও চোখের পাতা ভারি-ভারি। বললেন, সে তো বুঝলাম। কিন্তু যে-লোক নতুন বাবা হয়ে বসবে তার দাবি সে ছেড়ে দেবে কেন?

সেখানে জবরদস্ত বাবা নেই, সেই জায়গা দেখ তা হলে। যেখানে তোমার-আমার কথা থাকবে, আমাদের দুঃখ বুঝবে যারা।

বলতে বলতে হেসে ওঠে। বাবারে বাবা, কি ফাঁড়া কাটল আজকে! লেকরোড নয়, দিল্লি শহরও নয়—নিয়ে তুলত সাহারা মরুভূমির দেশে। দু-হাত দিয়ে বাপের মুখ তুলে ধরে বলে, তুমিও কি সইতে পারতে বাবা? কক্ষণো না। লোকে হাসাহাসি করত—দেখ, এত বড় বিচক্ষণ প্রবীণ মানুষটা ছেলে-মানুষের মতন চোখ মুছছে। বড্ড রক্ষে পেয়েছি—না? বলো তুমি, লজ্জা কি—মনের কথাটা খুলে বলো।

মনের মধ্যে যা-ই হোক, হিমাংশুকেও তখন হাসতে হয় মেয়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে। অনীতা হাত ধরে টেনে বলে, উপরে চলো। খাওয়া-দাওয়া হবে না—খিদে পেয়ে গেল যে!

তুই রাক্ষুসি চুরি করে আধ হাঁড়ি সন্দেশ মেরে দিয়েছিস, আবার খিদে?

অনীতা গাঢ় স্বরে বলল, আমার নয় বাবা—তোমার। রাগ করে আছ কিনা—খিদে-তেষ্টা তাই টের পাচ্ছ না।

হাত ধরে বাপকে উপরে নিয়ে চলল। মেয়ে বকর-বকর করছে, হিমাংশু ভাবতে ভাবতে যাচ্ছেন। হঠাৎ যেন আলো পেলেন। যত ভাবছেন, ততই স্ফূর্তি আসছে। কি রকম অন্ধ আমি দেখ—এত কাছের বস্তুটায় এতদিন নজর পড়ে নি!

আপন মনে হাসছেন। হাসিমুখে বলেন, বাজে কথা রাখ বেবি। ছেলে নেই

—আমারও তো একটা ছেলের গরজ। চিরজন্ম এমনি খেটে খেটে মরব নাকি ?

একটুখানি থেমে সঙ্কোচ-ভরা মৃদুকণ্ঠে বললেন, শোন্—মিহির ছেলেটিকে বড্ড ভাল লাগে।

বলেন—আর ভয়ে ভয়ে তাকান মেয়ের দিকে। অনীতা মুখ-ঝামটা দেয়, দূর।

সাহস পেয়ে হিমাংশু বলেন, কেন—মন্দ হল কিসে ? অবস্থা ভাল না হতে পারে। আর একেবারে মন্দই বা বলি কি করে ? খোড়োবাড়ি বটে, কিন্তু ধানী-মানী গৃহস্থ। বীরেশ্বর মোক্তার বলত ওদের কথা—

অনীতা তাড়াতাড়ি বলে, গরিব-বড়লোকের কথা হচ্ছে না বাবা। খোড়ো বাড়ি তাতে কি হল ? তুমি তো আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ না এবাড়ি থেকে। দিলেও যাবো না, সাফ কথা হল, পাড়াগেঁয়ে লোক কিনা—ওরা বড্ড গোঁয়ার হয়। আর বিষম জেদি।

হিমাংশু হো-হো করে হেসে উঠলেন।

ঠিক হবে তা হলে। গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলেরই দরকার যে তোকে জব্দ রাখবে।

তারপর আবার নরম সুরে জিজ্ঞাসা করেন, কি বলিস রে ?

অনীতা ভালমন্দ জবাব দেয় না। তখন ক্রমশ কড়া হয়ে উঠলেন হিমাংশু।

আমার একটা কথা থাকে না সংসারে, কেউ একটু ভয় করে না। অথচ আমি হলাম নাকি কর্তা!

কে ভয় করে না তোমায় ?

কে করে, সেই নামটা বল দিকি। মেয়ে হয়ে তুই করিস আমায় ভয় ?

অনীতার জেরা শুরু হল, কে বলেছে, তোমায় আমি ভয় করি নে ?

হিমাংশু বলেন, বলবে আবার কে ? আমি জানি।

কিচ্ছু জানো না। যা-তা একটা বলে দিলেই হল!

এই যে হুঙ্কার দিয়ে উঠলি—এ বুঝি ভয়ের লক্ষণ ?

তুমি এক এক আজব কথা বলবে, হুঙ্কার আসে সেই জন্যে। আমি বলে দিনরাত্তির ভয়ে ভয়ে আছি—

বেশ, ভয় করিস তো যা বলি তা কানে নিস নে কেন ? বিয়ে আমি

গোবোই মিহিরের সঙ্গে। সীতার বিয়ে আঠাশে, তোরও ঐ তারিখে। কমলের মেয়ে মোটর হাঁকিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে, আর তুই শুধু একটু সন্দেশ খেয়ে বেঁচে যাবি—সে আমি হতে দিচ্ছি নে।

বলতে বলতে আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, খাসা হবে। দিল্লি-কায়রোয় পাঠাতে হবে না মেয়ে—নিজের কাছে রাখতে পারব। তোকে চোখের আড়াল করে আমিও কি বাঁচব রে বেবি? আর মিহির আমাদের সোনার টুকরো ছেলে। জীবনে খুব বড় হবে, এই আমি বলে রাখছি।

মন খুলে তবু অনীতা সায় দেয় না।

আমি বলি কি বাবা—

হিমাংশু চটে উঠলেন, বলাবলির ধার ধারি নে। কমলের সঙ্গে শুধু একবার কথা বলে দেখি, তার মতটা কি—

অনীতা বলে, পিশি 'না' বললেও কি শুনবে তুমি বাবা? তুমি হলে যখন সংসারের কর্তা। তা তোমরা যা বলবে, ঘাড় হেঁট করে তাই মেনে নিতে হবে আমায়। আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় কি যায় আসে?

বাবার এত ইচ্ছে, অনীতা এর পরে আর কি করতে পারে বলো? কিন্তু শুধু ইচ্ছেয় হবে না—এ-তরফে ইনি যেমন, ও-তরফেও আর একজন তেমনি আছেন। জঙ্গিপাড়া জায়গাটা জানা আছে, বীরেশ্বর মোক্তারকে বললে সে-ই ওখান থেকে মিহিরদের গ্রামে নিয়ে যাবে। অসুবিধা কিছু নেই।

তবু কোঁচানো চাদরখানা বাপের কাঁধের উপর দিয়ে ছাতাটা হাতে গুঁজে অনীতা বলে, কেন ছোট হয়ে যাচ্ছ সেই ধাপধাড়া জায়গায়? দরকার হলে তাঁরাই আসবেন।

মেয়ের বাপ যে আমি! ছেলেওয়ালাদের সঙ্গে সমান সমান টক্কর দিতে গেলে হবে কেন?

বেকুব হয়ে আসো যদি, ছোট হয়ে আসো? তুমি যে বড্ড ভালমানুষ! সেই ভাবনাই আমি ভাবছি কেবল।

হিমাংশু হেসে বলেন, বাপকে জানিস নে তুই বেবি। ঘরে যা দেখিস, বাইরে তেমন নয়। ভালমানুষ হলে এত মামলা জিতে আসি কেমন করে?

তোমাকেও বলি বাবা—ছেলেটা যেমন দেখছ, মা'টি তেমন নয়। বড্ড কড়া। তাই ভাবছি আমি—

কণ্ঠ ছলছলিয়ে ওঠে, যে কথাই বলুক তাতে সায় দিয়ে এসো বাবা। বোলো, রান্না করা বাসন মাজা ঘরে গোবরমাটি দেওয়া—সমস্ত কাজ করতে পারে তোমার মেয়ে। আর লজ্জাশরম খুব—সাত চড়ে রা করে না—

কৌতুককণ্ঠে হিমাংশু পুনরাবৃত্তি করেন, সাত চড়ে তোব মুখে রা নেই—তাই নাকি ?

অনীতা রাগ করে বলে, কবে রা করতে দেখলে ? বিযে-বিয়ে করে এই যে সকলে উঠে পড়ে লেগেছ, সাত চড়ের চেয়ে এটা কম হল কিসে ? আমি তাতে কি বলেছি ? উল্টে আমিই কত কায়দা বলে দিচ্ছি, বোঝা নামিয়ে তোমরা যাতে দায় খালাস হতে পাবো !

আবার স্বর বদলে বলে, হলই বা একটু মিথ্যে ! মিথ্যে তুমি বলে থাক না ? কোর্টে গিয়ে তো বকবক করে মিথ্যে বলো, আর ওঁখানে দুটো কথা এমন-অমন কবে গুছিয়ে বলা—যাতে অপমানিত হয়ে ফিরতে না হয়। না পেরে ওঠো, গিয়ে কাজ নেই তোমার। কিছুতে আমি যেতে দিচ্ছি নে—

সন্ত্রস্ত হয়ে হিমাংশু বলেন, সে কি রে ! সমস্ত ঠিকঠাক বলে আসব, দেখতে পাবি। মিথ্যে বলে বলে হাকিমদের থ বানিযে দিই—আর পাড়াগাঁয়ের সেকেলে বুড়িকে ভাঁওতা দিতে পারব না ?

অনীতা চিন্তান্বিত ভাবে বলে, বড্ড কঠিন ঠাঁই বাবা—হাকিম ভোলানোব মতো অত সোজা নয়। আমি ভাল করে তোমায় শিখিযে দিচ্ছি। বলবে, বড্ড গরিব, কন্যাদায় উদ্ধাব করুন দযা কবে—

হাসতে হাসতে হিমাংশু বসে পড়লেন সোফার উপর।

দে—আচ্ছা করে তালিম দিয়ে দে বেবি। থিয়েটারে যেমন তোরা মহলা দিস। গাড়ির দেরি আছে, এত আগে স্টেশনে গিয়ে কি হবে ?

বাপে-মেয়েয় অনেকক্ষণ করে শলাপরামর্শ চলল। বাপেব সঙ্গে অনীতাও চলল স্টেশন অবধি। গাড়ি না ছাড়া অবধি অবোধ বাপকে নানা রকম বুদ্ধি বাতলে দিচ্ছে।

হাঁসপুকুর-জঙ্গিপাড়া থেকে থমথমে মুখ নিয়ে হিমাংশু বাড়ি ফিরলেন। অনীতা এসে পড়ল। কাঁধের চাদর নামিয়ে নিয়ে আলনায় রাখে, পায়ের জুতো খুলে চটিজোড়া এগিয়ে ধরে। এরই মধ্যে একবার বলল, গোলমাল করে এসেছ, মুখ দেখে তা বুঝতে পারছি। খুব বুঝি ধাতানি খেয়ে এলে বুড়ির কাছে?

হিমাংশু বলেন, গোলমালের কিছু থাকতে দিয়েছিস নাকি? নিজেই তুই ঘটকি—আমায় পাঠালি শুধু ঘাড় নেড়ে আসবার জন্য। ঘাড় নেড়ে 'হাঁ' বলে জানান দিয়ে এলাম—আমিই কর্তা বটে! যেন 'না' বলবার উপায় ছিল আমার।

আমি? অনীতা আকাশ থেকে পড়ে। প্রফেসর ঘোষের ভয়ে আমার বলে তখন মাথা খারাপ হবার যোগাড়—একগাদা করে অঙ্ক দিচ্ছে, কষে দেবার মানুষ নেই। মাস্টারের ধান্দায় গিয়েছিলাম—কোথায় কার বিয়ে হল না হল, বয়ে গেছে আমার বাজে কথায় কান দিতে।

গোড়লি করে তুই যদি অদ্দূর এগিয়ে না রাখতিস, আমি ঠিক সরে আসতাম।

অনীতা বলে, তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি বাবা, বিয়েথাওয়ার একটা কথাও আমি বলি নি। মিছে আমায় দুষছ।

কিন্তু কি মায়ায় মাতিয়ে এসেছিলি, মিহিরের মা ভাল ভাল সম্বন্ধ নাকচ করে সেই থেকে মুকিয়ে আছেন। তাই একলা বৃন্দাবনে পড়ে থাকেন—তাঁর অসুখ শুনেও নড়ছেন না, আমি কোনদিন গিয়ে পড়ব সেই আশায়।

অনীতা বলে, এই সব শোনানো হল বুঝি—আর তুমিও অমনি গলে গেলে! অত নরম মন নিয়ে সংসারের কর্তা হওয়া যায় না, বুঝলে? স্পষ্ট করে তাদের বলে এসেছ তো—বউ করো আর যা-ই করো, কলকাতা ছেড়ে এক-পা নড়ছেন না সে কন্যে।

উল্টো চাপে হিমাংশু হকচকিয়ে যান।

অনীতা বলে, বলো নি তুমি—কিছু বলো নি বুঝতে পারছি। পাত্তোর নিয়ে যা আহা-মরি লাগিয়েছিলে—অমন ছেলে যেন দুনিয়ায় আর-একটি নেই, তাড়াতাড়ি হেস্তনেস্ত না করলে অন্য কেউ শিঙে দড়ি পরিয়ে গোয়ালে ঢোকাবে! জানি, এমনি এক কাণ্ড করে আসবে। তাই আমি যেতে দিতে চাচ্ছিলাম না।

বকুনি খেয়ে হিমাংশু বলেন, একা তো যাই নি—বীরেশ্বর সঙ্গে ছিল। দু-জনেই আমরা কথা বেচে খাই। তা পুরো একটা দিন একরাত্রি কাটিয়ে এলাম—তার মধ্যে বিয়ের সম্পর্কে কথা হল দুটো কি চারটে। উঠোনে পা দিতেই গিন্নি বাড়ির লোক পাড়ার লোক ডেকে ডেকে 'বেহাই' 'বেহাই' বলে এমন করতে লাগলেন যেন শুভকর্ম অনেকদিন চুকেবুকে গেছে, পুরানো-কুটুম্বের বাড়ি আমরা বেড়াতে গিয়েছি। একবার একটু বললেন, মেয়েকে শুধুমাত্র শাঁখা-শাড়ি দিয়ে আশীর্বাদ করবেন—আশীর্বাদটাই হল আসল। হাসিখুশির ভিতরে মা-লক্ষ্মী নিজের বাড়ি আসবে—বিয়ে দিতে গিয়ে আপনাদের একবিন্দু কষ্ট হয়, এ আমি চাই নে।

বলতে বলতে হিমাংশুর মুখে হাসি ফুটল।

আচ্ছা, আমাদের সম্বন্ধে কি ভেবে বসে আছেন বল্ তো! একেবারে নিঃস্ব—শাখা-শাড়ির উপরে উঠবার সঙ্গতি নেই? গাঁয়ের লোকে বলে, জাঁহাবাজ বুড়ি—আমাদের কিন্তু মনে হল, অত্যন্ত সরল মানুষ।

অনীতা ফোঁস করে ওঠে, এত প্যাঁচের কথা—বাপরে বাপ—আর সরল বলছ তাঁকে?

হিমাংশু চুপ করে যান! অনীতা বলে, এমন সোজা মানুষ তুমি, উকিল হতে গেলে কেন? মা-লক্ষ্মী নিজের বাড়ি আসবে—ওর মধ্যে কায়দা করে বলে দেওয়া হল কিনা, তাদের বাড়ি গিয়ে উঠতে হবে তোমার মেয়ের—কলকাতায় থাকা চলবে না।

মুখ অন্ধকার করে হিমাংশু বলেন, তবে বলি। বাড়িও যা দেখে এলাম—বাঁশঝাড় আর আম-জাম-নারকেল-সুপারির বাগিচা। বুঝতেই পারা যায় না, ঘরদুয়োর আছে তার ভিতরে, মানুষজন থাকে। বাঁশ-বাখারির দোচালা ঘর—খড়ের ছাউনি, ছ্যাঁচা-বাঁশের বেড়া।

অনীতা হাততালি দিয়ে উঠে, খোড়োঘর তো! আ-হা-হা, থাকতে বড় মজা! পাকাবাড়িগুলোয় আগুন ছোটে গরমকালে, খোড়োঘরে ঢুকলে মনে হবে বরফের দেশে গেলাম। তাই দেখ না—সাহেবেরা সেকালে কত খরচখরচা করে বাংলো বানাতো, চাল কিন্তু খড়ের।

হিমাংশু বলেন, তা খুব মজা করে খোড়ো-বাংলোয় থাকবি, চান করতে পায়ে পায়ে চলে যাবি মাইল খানেক দূরের ঠাকুরদীঘিতে, কাঁখে করে সেখান থেকে জল আনবি কলসি ভরে—

অনীতা লুফে নিয়ে বলে, এক কলসি জলের কত আর ওজন! আধ মন বড জোর। তোমাব এই দস্যি মেয়ে আধ মন জিনিস নাচতে নাচতে নিয়ে আসতে পারে, জানো?

হিমাংশু বলছেন, বাডিতে মানুষ কিলবিল করছে—আমি আর বীবেশ্বব গুণে ঠিক কবতে পাবলাম না। যতবাব গুণি, আলাদা এক একরকম হয়ে যায়। যত কুপুষ্যির দল। স্ফূর্তিতে খাওয়াদাওয়া করছে, নির্ভাবনায় আছে। তোর শাশুডির মতলব হল, বিয়েটা দিতে পাবলে বউকে ঐ ঘানিতে জুড়ে দিয়ে বৃন্দাবন পালাবেন। তার মানে বুঝতে পারছিস—ভোর না হতেই উঠোনে গোবরজল ছিটিয়ে সংসারধর্মে লেগে যাও, সারা কবো আড়াই পহর রাত্রে চৌকিদারে হাঁক শুনে রান্নাঘরে শিকল তুলে গোয়ালেব সাঁজালে আবাব একদফা ঘুঁটে দিয়ে গোলাব চাবিগুলো নেড়েচেড়ে টেনেটুনে দেখে। হররোজ এই কবে যাচ্ছেন তোব শাশুডি—চোখে দেখে এলাম।

ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন, শুনতে এ সমস্ত নিতান্ত মন্দ লাগে না, চেঞ্জে যাওযাব মতন আমতলা-জামতলা ছুটোছুটি করাও চলে দুটো-পাঁচটা দিন। কিন্তু বারোমাস তিরিশ দিন এই বোঝা টানতে হলে তুই ছেলেমানুষ মুখ থুবডে পডবি। যত ভাবছি, ততই বসে পডছি। অথচ এমন ব্যাপার—গিন্নিকে মুখফুটে কিছু বলা গেল না, হাঁ-হা কবে সায় দিয়ে চলে এসেছি। মিছিবকে ডেকে আমি সব বুঝিয়ে বলব—

অনীতা প্রবল ভাবে ঘাড নাড়ে, কিছু না, কিছু না। কে যাচ্ছে সেখানে ভূতের বেগার খাটতে? তুমিও যেমন! ভারি কিনা সব লাটসাহেব, আগে থেকে তাই সর্ত করে নিতে হবে! কাউকে কিছু বলতে হবে না তোমার বাবা, দরকার নেই।

কমলবাসিনী এসে পড়লেন। উল্লাসিনী অনীতা বলে ওঠে, শুনেছ পিশিমা, মস্তবড় দীঘি তাদের বাড়ি—দেদার সাঁতার কাটা যাবে।—দিনরাত্তির মজা। ঠিক যে জিনিসটা আমি চাই। এ-বাড়ি মানুষ কম বলেই তো বাইরের মেয়েদের কাছে যেতে হয়। সেখানে ঘরে বসেই হুল্লোড়!

কমলবাসিনী জিজ্ঞাসা করেন, হয়ে গেল ঠিকঠাক? দাদার মুখ দেখেই ধরেছি। এই তো সংসারের গতিক—খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে শেষটা পরের ঘরে তুলে দেওয়া!

দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন, ব্যথাটা নিজের মেয়ের সম্পর্কেও।

হিমাংশু বলেন, ওরাও শিগগির এসে আশীর্বাদ করে যাবে! দুই বিয়ে এক দিনে—দু-বার হাঙ্গামা করতে যাবো না।

অনীতা ঘাড় দুলিয়ে বলে, কক্ষণো না। কনে সাজিয়ে আমায় চুপচাপ বসিয়ে রাখবে—দিদির বিয়ের আমোদ করব না বুঝি? আচ্ছা বেশ, আগ-পাছ করে হোক তবে! বড় বোনের বিয়ে সন্ধ্যেরাতে, ছোট বোনের পরে। বড়র বিয়ে আগে হবার নিয়ম।

আশীর্বাদ করতে মিহিরের জেঠতুত ভাই কানাই এসেছে হাঁসপুকুর থেকে। মুরুব্বি বিবেচনায় শ্বশুর হীরালালকে সঙ্গে এনেছে। রাস্তা ও নম্বর মিলিয়ে রিক্সা এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। এই নাকি? উঁহু, খুড়িমা বলেছিলেন, অবস্থা সুবিধের নয়—এমন বাড়ি তবে কি করে হয়?

মোড়ের পান-সিগারেটের দোকানে গিয়ে কানাই জিজ্ঞাসা করে, হিমাংশু রায় বলে কেউ থাকেন কিনা এই রাস্তায়। সে লোকটাও ঐ বাড়ি দেখিয়ে দিল। এগিয়ে দেখুনগে, ফটকে নাম লেখা আছে।

হিমাংশু রায় এম. এ. বি. এল.—এডভোকেট। নাম পড়ে হীরালাল অবাক হয়ে যান। কোল-কনসারনের কাজে আদালত-পাড়ায় ঘোরাঘুরি করতে হয়—এডভোকেট রায়ের নাম অতএব উত্তমরূপে জানা। দূর থেকে তাঁকে দেখেছেনও কয়েকবার।

বাড়ি ঢুকে বারাণ্ডায় উঠতে গিয়েও ইতস্তত করছেন। উপর থেকে দেখতে পেয়ে হিমাংশু তাড়াতাড়ি নেমে এলেন।

আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়—

কানাইকে হাঁসপুকুরে দেখে এসেছেন, তাকে চেনেন। হাত ধরে বললেন, এসো বাবা—

কানাই পায়ের ধুলো নিল। হীরালাল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন—হুঁ, মানুষ সে-ই। বাঘের মতো একদিন সওয়াল করছিলেন জজের সামনে। হীরালাল বড্ড ব্যস্ত ছিলেন, তা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকটা শুনে যেতে হল। সেই বাঘ আজকে কেঁচো। বিনয়ে কাঁচু-মাচু হয়ে যুক্তকরে তিনি আহ্বান করছেন হীরালাল-কানাইর মতো মানুষদের। কন্যাদায় এমনি বস্তু!

পাত্রপক্ষীয় হীরালাল অতএব যথোচিত গাম্ভীর্য সহকারে বললেন, আপনার সঙ্গে চেনাশোনা নেই রায় মশায়। আমি মিহিরদের বিশেষ আত্মীয়—এই কানাইর সঙ্গে আমার মেজমেয়ের বিয়ে হয়েছে। কলকাতায় এসে মিহির বাবাজি আমার কাছেই এসে ওঠে—

আর বলতে হল না, উচ্চহাসির তোড়ে কথা ভাসিয়ে হিমাংশু তাঁর হাত জড়িয়ে ধরলেন।

আমারও আত্মীয় তবে তো! কিন্তু মাত্তোর দু-জন আপনারা—আর কেউ এলেন না?

হীরালাল বলেন, রবিবারের বাজার—মেসের অনেকেই ঝুঁকেছিল। তা আমার বেহান-ঠাকরুন পই-পই করে বললেন, শুধু কানাই আর আমি—দু-জনের বেশি নয়—

গোলঘরের সোফার উপরে গদিয়ান হয়ে বসে হীরালাল বলতে লাগলেন, বড্ড গরিব কিনা আপনি! দুয়ের বেশি তিন এসে হাজির হলে যদি অসুবিধায় পড়ে যান!

কানাই বলল, মামার অসুখ বেড়েছে—জরুরি টেলিগ্রাম পেয়ে খুড়িমা বৃন্দাবন রওনা হয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গেই আমি কলকাতায় এসেছি। আমাদের সমস্ত বলে কয়ে তুফান-এক্সপ্রেসে তিনি চলে গেছেন।

হিমাংশু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, কোন নাগাদ ফিরবেন, তা-ও তো এখন বলা যাচ্ছে না। মুশকিল হল তবে তো!

কানাই তাড়াতাড়ি বলে, আজ্ঞে না—মুশকিল কিছু নয়। সেই কথাটা

বিশেষ করে বলে গেলেন আমাদের। খুড়িমা ফিরুন চাই না ফিরুন—বিয়ে আঠাশেই হবে। এর পরে তিন মাস আর দিন নেই।

হীরালাল বলেন, বুঝতে পারলেন না—ওঁর কথায় নির্ভর করে আপনি ইতিমধ্যে হয়তো খরচপত্তোর করে বসেছেন। দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষতি-লোকসান হবে—সে কেমন কথা! ছেলের বিয়ে তাতে না-ই দেখা হল! দশটা-পাঁচটা নয়, ঐ এক ছেলে—বুঝুন। বেহান আমাদের ভাবি শক্ত—পুরুষ মানুষ হার খেয়ে যায়।

হাসতে লাগলেন তিনি। বলেন, তখন বুঝতে পারি নি, কোন হিমাংশু রায় আপনি! আচ্ছা, এমন উদ্ভট রটনা কেমন করে হয়—বেহানের কানে কে তুলে দিয়েছে যে আপনি গরিব?

হিমাংশু হাত কচলে বলেন, গরিবই তো! দশজন নিয়ে কাজ-কারবার—বাইরে একটু ঠাটবাট রাখতে হয়। আসলে কিছু নয়।

হীরালাল বলেন, চাকরির দায়ে আমি মশায় সর্বঘটে ঘুরে বেড়াই। কে কোন দরের মানুষ—আমায় বলে দিতে হবে না।

কুটুম্ববাড়ির একটা দামি সিগারেট তুলে নিয়ে তর্জনী ও বুড়ো-আঙুলের গোড়ায় পেঁচিয়ে ধরে হুঁকো-টানার কায়দায় টানতে টানতে বললেন, শুনুন মশায়, চড়কবাড়ির ঘোষেদের এক মেয়ের সঙ্গে আমি সম্বন্ধ করেছিলাম। বড়লোকের মেয়ে, সেই দোষে তা বাতিল হয়ে গেল। বেয়ান নিজে দেখে-শুনে এবারে অতি গরিবের মেয়ে নিচ্ছেন। উঃ, কি কাণ্ড? এ গরিব মানুষটি তো গোটা চড়কবাড়ি হপ্তায় হপ্তায় নিলেমে কিনে আবার বেচে দিতে পারেন।

হিমাংশু হেসে বল্লেন, নিন—এই সমস্ত বলাবলি করুন আপনারা। বেয়ানের কানে গেলে মনে করে বসবেন, সত্যিই বা! এ সম্বন্ধও আবার বাতিল হয়ে যাবে।

কানাই ঘাড় নেড়ে বলে, সে কিছুতে হবার জো নেই। খুড়িমা একবার যা বুঝে ফেলবেন, দুনিয়াসুদ্ধ মাথা খুঁড়ে মরলেও তার অন্যথা হবে না। ঐ যে জেনেছেন, গরিব আপনি—এখন ঘরবাড়ি, ব্যাঙ্কের পাশবই, দাখিলদস্তাবেজ চোখের উপর মেলে ধরলেও আপনি আর বড়লোক হতে পারবেন না।

অনীতা লজ্জাজড়িত পায়ে ধীরে ধীরে এসে প্রণাম করল। তার দিকে চেয়ে হীরালালের চক্ষে পলক পড়ে না।

যাকে দেখেছি যেন এর আগে—

সন্ত্রস্ত হিমাংশু বলেন, কোথায় ?

হিমাংশুর পুরানো মুহুরি সদানন্দ এসে বসেছেন। তিনি বললেন, ভুল হচ্ছে আপনার মশায়। সে অন্য কেউ হবে। ফটকের বাইরে যাবে, ততখানি তাগত ধরে না এ বাড়ির মেয়ে!

হীরালাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে বললেন, আমরা সেকেলে মানুষ—একেলে চালচলনের কতটুকু খবর রাখি মুহুরি মশায় ? এরাও জানান দিয়ে তো কিছু করে না! কি গো মা-লক্ষ্মী, মনে পড়ছে না—মস্ত এক মোটর নিয়ে সেই আমাদের মেসে গিয়েছিলে ? মিহির কোথায় থাকে, জিজ্ঞাসা করলে। সেটা ফটকের বাইরে হল কিনা বলে দাও এঁদের—

সদানন্দ আবার কি বলতে যান। তাঁকে থামিয়ে হিমাংশু বলে উঠলেন, মিহির পড়াত কিনা! চেঞ্জ থেকে ফিরে এসে পড়ার বড্ড চাপ পড়ল। তখন মাস্টারের জন্য ছুটোছুটি—

তাই বলুন যে পুরানো সম্বন্ধ। চড়কবাড়ি তবে আর আমল পাবে কেন ?

অনীতার দিকে চেয়ে হীরালাল মুচকি-মুচকি হাসছেন।

আরও এক জায়গায় দেখেছি তোমায় মা। তুমি টের পাও নি—অত লোকের মধ্যে আলাদা করে আমায় দেখবে কি করে ? মিহিরের ওখানে গিয়ে দেখি, একটা কার্ড পড়ে আছে। সে যাবে না তো আমি সেটা নিয়ে গিয়েছিলাম তোমাদের থিয়েটারে—

হিমাংশুকে বলেন, মা-জননী রাজকন্যা সেজেছিলেন। আহা-হা, কী অ্যাক্টো—কী সাজপোশাক! মন কেড়ে নেয় একেবারে। আপনার বোধহয় এ সমস্ত দেখবার সময় হয় না রায় মশায়। কিন্তু কি বলব—পেশাদার বায়স্কোপ-থিয়েটারের মাথায় জুতো মেরে বেরিয়ে গেলেন।

সদানন্দ বলেন, সে-ও ঐ একই হল মশায়—কলেজের ব্যাপার। কলেজে আজকাল শুধু বই পড়া নয়, নানান রকম শেখায়। না পারলে ফেল। তাই প্রাকটিশ রাখতে হয়।

আশীর্বাদ ঢুকিয়ে রাস্তায় এসে হীরালাল বোমার মতো ফেটে পড়লেন।

তাই বলো, আগে থেকেই যোগসাজস! মচ্ছব ভেঙে মিহির গা-ঢাকা দিয়েছে তো তামাম শহর জুড়ে খোঁজ-খোঁজ পড়ে গেছে। বেহান ঠাকরুন বলে দিলেই পারতেন, তা হলে আর সম্বন্ধ করতে যেতাম না—

কানাই শ্বশুরকে সামলে দেয়, আপনি এ নিয়ে কিছু বলতে যাবেন না। তাতে দোষ পড়বে।

হীরালাল গজর-গজর করছেন, মনিবের কাছে আমার মুখ থাকল না। অনেকদিন ধরে বিস্তর জপিয়েছিলাম, তবেই না মেজবাবু অত ঝুঁকে পড়লেন। মেয়ে ওস্তাদি গান শিখেছে—তাতেই বলা হল কিনা, রান্নাঘরে ভাত চাপিয়ে দিয়ে বউ তান ধরবে—ভাত পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে। এবার যে সাপ নিয়ে ফুলছেন, নেচেকুঁদে সে হাজার লোকের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেয়—কোমরে দড়ি বেঁধে গুষ্টিশুদ্ধ ঝুলোঝুলি করে তাকে রান্নাঘরেই ঢোকানো যাবে না!

কানাই বলে, যাকগে—যাকগে। যাঁদের পাঁঠা, তাঁরা ল্যাজে কাটুনগে—পরে বুঝবেন। আমাদের কি? আপনি বললে কথা উঠবে—সম্বন্ধ গাঁথে নি, সেই আক্রোশে এসব করছেন।

আমি না-ই বললাম, তুমি লিখে জানিয়ে দাও।

কানাই শিউরে ওঠে, খুড়িমা পাকাপাকি করে গেছেন—কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, তাঁর উপরে কিছু বলতে যাবে। খামোকা চটিয়ে দেওয়া। আর বুঝতে পারছেন—কাজকর্ম কিছু করি নে, ঠিক আপন খুড়িও নন তিনি। সগোষ্ঠি ওঁদের উপরে খাচ্ছিদাচ্ছি, দিব্যি চলে যাচ্ছে। খুড়িমাকে, খবরদার, ঘাঁটাতে যাবেন না—কি দরকার আমাদের?

হীরালাল আর কিছু বললেন না, সমস্ত পথ গম্ভীর হয়ে রইলেন।

অনীতা চলল শ্বশুরবাড়ি।

হাজামের পথ। জলপাড়া অবধি ট্রেন। হাঁসপুকুর আরও তিনক্রোশ সেখান থেকে; পালকিতে যেতে হবে। সীতার কেমন দেখ না—মোটরে উঠে হুশ করে লেকরোডে গিয়ে নামল। সেখান থেকে অবনী দিল্লি নিয়ে যাবেন—হয়তো বা প্লেনে। ঘণ্টা পাঁচ-ছয় লাগবে।

আর এদের যাওয়া চলছে তো চলছেই।

হুমহাম করে তিন পালকি যাচ্ছে—সকলের আগে পুরুতঠাকুর, অন্য দুটোয় বর আর বউ। বরযাত্রীরা হেঁটে চলেছে। হীরালালও আছেন। ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বৃন্দাবন যাবার মুখে অন্নপূর্ণা বিশেষ করে বলে গেছেন, আমি হয়তো থাকতে পারব না বেহাই। ওরা সব ছেলেমানুষ—আপনি উপস্থিত থেকে সব করাবেন, আপনার উপরে ভার। মেয়ে-জামাইর মুখ চেয়ে অতএব কিল খেয়ে চুরি করতে হল। তা ছাড়া পরের রাহাখরচে মেয়েটাকে দেখে আসা যাবে, এবং বউভাত ও আনুষঙ্গিক খাওয়াদাওয়াগুলোও উত্তম হবে আশা করা যাচ্ছে। ইত্যাদি বিবেচনার পর পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে চলেছেন।

অনীতার কি বিপদ! পালকির খোপে গুটিসুটি হয়ে আছে; ছড়িয়ে বসবার জায়গা নেই। সেই যে একদিন মিহির বৃত্তের সঙ্গে তার তুলনা দিয়েছিল, হুবহু তাই হয়েছে। পালকির দরজা ইঞ্চিখানেক ফাঁক করে দিয়েছে, সেখান দিয়ে বাইরের যেটুকু দেখা যায়। বেশি ফাঁক করবার জো নেই—আগে-পিছে হীরালাল সহ বরযাত্রীর দল। আশ-পাশের গাঁয়ের মানুষও আছে। নতুন বউ কি রকম বেহায়া গো, ড্যাবড্যাব করে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে, দেখ। এটা না বলতে পারে!

নদী পার হবে এবার। পালকি খেয়ার উপর তুলল। পুরুত ঠাকুর আর মিহির খোপ থেকে বেরিয়ে হেঁটে গিয়ে নৌকোয় উঠল, তাদের পালকি খালি। অনীতার বেলা চলবে না। নতুন বউ পায়ে হাঁটবে, এত লোকের

মাঝখানে নৌকোর পাটায় বসবে—কি সর্বনাশ! খেয়ার উপরেও পালকিবন্ধ হয়ে আছে সে। মাঝনদীতে হাওয়া উঠল, জলে ঢেউ দিয়েছে। খেয়ানৌকো টলমল করছে—জল উঠে যায় বুঝি! সত্যি যদি তাই ঘটে—নৌকো আরও কাত হয়ে কলকল করে জল ওঠে, পালকি সমেত নতুন বউ ছিটকে পড়ে নদীর মধ্যে? খাঁচার ইঁদুরের মতো তবে তো ছটফট করে দম আটকে মরা পাতালের নিচে!

তাই হতে দিলাম আর কি! তেমন-তেমন বুঝলে নতুন বউ নিজমূর্তি ধরবে—চুড়ি-ভরা দুটো হাতের ধাক্কায় চড়বড় করে খুলে দেবে পালকির দরজা অথবা আলকাতরা-মাখানো পলকা ছাতটাই ভেঙে ফেলবে সিঁথিমৌর-পরা মাথার চাড় দিয়ে। বাইরে এসে চতুর্দিক একনজর দেখে নিয়ে ঝপ্‌পাস করে পড়বে জলে। হাঁসের মতন সাঁতার কাটতে পারি—জানো? জলের নিচে ডুব-সাঁতার কাটতে পারি—জানো? জলের নিচে ডুব-সাঁতার কেটে চলে যাবো—তা হলে তো বেহায়াপনার কথা ওঠে না—ওদের নজর থেকে অনেকখানি দূরে চলে গিয়ে ভুস করে ভেসে উঠব।

মিহির জানে তো সাঁতার? না জানে তো···ভয় কিসের? তাকেও সঙ্গে নিয়ে ভাসব। দেখ দেখ, নতুন বউ ছোঁ মেরে বরকে পিঠে তুলে নিয়েছে। বেশ করেছে—বলোগে তোমরা, বয়ে গেল! সাঁতারের জন্য আমায় যে বকাবকি করতে মাস্টারমশায়—শিখে রেখেছিলাম, তাই কত কাজে লেগে গেল!

কিন্তু হল না কিছুই। অনীতা মুসড়ে গেল—খেয়া নির্বিঘ্নে ওপারের ঘাটে লাগল। হাঁসপুকুর—কত দূর আর বাবা! নদীর উপরে পালকির দরজার ফাঁক চুপিসারে খানিকটা বাড়িয়ে নিয়েছিল—ডাঙায় উঠে আবার এঁটে দেয়। চলেছে আট বেহারার কাঁধে চেপে। পথ বিষম উঁচুনিচু—পালকি এই যেন আকাশে ওঠে, এই নামে পাতালে। দোলন এক সময় বড় বেশি লাগছে। তখন অনীতা দুটো হাত দু-দিকে বাড়িয়ে পালকির তক্তা চেপে টাল সামলায়। আঁকড়ে ধরবার কিছু নেই ভিতরে।

খুব হাঁক পাড়ছে এবার বেহারারা। শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি এসেছে তবে? তাই তো—পালকি ভুঁয়ে নামাল। মস্ত বড় দীঘি সামনে—চারি

পাশ দিকে-কলমির দামে আঁটা, মাঝখানে জল টলটল করছে। পাড়ে দেখা যায়, জীর্ণ পাঁচিলে-ঘেরা কাঁটাবনে আচ্ছন্ন খানিকটা জায়গা।

আঁটোসাঁটো গড়ন মাঝারি বয়সের এক বিধবা পালকির দরজা খুলে বলে, নামো বউদি—

সর্বনাশ, ঐ নাকি মিহিরদের বাড়ি? না গো—এটা ভিন্ন জায়গা, মিহিরের কথায় টের পাওয়া গেল।

এদ্দুর চলে এসেছ বিরাজ, বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত সবুর সইল না?

তাই বটে দাদাবাবু! তুমি বউ আনছ—হা-পিত্যেশ উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকি কেমন করে?

বলতে বলতে বিরজা ঘোমটা তুলে অনীতার মুখ দেখে। খাসা বউ, চাঁদপানা মুখ—কেমন লজ্জাশরম! শহুরে মেয়ে কে বলবে!

অনতিদূরে হীরালাল মুচকি হেসে সহযাত্রী একজনকে ফিসফিসিয়ে বলছেন, বলি নি, বউ খুব ভাল থিয়েটার করে? রাজকন্যা সেজেছিলেন—তা কে বলবে রাজবাড়ির বাইরে চন্দ্র-স্যিয়ির মুখ দেখেছেন কখনো! আবার ঐ দেখ—লজ্জাবতীর পার্ট করে যাচ্ছেন, তা-বড় তা-বড় গুণীরাও খুঁত ধরতে পারবে না। আগে জানি নে যে—তা হলে বেহান সেদিন কলকাতায় ছিলেন, থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে তাঁকেও গুণপনা দেখিয়ে দিতাম।

বিরজা পরম যত্নে অনীতাকে ধরে পাঁচিলের ভিতর নিয়ে গেল। একবার কানে কানে বলল, বড় বড় করে তাকিও না বউদিদি—নিন্দে হবে। সেকালের বউরা মুখ দেখানোর সময় চোখ বুজে থাকত।

জায়গাটা ঠাকুরবাড়ি। রাধাগোবিন্দজিউ পাড়ার বাইরে নিরিবিলি এখানে বসতি করছেন শ-খানেক বছর ধরে। মিহিরেরই এক পূর্বপুরুষ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। রাধাগোবিন্দর সামনে জোড়ে প্রণাম করতে হয়। হাঁসপুকুরে যত বউ এসেছে, সকলে এমনিধারা প্রণাম করে ঠাকুরের চরণামৃত মাথায় মুখে ঠেকিয়ে বাড়ি ঢুকেছে। গ্রামের মেয়েরাও শ্বশুরঘর করতে গেছে চোখের জলে ঠাকুর-দালানের চৌকাঠ ভিজিয়ে দিয়ে।

দীঘির সান-বাঁধানো ঘাটে বাজানদারেরা বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। ছ-টা ঢোল, দুটো কাঁসি, দুই শানাই এইবারে খাড়া হয়ে তারা এক সঙ্গে বাজিয়ে

উঠল। ঢোলের আওয়াজে অনীতার বুকের মধ্যে গুরগুর করে ওঠে, ঘোমটার ভিতর চারিদিকে অসহায়ের মতো তাকায়। চেনা মানুষ নেই ঐ মিহির ছাড়া। লোকজনের সামনে সে তো এখন মরে গেলেও বউয়ের সঙ্গে কথা বলবে না। আর ঐ হীরালাল—জায়ের বাপ যখন, তারা পিতৃতুল্য। এগিয়ে এসে দুটো-চারটে সান্ত্বনার কথা বললেন—তা তিনি ভ্রূক্ষেপ না করে হনহন করে এগিয়ে চললেন। একেবারে অচেনা ঐ বিরজাই তো ভালো সকলের চেয়ে!

বাড়ি বেশি দূরে নয়। এই দীঘির কথাই হিমাংশু বলেছিলেন—হামেশাই এখানে স্নান করতে জল নিতে আসতে হবে। আজকের দিনে তা বলে পথটুকু হেঁটে যাওয়া চলবে না। আবার উঠে পড়ো বউ পালকিতে। বেহারারা ডাক ধরেছে। অবশেষে যাত্রা-শেষ—পালকি চণ্ডীমণ্ডপের পাশে বোধনতলায় নামাল।

গোবরমাটি-লেপা তকতকে উঠান আলপনায় ভরে দিয়েছে। ঠিক মাঝখানে পাথরের থালায় আলতা-দুধে গোলা—নতুন বউ লক্ষ্মীর কৌটো আর মাছের ছাজা হাতে নিয়ে তার উপর দাঁড়াল। ডাইনে মিহির চিত্র-করা পিঁড়ির উপরে। এর কড়ে আঙুল ওর কড়ে-আঙুল জড়িয়ে আছে। শাঁখ বাজছে, উলু দিচ্ছে, ঢোল-কাঁশি থামিয়ে শুধু শানাই সুর ধরেছে এবার।

নিস্তারিণী বুড়ি সম্পর্কে মিহিরের দিদিমা। অন্নপূর্ণা যাবার সময় তাঁকেও বলে গেছেন। খোনা গলায় খুব চেঁচাচ্ছেন তিনি।

সূয্যি না ডুবতে বউ ঘরে তোল গো, কালরাত্তির পড়ে যাবে। ওলো ছুতি, বরণ শেষ কর্ এবারে, বিস্তর হয়েছে। রঙ্গরস থাক্—রীতকর্ম সেরে যতুক খেলে মিহিরকে সরিয়ে দিয়ে যত খুশি তারপরে করিস—

ঘরে ঢুকবার দরজার পাশে তিনখানা ইট দিয়ে উনুন মতো হয়েছে—তার উপরে হাঁড়িতে করে দুধ চাপানো। সেদিকে নজর পড়ে নিস্তারিণী হাঁক দিয়ে উঠলেন, উনুন নিভে রয়েছে—হায় হায় হায়, চারিদিক নৈরেকার সেই একটা লোক বিনে!

বিরজা ছুটে এসে বসল—তার উপরে দুধ জ্বাল দেবার ভার। ঠিক যে-সময়টা বউ দাওয়ায় উঠবে, হাঁড়ির দুধ উথলে উঠে পড়ে যাওয়া চাই। বউয়ের আসার সঙ্গে সঙ্গে ধনসম্পদ উথলে পড়ছে, এই হল ভাব।

নিস্তারিণীর বয়স আশি পেরিয়েছে। মাথা ঘাড়ের উপরে স্থির থাকে না, অবিরত কাঁপে। বেশিক্ষণ দাঁড়াবার শক্তি নেই—বউঝিদের ভিড়ের মধ্যে উঠানের উপর তিনি বসে পড়লেন। কোটরের মণি ছুটো বিঘূর্ণিত করে সেইখান থেকে নজর রাখছেন, অন্নপূর্ণা নেই দেখে হাল আমলের নাস্তিকগুলো আচার-নিয়মে ফাঁকিজুকি না দেয়! হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, ওটা কি হচ্ছে রে? নতুন বউকে হাঁটিয়ে নেয় নাকি? কোলে তোল্, কোলে.—

কানাইর বউ পারুল হেসে উঠল।

আপনাদের আমলে এক এক ফোঁটা বউ আসত দিদিমা, সকলে কোলে করে নাচাত। এ বউ কোলে তুলবে, তেমন পালোয়ান কোথা?

মিহিরের দিকে চেয়ে হেসে বলে, ঠাকুরপো, দেখ তো ভাই চেষ্টা-চরিত্তির করে। মেয়েছেলে কারো অত ক্ষমতা হবে না।

পথের কষ্ট—তার উপর এই অপরূপ অভ্যর্থনায় অনীতা নেতীয়ে পড়েছে। ঐ মানুষটি নির্বাক উদাসীন বরপাত্তোর হয়েই থাকবে, তার হয়ে একটা কথাও বলবে না কারো সঙ্গে? চোখে জল আসবার মতো। রক্ষা এই, লম্বা ঘোমটায় ঢাকা মুখ—ঘোমটা না তুলে কেউ মুখ দেখতে পাচ্ছে না।

পা ফেলতে বুঝি বা মূর্ছা যায়, উঠানের উপর টলে পড়ে! তা বলে রেহাই নেই। চণ্ডীমণ্ডপের দিক থেকে হাঁক আসে, ঘুরিয়ে নিয়ে যাও গো এদিক দিয়ে। পাড়ার এঁরা সব বউ দেখতে বসে আছেন।

ইটের উনুনে বিরজা কিছু নারিকেল-পাতা ঠেসে দিয়ে একগাল হেসে বলল, তা দেখবেন বই কি সকলে—চাঁদপানা বউ, নয়ন ভরে দেখবার মতন। দেখিয়ে এসো, দেখিয়ে এসো—

আহা, মেয়েটার কথা বড় মিষ্টি গো। ঝি-চাকরানী হবে—এদের আপন কেউ নয়। এত ভালো সেই জন্যে।

হীরালাল সেই চণ্ডীমণ্ডপের দলের মধ্যে। ঘোমটার ভিতরে অনীতা দেখে, হেসে হেসে তিনি কি যেন শিখিয়ে দিচ্ছেন একজনকে।

বউয়ের মুখ যেন বেশি ফর্শা—হাত-পা'র চেয়ে?

অনীতা জ্বলে ওঠে। ইচ্ছে করে, একটানে ঘোমটা সরিয়ে ফেলে অসভ্য লোকগুলোকে ছু-চার কথা শুনিয়ে দেয়। মুখের রং মেকি কি সাচ্চা—দেখে

নাও তোমরা আঙুল ঘসে ঘসে পরখ করে। ওটুকু আর বাকি থাকে কেন? সকালবেলা বেরিয়েছি, আর এই সন্ধ্যে—পথের মাঝে কোনখানে অবসর দিয়েছ যে রং মেখে ফর্সা হয়ে যাবো? এ কোন রাজ্যে এসে পড়ল? কলকাতা থেকে একশ' মাইলের ভিতর—কিন্তু একালের এক রশ্মি আলো পৌঁছয় নি, একশ' বছর এরা পিছনে পড়ে রয়েছে।

চুপ, চুপ···নতুন বউ অনীতা, কিচ্ছু যেন তোমার কানে যাচ্ছে না। বাইরের মানুষ এরা বেশির ভাগ—বউভাত অবধি থেকে, ঠেসে নেমন্তন্ন খেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে বিদায় হয়ে যাবে। তখন আর এসব শুনতে হবে না। সেকালের বিয়েয় বরযাত্রী-কন্যাযাত্রীদের মধ্যে লাঠালাঠি হত—তারই অবশেষ একটু। শ্বশুরবাড়ির লোকে নতুন বউকে শত্রুস্থানীয় মনে করে। কন্যাপক্ষ বরকে যেমন করে থাকে বিয়ের সময়টা। শুধু কয়েকটা দিন মাত্র। তারপরে —একটু পুরানো হয়ে ওঠো না! বউয়ের প্রতাপেই তখন বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাবে।

এত মানুষ—কিন্তু সেই একজন থাকলে সমস্ত বুঝি অন্যরকম হয়ে যেত! 'আমার ঘরের লক্ষ্মী হবে তুমি মা?' তাই তো এলাম আমি কত সাধ করে— আজকে তোমার সংসারে সেই লক্ষ্মীর কত খোয়ার দেখে যাও। আসছি আমি, তাই বুঝি আগেভাগে ঘরবাড়ি ছেড়ে বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর রাজ্যে গিয়ে উঠেছ! যেমন আঠারো দিনের মেয়ের ছোট্ট ছোট্ট হাত-পা নাড়া দেখতে দেখতে নিজের মা আচমকা ধরিত্রী ছেড়েছিলেন। সেই মেয়ে বড় হয়ে কত হাসছে, কত কাঁদছে—কোনদিন আর তিনি দেখতে এলেন না।

বউ দেখানোর পাট চুকিয়ে ঘরে উঠবে—চালের বাতা ধরে কানাইর মা দাঁড়িয়ে আছেন। মিহিরের চিবুক ডান হাতে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করেন, বাবা তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

একবাড়িতে থাকেন—কানা নন, কালা—নন—এতবড় কাণ্ডের কিছুই যেন জানেন না তিনি! এটাও বিধি—বউ ঘরে তোলবার সময় ছেলের মা এইসব জিজ্ঞাসা করেন। অন্নপূর্ণা নেই, তাঁর জায়গায় এই জেঠাইমাকে এনে দাঁড় করিয়েছে।

এ কাকে নিয়ে এলে তুমি?

তোমার দাসী—

কৌতুকের ছোঁয়ায় অনীতার মন একটু তাজা হয়ে উঠে। ঘোমটার ভিতর দিয়ে ঘাড় কাত করে দেখে নেয় এই নতুন মনিব ঠাকরুনটিকে। চটের মতন মোটা থানকাপড পরা—কাপড় যদি ওজনে আধসের হয়, কাপড়ে যে ধুলো জড়িয়ে আছে তার ওজন নির্ঘাৎ সের পুরে যাবে।

আরও আছে। কানাইর ছোট ভাই বলু দু-হাতে দরজায় চৌকাঠ ধরে পথ আটকে আছে। বছর পাঁচেকের ছেলে। দিগম্বর—কোমরে কালো ঘুনসির সঙ্গে ছেঁদা-করা পয়সা আর কড়ি ঝোলানো—মন্দগ্রহের দোষদৃষ্টি যাতে না ঘটে। আধো-আধো কথা। দু-হাত দু-দিকে বিস্তার করে বলু বলে, আমার বিয়ের কি করে গেলে সেইটে বলো—তবে ঘরে যেতে দেবো।

এর জবাবে ঠাস করে এক চড় কসিযে দেওযা উচিত ডেপো ছোঁড়ার গণ্ডদেশে। কিন্তু রাগ না কবে মিহির হাসছে। এত সদাশযতা আগে দেখা যায় নি তো, যখন অনীতার মাস্টারমশায় হযে ছিলে। কিন্তু নিজেব ইচ্ছাক্রমে কিছু বলার জো নেই—ছোট ভাইযের এই প্রশ্ন এবং বড় ভাইয়েব জবাব একেবারে বাঁধাধরা। বিয়েরই মন্ত্র বলা চলে।

মিহিব জবাব দিল, তোব বিযেব কড়ি আলাদা কবে রাখব বে বলু। দবজা ছাড়়।

হল তাই—যতুক খেলতে বসে সর্বাগ্রে পাঁচকড়া কড়ি পৃথক রাখতে হল শিশু বলুর বিয়ের বাবদে।

রাত অনেক। গোটা কবেক মেযে-বউ তখনো ঘিরে আছে, উঠবার লক্ষণ নেট। এবা এই বাড়িরই—আত্মীয়-কুটুম্ব, বিয়ে উপলক্ষে এসেছে। অনীতার দু-চোখ ভেঙে আসছে, ক্ষিধেও পেয়েছে। কিন্তু যে যার তালে আছে, কার দায় পড়েছে তাব মুখে তাকিয়ে দেখবার? নতুন বউ হয়ে সে-ই বা কেমন করে বলে নিজের কথা? অন্নপূর্ণা থাকলে কি পরোয়া কবত? আর যার কাছে অকুণ্ঠে বলা চলে, সে মানুষ বাইরে বাইবে। একবার শোনা গেল, হাঁকডাক কবে কাকে যেন জেলে-বাড়ি খবর দেবার কথা বলছে; নিজে বেরুচ্ছে মিষ্টান্ন-ভিয়েনের ব্যবস্থায়। বউভাতের ভোজে লোকজন খাবে,

গুহরই উদ্যোগ-আয়োজন। কিন্তু যাকে নিয়ে ব্যাপাব, সে যে মারা পড়ে এদিকে। কালরাত্রি বলে ঘবেব মধ্যে না এলে—রান্নাঘরে গিয়ে পারুল-বউকে চুপি চুপি বলা তো যায়। সম্পর্কে বউদিদি, তাব কাছে লজ্জা কিসের ?

অন্তত দশ-বাবো জন বান্ধবীব বিয়ে হয়ে গেছে, বিয়েয় গিয়ে অনীতা কত আমোদ-ফূর্তি কবেছে। শহবে বিযেব ব্যাপাবই এক আলাদা। অতি-সাধারণ মেয়েটাও সেদিন বাজবাণী হয়ে ওঠে—ফুলে ফুলে, প্রসাধনে, গয়নায়, কাপড়-চোপড়ে, বিদ্যুতেব আলোয়। অগুন্তি সখী সঙ্গে সঙ্গে ঘুবছে—সকলেব মুখে স্নেহ-ভালবাসা—বিয়েব মেযেব একটু কাজ কবে দেবাব জন্য তটস্থ সকলে। একটু কোথাও বসেছে—অমনি চতুর্দিক ঘিবে তার চুলেব বিন্যান সিঁদুবেব টিপ চোখেব কাজল শাড়িব আঁচলা, যেটি যেমন হওয়া উচিত, সাজিয়ে গুছিয়ে দিচ্ছে। শুযে পড়েছে তো মাথায বালিশ—পিঠেব দিকে পাশবালিশ গুজে দিচ্ছে, উঠে দাঁড়ালে স্লিপাব অমনি এগিযে এনে ধবছে পায়েব কাছে।

আব এবি ! বেড়াব ধাবে মিটমিট কবছে একটি প্রদীপ—শিখা কাঁপছে। ঘবকানাচেব বাঁশবনে ক্যাঁচকোচ আওয়াজ। কটব্-কট কটব কট—তক্ষক ডাকছে অদূবে কোথায়। কেমন এক ছমছমে ভাব। মেয়ে-বউগুলোয় চেহাবায পোশাকে আবছা-আবছা আলোব মধ্যে মনে হয়, প্রেতমূর্তি কতকগুলো ঘবময় কিলবিল কবছে। দীর্ঘ কবাঙ্গুলি দিযে টুঁটি টিপে ধবে নি এখনো বটে—কিন্তু কথাব এক একটি বিষপুঁটুল, সদ্য-আগন্তুক নির্বান্ধব মেযেটাকে কথাব খোঁচায় খোঁচায় নাস্তানাবুদ কবছে। যেন কতকালেব শক্রতা কোনদিন-না-দেখা এই পবমাত্মীযদলেব সঙ্গে। দম আটকে আসে। বোন গতিকে সর্ব-ইন্দ্রিয় নিবোধ করে। ভালমন্দ একটি জবাব দেয না। একটুখানি নড়ে-চড়ে বসাও নতুন বউয়েব পক্ষে অপবাধ কিনা, সঠিক না জানায়—নিশ্চল পাথবেব মূর্তি হয়ে রয়েছে।

নিস্তাবিণী সর্বক্ষণ দবজাব উপব বসে ঘাড় কাঁপিয়ে কাঁপিযে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। লাঠিব উপব ভব দিযে হঠাৎ কুঁজো হযে দাঁড়ালেন তিনি। দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে দুই কোটবেব অক্ষি গোলক ঘোরালেন। এই দাঁড়ানো অবস্থা আবও ভযাবহ। অনীতাব সর্বদেহ হিম হয়ে যায়। কতকালের এক শুকনো মড়া হঠাৎ যেন পাশমোড়া দিয়ে উঠেছে। ফোকলা মুখে হাসছেন

অনীতার দিকে চেয়ে চেয়ে। খোনা-খোনা গলায় বলেন, রাত হয়েছে—চললাম রে নাত-বউ। অমন করে তাকাচ্ছিস কেন রে—তোর বর নিয়ে ঘরে যাচ্ছি। কালরাত্তিরে তোর আজকে তো ঘেঁসবার জো নেই—

দিদিমা নাত-বউয়ের ঠাট্টা-মস্করা। গা ঘিনঘিন করে এইসব গ্রাম্য রসিকতায়। চোখ দু'টি তুলে একবার তাকিয়ে অনীতা আবার দৃষ্টি নামাল।

নিস্তারিণী ছাড়েন না, কি-লা, জবাব দিচ্ছিস নে—হিংসে হচ্ছে ?

একজনে মন্তব্য করে, বোবা বউ—

সেই ভূতি মেয়েটা ঠোঁট উল্টে বলে, থিয়েটারের স্টেজ বানিয়ে দাও না—তক্ষুণি দেখো কথার ফুলঝুরি ছাড়ছে। মুখ্যুসুখ্যু গেঁয়ো মানুষ—বাবু-বউয়ের কথার যুগ্যি কি আমরা ?

সর্বনাশ, বিশ্বে চাউর হতে কিছু আর বাকি নেই! একটুখানি সোয়াস্তি, অন্নপূর্ণার মুখোমুখি হতে হচ্ছে না আপাতত। সময় পাওয়া যাচ্ছে ধীরে সুস্থে কোন অকাট্য কৈফিয়ৎ ভেবে নেবার।

নিস্তারিণী আগের কথার জের ধরে বলছেন, ফাঁকতালে একটা দিন পেয়ে গেলাম। কাল থেকে তুই ষোলআনার মালিক—ঝেঁটিয়ে ভূত ভাগাবি অন্ত কেউ বরের পানে নজর পাড়লে।

কথা না বললে দোষ হয—অনীতা মৃদুকণ্ঠে এবার বলে, না দিদিমা, ষোলআনা আপনাদেরই থাকবে। বাইরের মানুষ—আমি কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যাবো না।

সেই নজর মেলে নিস্তারিণী তাকালেন আবার। এবারে আর তত ভয় করে না।

বাইরে বাইরে ক-দিন আর দিদি-ভাই ? তোর শাশুড়ি থাকলে একেবারেই আঁচলে চাবি বেঁধে দিত। আমায় তাই বলেছিল। ভাইয়ের অসুখে চলে গেল, এ যাত্রা তাই বেঁচে গেলি। কিন্তু ক-দিন ?

ভূতি আবার ফোড়ন কাটে, শহুরে কাণ্ডকারখানাগুলো কানে পৌঁছুলে দিদিমা, বউয়ের আঁচলে চাবি বাঁধতেন কি দুয়োরে চাবি দিয়ে বউ আটকাতেন—কিছু বলা যায় না। সে বড় শক্ত ঠাঁই!

বিরজা কোথা থেকে এসে পড়ে।

যাও যাও—ভয় দিও না অমন করে। নতুন বউ ভাববে, সত্যি সত্যি বুঝি তাই।

ভুতিও ছাড়ার পাত্র নয়। ভয় দেখানো মানে? আমার বাপু, মিথ্যে বলে মন ভেজানোর অভ্যেস টভ্যেস নেই। যা সমস্ত শোনা যাচ্চে, তার সিকির সিকি সত্যি হলেও রক্ষে রাখবেন তিনি? সকলে জানে, সবাই বলাবলি করছে—আর এবাড়ির এত পুরানো লোক হয়ে, তুমিই কেবল জানো না বিরজা?

কিন্তু দু দিনের তরে এসে ভুতিও জানে না এবাড়ির বিরজাকে। নিঃশব্দে মুহূর্তকাল সে চোখ দিয়ে আগুন বৃষ্টি করে। কুটুম্বর মেয়ে বলেই আত্মসম্বরণ করল শেষ অবধি। বলে, নানান কথা বলাবলি হচ্ছে বটে! ভাল ঘরের মেয়ে এসেছে, কুঁচুটে লোকগুলোর ভাল ঠেকছে না। ওঠো—যাও চলে যাও দিকি এবার। কচি বউটাকে একটু সোয়াস্তি দাও। কাল ফুলশয্যে—কালকে যত খুশি জ্বালাতন কোরো। আজকের দিনটা ক্ষমা দাও একটু—

ভুতি ক্ষেপে গেল। দাসী চাকরাণীর এত ফরফরানি কেন রে? তোকে কে সর্দারি করতে বলেছে আমাদের মধ্যে এসে?

কানাই ওদিক থেকে হাঁক দিচ্ছে, কি লাগিয়েছিস রে বিরজা? কি হচ্ছে ভুতি, থামো না—কাজের বাড়ি ঝগড়াঝাটি করতে আছে?

ভুতি বল্লে, কাজের বাড়ি রাত্তির একটু হয়েই থাকে। আমরা কি চিরকাল এখানে পড়ে থাকব বউকে নিয়ে রাত জাগতে? আর ঝিনুকে দুধ খাওয়া বউও নয়, যে সন্ধ্যেবেলা ঢলে ঢলে পড়বেন—

বিরজা বলে, সন্ধের আবার কাল হবে—আজকে এখন রাত দুপুর।

আঃ—বলে কানাই তাড়া দিয়ে উঠল।

ভুতি বলে, কিছুতে উঠছি নে। উঠব কি তোর কথায়? যাবো না ঘরে।

গণ্ডগোল বাড়িয়ে কাজ কি—ঘুমিয়েই পড়ুক না এবার অনীতা। তাতে যদি রেহাই দিয়ে চলে যায়। আরও পাঁচ সাতটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে ঘুমিয়ে আছে এদিকে ওদিকে। ওর মধ্যে বলুটা চেনা—বিয়ের চিন্তা আপাতত বিস্মৃত হয়ে হাত পা ছড়িয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বলুর পাশে একটা পাশবালিশ মাথায় অনীতাও গড়িয়ে পড়ল।

ঘুমুচ্ছে বউ—আর কি করবে, গুটিগুটি সরে পড়ো এবারে ভূতি। ঘুমিয়ে পড়ে এতক্ষণে অনীতা নিশ্চিন্তে একটু ভাবনার সময় পায়। বাবা কি করছেন এখন? ক'টা বাজে দেখতে পারলে হত। হাত-ঘড়ি নিয়ে আসে নি—ভাগ্যিস আনে নি, তা হলে ঐ নিয়েই কথা শুনতে হত। চোখ মিটমিট করে দেখে, আপদগুলো বিদায় হয়েছে, রক্ষে পাওয়া গেছে—ঘুমের বুদ্ধিটা ভাগ্যিস মাথায় এসেছিল! বাইরে উঁকি দিয়ে রাতের আন্দাজ পাবার চেষ্টা করে। বাবা তুমি জেগে আছ এই রাতে? কোনদিন জেগে থাকো না—কিন্তু আজকে? আঠারো বছরে এই প্রথম একটা রাত মেয়ে তোমার কাছ ছাড়া হয়েছে।

রান্নাঘরের দিক থেকে বিরজার খরকণ্ঠ ভেসে আসে—ভূতির সঙ্গে কলহের ঝাল ঝাড়ছে পারুলের উপরে।

বলি, বুড়োমানুষদের খুব খাওনাদাওনা হচ্ছে, নতুন বউটা যে ওদিকে মুখ শুকিয়ে আছে! কেমনধারা গিন্নিপনা তোমার বউদি, লোকে বলবে কি?

পুবের দাওয়ায় হীরালাল ও আর ক-জন খেতে বসেছেন—বেশ শব্দসাড়া করে পরিবেশনাদি চলছে—তারই খোঁটা আর কি! ধারালো জিভের ভয়ে বিরজাকে সবাই সমীহ করে। আর কথা যা তুলেছে, শুনতেও খারাপ বটে সেটা। পারুল তাড়াতাড়ি বলে, বাবার অম্বলের অসুখ—রাত করে খেলে চোঁয়া ঢেকুর ওঠে। মাছের ঝোলটা নামিয়ে তাই ওঁকে বসিয়ে দিলাম—দু'টি ঝোল-ভাত খেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়ুন। তা দেখাদেখি এক দঙ্গল পাতা পেতে বসে গেলেন। আত্মীয়-কুটুম্ব সকলে—পাতা ছেড়ে কাকে উঠতে বলা যায়?

কৈফিয়ৎটা তবু বেখাপ্পা লাগছে। আবার বলল, ও-ঘরে ওরা সব মেলা বসিয়েছিল যে! ঠাকুরপোও ফেরে নি এখনো। বউ তার আগে খেয়ে নেবে, সেটা কি রকম হয়—

মুহূর্তে সুর বদলে বড় মেয়ে মণির দিকে চেয়ে রায় দেবার ভঙ্গিতে পারুল বলে, খাবে বই কি—আলবৎ খেয়ে নেবে। ঠাকুরপো সারারাত্তির যদি ময়রাবাড়ি পড়ে থাকে! মণি তুই ঠাঁই করগে, ভাত বেড়ে নিয়ে যাচ্ছি আমি—

মণি এসে ডাকছে, জায়গা হয়েছে—ও কাকীমা, ওঠো—

কপট ঘুম ভেঙে অনীতা উঠে বসে। পারুল বউ ভাতের থালা নামিয়ে বাটিগুলো সযত্নে সাজিয়ে দিয়ে স্নেহ-গদগদ কণ্ঠে বলে, এই দেখে গেলাম অঘোরে ঘুমুচ্ছ। তাই আর ডাকি নি ভাই। পথের কষ্টে নেতিয়ে পড়েছিলে—আহা! ফেবোর জল নিয়ে চোখে-মুখে ঝাপটা দাও, ঘুম ছেড়ে যাবে।

ডাহা মিথ্যা, একটুও তুমি এসো নি—অনীতা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তা জানে। লজ্জা ঢাকছ এই সমস্ত বলে।

খোশামুদির ভাবে পারুল বউ আবার বলে, দেরি হয়ে গেছে। খুব ক্ষিধে পেয়েছে বোধহয় তোমার, কষ্ট হচ্ছে—

অনীতা ঘাড় নেড়ে বলে, কষ্ট কিসের? এই যে একটু ঘুমিয়ে নিলাম—বেশ ভাল লাগছে এখন দিদি।

ভাত বেড়ে আসনের সামনে দেওয়া হয়ে গেছে, ষোলআনা ভালমানুষ হতে এখন আর বাধা কিসের? বলে, এ তো সকাল-সকালই হল। কলকাতায় থেকে কত রাত হয়ে যায়।

পারুল এবার গলা চড়িয়ে বিশেষ করে বিরজার শ্রুতিগম্য করে বলে, আমিও তাই বলছিলাম—কত আর রাত হয়েছে। আরাম করে ঘুমিয়ে আছে, কাঁচা ঘুমে ডেকে তুলে কাজ নেই। তা মা'র পোড়ে না, পোড়ে মাসির!—মুখে মুখে দরদ, কাজের বেলা লবডঙ্কা। বউ নিজে কি বলছে, এইবার তারা কান পেতে শুনে যাক।

ঘুমন্ত বাচ্চাগুলোকে দেখিয়ে মণি বলে, এরাও তো খায় নি। ও মা, ডেকে তুলে দেবো এদের?

রান্নাঘরে পাঠিয়ে দে। উঠতে চাচ্ছে না তো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেল্ উঠোনে। পেটের কাঁটাগুলো নিয়েই যত জ্বালা। নইলে কার কথার ধার ধারতাম? বাবা নিয়ে যেতে চাচ্ছেন—ঝাড়া হাত-পা হলে এক্ষুণি চলে যেতাম তাঁর পিছু পিছু।

অনীতাকে বলে, দেখ ভাই, অনেক কিছু দোষঘাট হবে। সে সব মনে নিও না। তোমাদের বড় বাড়ি, বিস্তর লোকজন খাটে! এখানে একাই আমায় সমস্ত দিকে তাল দিতে হয়। এই যে মণি—চোদ্দয় সবে পা দিয়েছে—

তোমাদের শহরে হলে ফ্রক পরে নেচে নেচে বেড়াত। গরিব মা-বাপের মেয়ে সদাসর্বদা আমার পিছন পিছন ঘোরে, এঁটো-বাসন ধোয়, জল আনে, কাপড় কাচে—

অনীতা লজ্জায় মরে গিয়ে বলে, কি কাজ করতে হবে—আমায় বলবেন দিদি। আমিও করব।

পারুল বলে, তুমি যা জানো গৃহস্থ-সংসারে সে সব কাজে লাগে না। বরঞ্চ নিন্দের হয়, দশজনে দশ কথা বলে।

অনীতা নিরীহ ভাবে বলে, কি নিন্দে শুনেছেন আমি তো জানি নে। কিন্তু ঘরকন্নার সমস্ত কাজ আমার জানা। আপনাদের ভোজের যত পান লাগবে, সমস্ত আমি একা সেজে দেবো—

পারুল বলে, না ভাই, কাজ নেই তাতে। সুপারি কাটতে গিয়ে হাত কেটে ফেলবে—তারপরে সে খবর দূর-দূরন্তর চলে যাক! ছোট মা ভাববেন, আমি ছিলাম না—নিমখুন করে ফেলেছে আমার বউকে। আমার বাবা বড়লোক নন—বিনি দোষে তাই ছ্যাঁচন খেতে হয়।

মণি ছেলেপুলেদের ডেকে তুলে রান্নাঘরে পাঠাল। একটা মেয়ে নড়বে না কিছুতে। শেষটা কান্না জুড়ে দেয়!

এই আন্না! ভালোর তরে বলছি, চলে যা—

আমি কাকীমার সঙ্গে খাবো।

যত ধমকধামক দিচ্ছে, ততই আন্না শক্ত হয়ে বসে।

গুম-গুম করে পারুল কয়েকটা কিল বসিয়ে দিল তার পিঠে। আর যাবে কোথা? ভুঁয়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে পা দাপিয়ে চিৎকার।

কাকীমা আমায় খাইয়ে দেবে, আমি কাকীমার সঙ্গে খাবো রে—

পারুল বলে, আবদার শোন মেয়ের! 'পুন্নিমার চাঁদ দেখে তেঁতুল হলেন বঙ্ক, গেঁড়াগুলি আম্বা করেন আমরা হব শঙ্খ'—

খেতে গিয়ে অনীতার হাত ওঠে না। এরকম অবস্থায় পড়ে নি কখনো জীবনে। দেখেও নি। একফোঁটা অবোধ শিশুকে মারধোর করা হল— এর পরে নির্বিকার ভাবে খেয়ে যায় কেমন করে? বলে, বসুক দিদি, আমার সঙ্গে। দোষ কি? এই দিকটায় একটা আসন পেতে দাও তো মণি—

না, না,—থাক। ঘেন্না-ঘেন্না করবে তোমার। ছেলেপুলে খাওয়ানো যাদের অভ্যেস নেই—তারা পেরে ওঠে না।

টানাটানি করবেন না বলছি বেচারিকে। বসুক। না হয় আমার আসনে বসে পড়ুক, আমি মাটিতে বসব।

অনীতা এক পরম দুঃসাহসিক কাজ করে বসল। ক্রন্দনাকুল আন্নাকে বাঁ-হাতে টেনে নিল পাশে। প্রায় কোলের উপর। বলে, এ ভারি অন্যায় দিদি, এরা হল ভগবান—ঘেন্নার কথা বলে আমায় অপরাধী করলেন।

মুহূর্তে আন্না চুপ। লোলুপ চোখে একবার থালা ও থরে-থরে সাজানো বাটিগুলোর দিকে তাকাচ্ছে। আর একবার মা-বোনের দিকে।

অনীতা হাসতে হাসতে বলে, চলে যান দিকি আপনারা দু-জন। লজ্জা করছে আমাদের, খাই কেমন করে?

পারুলও হেসে বলে, তা যাচ্ছি। কিন্তু রাক্ষুসীকে দিয়ে সব খাইয়ে দিও না। আচ্ছা, ওর থালা আমি আলাদা এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

খামোকা ঐ ঘৃণার কথা তুলল পারুল—অনীতার মুখের চেহারা দেখে ধরে ফেলেছে নাকি? পোকায়-খাওয়া দাঁত মেয়েটার—হাঁ করলেই লালা ঝরে। গায়ে হাত পড়লে ময়লা উঠে আসে। সাবান মাখা দূরে থাক, গামছা দিয়েও বোধ হয় গা রগড়ে দেয় নি কেউ কোন দিন। এ হেন মূর্তিমান মেয়ে-ভগবানটি অনীতার থালা থেকে খাবলে খাবলে খাওয়াই শুধু নয়—তার কোলের উপর চেপে বসে কাপড়েও লুচি-তরকারি ফেলে একেবারে কৃতকৃতার্থ করে দিল।

যাই ঘটুক, সে পাথর হয়ে থাকবে—নড়বে না, এতটুকু শব্দ বের করবে না মুখ দিয়ে। শক্তি দাও হে ঈশ্বর, পরীক্ষার এই ক'টা দিন পার হয়ে ভালোয় ভালোয় কলকাতা ফিরি। ঠাণ্ডা মাথায় তখন আগাগোড়া ভেবে দেখা যাবে।

মিহির ফিরেছে ইতিমধ্যে—সে আর কানাই রান্নাঘরে খেতে বসেছে, উচ্চ হাসি আসছে ক্ষণে ক্ষণে। এমন দরাজ হাসি কলকাতায় ভাবতে পারা যেত না। বউভাতের দরুন ভিয়েনের ব্যবস্থা পাকা করে এসে স্ফূর্তি লেগেছে বড়। অনীতাও ফিরুক কলকাতায়—নিজের কোর্ট ফিরে পেয়ে সে-ও এমনি হাসি হাসবে।

দু-এক গ্রাস আগে যা খেয়েছে—আন্না এসে বসবার পর লুচির একটি টুকরোও আর মুখে যাচ্ছে না। আন্নার নজরে পড়ল।

তুমি কিছু খাচ্ছ না কাকীমা—খিদে নেই বুঝি?

না—

খিদে না হলে খেতে নেই, অসুখ করে—

বয়সে ছোট হলে কি হবে, টনটনে জ্ঞানবুদ্ধি। অনীতা সকৌতুকে তাকায়। সাহস পেয়ে আন্না বলে, তুমি খেলে না কাকীমা, আমি তা হলে তিনটে মাছই খেয়ে ফেলি। খাবো?

মৃদু হেসে অনীতা বলে, খাবে বই কি! সমস্ত হল মা-লক্ষ্মীর জিনিস—নষ্ট হলে তিনি রাগ করেন।

সত্যি, চোখ মেলে তাকিয়ে দেখবার মতো! নতুন বউ এবং শ্বশুরবাড়ির এই প্রথম দিন বলে রাত্রে ভাতের বদলে লুচি দিয়েছে। পাড়াগাঁয়ে এ বস্তু দুর্লভ, আন্না তাই গোগ্রাসে গিলছে। একখানা লুচি মুখে দিয়েছে। সেটা কায়দা হয়ে না আসতে আর একটা। তারপরে আবার।

অনীতা বলে, এত ব্যস্ত কিসের? কেড়ে নিচ্ছে না তো কেউ—

তাড়াতাড়ি খেলে ভাল হজম হয় না। তাই নয় কাকীমা? আমি আস্তে আস্তে খাই।

ধীরে ধীরে চিবোচ্ছে এবার। পেট ভরে এসেছে—বুঝতে পারা গেল। তাই এমন সুবুদ্ধি। একবার এরই মধ্যে অনীতার দিকে মুখ তুলে চেয়ে ফিকফিক করে হাসে।

এক্কটা ঘুমিয়ে পড়েছে। নইলে দেখতে কাকীমা, কি কাণ্ড! চিলের মতো ছোঁ মেরে সমস্ত নিয়ে পালাত।

এক্ক নামে ছেলেটাকে অনীতা ইতিপূর্বেই দেখেছে। বলে, তোমার ভাই?

আন্না পরিচয় দেয়, এক্ক জেড আর পুন্নু—তিন ভাই আমার। এক্কটা খাওয়ার পোকা। খাচ্ছে, কেবল খাচ্ছে, দিনরাত তার মুখ চলে। সে জেগে থাকলে আধখানা লুচিও তোমার ভোগে হত না কাকীমা। সে আসছে দেখলে আমরা কি করি জানো? একসঙ্গে সমস্ত মুখের ভিতর পুরে ফেলি—

বলতে বলতে উত্তেজনার বশে দু-তিনটে লুচি যা অবশিষ্ট ছিল, ডেলা পাকিয়ে মুখবিবরে ঠেলে দিল।

অনীতার বাক্‌রোধ হয়ে গেছে। কি কাণ্ড রে বাবা! মানুষ ঐটুকু—এই পরিমাণ খাদ্য ওর ভিতরে রাখে কোথায়? দেহখানায় হাড়মাংস নেই বোধ হয়, আপাদমস্তক ফাঁপা।

পায়স নিয়ে এসে পারুল বউ অবাক। ওমা আমার কি হবে! থালা একেবারে চাটা-মোছা—সমস্ত বুঝি ওকে দিয়ে খাওয়ালে?

আন্না কাতরচোখে তাকাচ্ছে। অনীতা তাড়াতাড়ি বলে, ও কেন খাবে? ছোট্ট মানুষ—ও কি ভাল করে খেতে শিখেছে এখনো?

পারুল বলে, তোমার ভাই পেট ভরে নি। আর কিছু এনে দিই—

অনীতা ঘাড় নাড়ে, উঁহু—দরকার নেই। অনেক হয়েছে। আর খাবো না—

তার ভয়, এর উপরে আর চাপান দিলে দুর্ঘটনা ঘটবে। পেট ফেটে যেতো মেয়েটার। আন্নার কিন্তু আপত্তি নেই। সে বলে, কেন খাবে না কাকীমা? ও মা, নিয়ে এসো তুমি—কাকীমা লজ্জা করছে।

শুধুমাত্র শাঁখাশাড়ি দেবার চুক্তি—ভয়ে ভয়ে তাই হিমাংশু দান-সামগ্রী কম করে দিয়েছেন। সীতার চেয়েও কম। খাট-বিছানা দিয়েছেন অবশ্য, সে সমস্ত হিমাংশুর বাড়ি পড়ে আছে। দূর জায়গায় নিয়ে আসার অসুবিধা—সুযোগমতো নৌকো করে আনতে হবে। তক্তাপোশের উপর কাঁথা ও শীতলপাটি বিছিয়ে নতুন বউকে শুতে দিয়েছে। আজকের রাত্তিরটা মণি শুয়েছে তার সঙ্গে। সারা দিন অনেক কষ্ট গিয়েছে, শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনীতা ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। ভারি গুমট। প্রথমটা বুঝতে পারে নি, কোথায় রয়েছে। মাথার উপরে পাখা ঘুরছে না—সেই বড় তাজ্জব লাগছে। মালুম হল তারপরে। কলকাতায় নয়—অনেক দূর, হাঁসপুকুর গাঁয়ে শ্বশুর-বাড়িতে প্রথম রাত।

প্রদীপ নিভে গেছে! মণিই হয়ত নিভিয়ে দিয়ে শুয়েছে তেল বাঁচানোর অভিপ্রায়ে। বাতাস একেবারে বন্ধ। কিম্বা বাইরে যদিই থাকে, বেড়ার

ফাঁক দিয়ে কতটুকু আর ঢুকতে পারে? আইঢাই করছে। উঠে দরজা খুলে দাওয়ায় গিয়ে একটু বসবে—কিন্তু সাহস কুলায় না।

মণিও জাগল। জিজ্ঞাসা করে, ঘুম হচ্ছে না বুঝি কাকীমা?

সেটাও স্বীকার করতে ভরসা পায় না। এইটুকু সময় এসেছে, দোষের ফিরিস্তি কেবলই লম্বা হয়ে যাচ্ছে। গরম লাগাটাও হয়তো অপরাধ—বড়লোকের দেমাক প্রকাশ পাবে এই ব্যাপারে। অনীতা সাফ বেকবুল যায়, উঃ—মরে ঘুমিয়েছি এতক্ষণ! কত আর ঘুমোবো?

কথাটা আরও জোরদার করতে গিয়ে বলে, কম ঘুমোই আমি। শুতেই তো বারোটা বেজে যায়—

মণি বলে, করো কি অত রাত্তির বসে বসে?

পড়াশুনো করতে হয়—

বলতে গিয়ে জিভ কাটে। ভালোমানুষ হতে গিয়ে দোষ আর একটা বাড়িয়ে ফেলল বুঝি! রাত্রি জেগে যে পড়াশুনো করে, কলকাতার সমাজে সে হল সুশীল ও মনোযোগী মেয়ে। এদের কাছে গৃহস্থালীর আবর্জনা—উপহাসের পাত্রী। মণির মুখ দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে। যত দূর মনে হয়, আবার সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের মধ্যে কথা কানে না গিয়ে থাকে, তবে তো বাঁচোয়া।

বাবার কথা মনে পড়ে অনীতার চোখ জলে ভরে আসছে। আরাম করে ঘুমিয়ে আছ তো বাবা? ঘুমোও ঘুমোও—আমি ভাল আছি, দিব্যি জমে আছি এদের সঙ্গে। কিছু ভাবনা কোরো না। তোমায় মোটে বিশ্বাস করতে পারি নে—কী যে করি! হয়তো না ঘুমিয়ে ছটফট করছ আমার কথা ভেবে। আমি নেই কিনা—সেই জন্যে স্বাধীন হয়ে মজা করে রাত্তিদুপুর অবধি জাগা হচ্ছে!

আসবার সময় পইপই করে কমলাবাসিনীকে বলে এসেছে—বকেঝকে ঝগড়া করে যেমন করে হোক পিশি, দশটার আগে বাবাকে খাইয়ে দেবে। দরদালানে পায়চারি মিনিট দশেক—তারপরে বিছানায় শুইয়ে আলো নিভিয়ে চলে আসবে। বাবাকে সামলানো চাট্টিখানি কথা নয়—উঠে উঠে দেখতে হবে, চুপিসারে আবার আলো জেলে নথিপত্তোর নিয়ে বসেছেন কিনা!

বদ্যিটি কথায় হবে না কিন্তু পিশি, তা হলে জো পেয়ে যাবেন। বাবা বড্ড চালাক।

এত শাসনের শোধ বাবাও নিতেন রাত্রে উঠে উঠে। তোর ঘরে আলো কেন রে বেবি, জেগে আছিস? আমিও জ্বালি তবে আলো। পড়াশুনো কি অন্য কোন ব্যাপারে অনীতারও দশটার পরে জাগবার জো ছিলনা।

ক্লাবে পিশি, যেতে দিও। সারা দিনের খাটাখাটনির পরে ওখানে গিয়ে মন ছড়িয়ে গল্পগুজব কি একটু দাবাখেলা—তাতে 'না' করতে নেই। ঝগড়া ছেড়ো না তা বলে, রোজ শোনাবে, যেতে দেওয়া হবে না আর ক্লাবে। ভয়ে ভয়ে তবেই ঠিক সময়ে ফিরবেন। কিছু যদি না বলেছ, ঠিক দেখবে, দাবার বাজি রাত দুপুর অবধি চলছে। ভারি কঠিন আমার বাবাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ানো। আমি ছাড়া কেউ পারে না। পাঁচটা-সাতটা দিন পার করে কবে যে গিয়ে পড়ব আবার বাবর কাছে!

মণির গায়ে নাড়া দেয়, ও মণি শুনতে পাচ্ছ?

উঁ—

তোমাদের বাড়ি এসেছি। কথাবার্তা বলো দু-একটা —

জড়িত কণ্ঠে মণি বলে, কি কথা?

কি রকম আওয়াজ করছে—ঐ শোন গো!

একেবারে গায়ের উপর পড়ে অনীতা তাকে জড়িয়ে ধরেছে। ঐ—ঐ—

মণি বলে, ফেউ ডাকছে—

ফেউ আবার কি রকম জানোয়ার?

ফেউ জানোয়ার বুঝি? অন্ধকারে মণির হাসির শব্দ পাওয়া যায়। শেয়ালে লেজ মুখের মধ্যে পুরে আয়াজ তোলে—তাকে বলে ফেউ ডাকা।

অনীতা কৌতূহলী হয়ে বলে, মুখের মধ্যে লেজ পুরতে গেল কেন শেয়ালে?

শেয়াল বড্ড ভালো, সকলের উপকার করে বেড়ায়। জঙ্গল থেকে জন্তু-জানোয়ার বেরিয়েছে, ফেউ ডেকে মানুষজন গরুবাছুর সামাল করে দিচ্ছে।

সভয়ে অনীতা বলে, কি জন্তু—বাঘ?

এই দেখ, রাত্তিরবেলা নাম করে বসলে। তাঁরা হতে পারেন, আবার কেঁদো-বুনোশুয়োরও হতে পারে।

অনীতার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। নিশিরাত্রে অদূরে বাঘ প্যায়চারি করে বেড়াচ্ছে—হঠাৎ যদি ঘরের ভিতরটা উঁকি দিয়ে দেখে যাবার বাসনা জাগে? থাবার একটা ঘা দিতেই তো পলকা বেড়া ভেঙে পড়বে।

মণি বলে, কেউ কেমন করে ডাকে, তাই জানো না—এই যে শুনি পাশ-করা মেয়ে তুমি?

বিশ্বাস কোরো না মণি। ও সব শত্রুরা বলে।

মণিও সায় দেয়, তাই হবে। তুমি এমন ভালো কাকীমা—আর কত যে নিন্দেমন্দ রটাচ্ছে তোমার নামে!

অনীতা নিশ্বাস ফেলে বলে, আমার কপাল! কি কি রটাচ্ছে, বলো দিকি শুনি—

সে অনেক—অনেক। আমার মনে থাকে না। একটা হল যে তোমরা ভয়ানক বড়লোক।

একটুখানি থেমে বলে, শোন তবে—কাউকে বোলো না কাকী—এসব করেছেন দাদামশায়, ঐ যিনি তোমাদের সঙ্গে এসেছেন। এমন হাসিখুশি মানুষ তুমি, কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলো, পায়ে হাত দিয়ে সকলকে প্রণাম করো—তুমি বড়লোক হতে যাবে কেন? দাদামশায় মোটেই লোক সুবিধের নয়। ছোট্‌ঠাকুরমা বড়লোকদের দু-চক্ষে দেখতে পারেন না কিনা—এই সমস্ত বলে বলে তাঁকে রাগিয়ে দেবার চেষ্টা।

অনীতা বলে, তোমার ছোট্‌ঠাকুরমা খুব রাগি বুঝি?

এমনি ভালো। কিন্তু একবার যদি রেগে ওঠেন—ওরে বাবা!

যেন ভাষা দিয়ে বলা যায় না, ভাবতে গিয়েই মণি শিউরে শিউরে উঠছে। বলে, রাগলে কুরুক্ষেত্তোর করেন ছোট্‌ঠাকুরমা, কারো তখন খাতির নেই। দাদামশায় ছোট্‌ঠাকুরমাকে নিয়ে, কলকাতায় এক মেয়ে দেখতে যান। ভীষণ বড়লোক তারা—মেয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করেছিল। আর যাবে কোথা—ফরফর করে বেরিয়ে চলে এলেন। বাড়ি এসে বললেন, ঘরের বউ আনতে গিয়েছিলাম—কিন্তু সে হল এক ফৌজের সেপাই!

সোনারপুরে সেই দিনের কথা অনীতা ভাবছে। খুব বেঁচে গিয়েছে! গলায় আঁচল বেড় দিয়ে অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করেছিল। বউমানুষের ঐ কায়দার প্রণাম

কোথায় যেন দেখেছিল, নইলে সে-ও ঠিক চড়কবাড়ির মেয়ের মতো করে বলত।

প্রশ্ন করে, আচ্ছা—কি হলে তোমার ছোট্‌ঠাকুরমা রাগ করেন না, খুশি হন, খুব ভালবাসেন—সেই সব বাতলে দাও দিকি লক্ষ্মী সোনামণি।

আদরে গলে গিয়ে মণি বলে ঘোমটা দিয়ে বেড়াবে, চলবে আস্তে আস্তে, ফিসফিস করে কথা বলবে—চেঁচিয়ে হাসবে না। সকাল সকাল চান করে রান্নায় বসবে, খুব ভাল করে রান্নাঘর নিকোবে—ছোট্‌ঠাকুমার আবার শুচিবাই আছে কি না!

দম নিয়ে আবার বলতে লাগল, খাবারদাবার সকলকে সমানভাবে দেবে—কারো কম-বেশি যেন না হয়। বউরা খাবে সকলের শেষে—বাড়ির সকলের হয়ে যাবার পর। অতিথ-কুটুম্ব এলে কক্ষণো বিরক্ত হবে না। লক্ষ্মীর ব্রত করবে ফি বিষ্যুদ্‌বার—

হেসে উঠে বলে, কত আর বলব কাকীমা—কিচ্ছু বলতে হবে না তোমায়। এই কতক্ষণ এসেছ—ছোট্‌ঠাকুরমা যেমন-যেমন চান, তাই তো করছ তুমি। তিনি তোমায় খুব ভালবাসেন, যতই ওরা কানভাঙানি করুক—

আরও অনেকক্ষণ কাটল। মণি ঘুমিয়েছে—অনীতা এপাশ-ওপাশ করছে বিছানায়। সোনারপুরে সন্ধ্যাহ্নিকে রত এক শান্ত তদ্গত মূর্তি দেখেছিল, ঠাকুর প্রণাম সেরে স্নেহময়ী আদর করে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ছিলেন। কিন্তু এরা যে বলছে এক রণচামুণ্ডার কথা, পান থেকে চুন খসলে যার কাছে রক্ষে নেই। জঙ্গল থেকে বাঘ বেরিয়ে ঘর-কানাচে হামলা দিয়ে বেড়াচ্ছে—আর ঘর-সংসার জুড়েও যে আর এক বাঘ। ভাগ্যে তিনি বিদেশে, তাই আপাতত বেঁচে গেল।

১৯

শেষ রাতে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় একটু ঘুম এসেছিল। কিন্তু কতক্ষণ! ফর্সা না হতেই ট্যাঁ-ভ্যা—বালখিল্য-বাহিনী জেগে উঠেছে। অনীতা এসেই কাল গোটা কয়েকের চেহারা দেখেছে—রোগা ডিগডিগে, যত স্বাস্থ্য উপছে পড়ছে উদরদেশে। মনে হল, অন্নপূর্ণার এটা গৃহস্থালী নয়—আতুরাশ্রম; যত নিরন্ন নিরাশ্রয় এনে জুটিয়েছেন আত্মীয় নাম দিয়ে। সেই সব ক্ষীণ বস্তু থেকে এমন রকমারি ও জোরদার আওয়াজ বেরুচ্ছে—স্বকর্ণে শুনেও বিশ্বাস করা কঠিন। কারো ক্ষিধে পেয়েছে, কেউ দুয়োর খুলে বাইরে আসবে, জরুরি প্রাকৃতিক প্রয়োজনও অনেকগুলোর। চিৎকারে বাড়ি মাৎ করে এঘর-ওঘর থেকে আত্মঘোষণার পাল্লা চলেছে যেন! সে কি পাঁচ-দশটা? শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এক পারুল বউয়েরই এই বয়সের মধ্যে সাত। আরও বিস্তর আছে—স্বল্প সময়ে ঠিক মতো পরিচয় হয় নি। আব হালফিল বিয়ের ব্যাপারে যাঁরা এসে জমেছেন, তাঁরাও শূন্য কোলে আসেন বড়-একটা। এই সুবিশাল পল্টনের নাওয়ানো-খাওযানো হাঁকডাক করে এবং অবস্থা বিশেষ পিটুনি দিয়ে সামলে রাখা—বিয়ের আসল মচ্ছব বলতে গেলে এদের নিয়েই তো।

বউমানুষের ঘোর থাকতে শয্যাত্যাগ করতে হয়—অনীতা জেনেবুঝেও তবু উঠবে না। সাধ্যে কুলাচ্ছে না, আর ইচ্ছেও নেই। গুণাবলীর কোনটা বাকি আছে চাউর হতে? যতটা সত্যি তার উপরেও রং চড়িয়ে দিয়েছে—অন্নপূর্ণা ফিরে এলে কাজে লাগাবে। বউ অনেক বেলা অবধি ঘুমায়—এ নিন্দে এমন কি অধিক মারাত্মক হবে ঐ সবের তুলনায়।

চোখ বুজে পড়ে আছে, চোখের পাতায় যেন এঁটে গিয়েছে। আধ-ঘুমের মধ্যে মালুম হল, আক্রোশভরে তার গায়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে যেন কি-সব বস্তু। আবার কি-একটা এসে—চামচিকে না বাদুড়—পক্ষপুটে গলা জড়িয়ে ধবল। দম আটকে মারা পড়বার গতিক। চোখ মেলে দেখে, পারুল বউয়ের পাঁচ নম্বরের সন্তান—সেই এক্স। ক্রমশ ঠাহর হল, একা এক্স নয়—আশে পাশে

অনেকগুলো—পুরো ডজন তো হবেই। এরা গায়ে এসে পড়ছিল বড় বড় ডেলার মতো। প্লীহার বিপুল বোঝা বয়ে বেড়ালেও এদিক বিশেষ করিৎকর্মা নতুন বউকে মাঝখানে রেখে এপাশে-ওপাশে ব্যূহ সাজিয়ে ফেলেছে, সংগ্রামের উদ্যোগ করছে—লহমার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ত। দাওয়া ঝাঁট দিতে দিতে মণি দেখতে পেয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

রাতে কাকীমা ঘুমোতে পারে নি—একটু চোখ বুজেছে, কুকুর-বিড়ালের দল অমনি এসে পড়েছিস? বাড়ির মধ্যে আর জায়গা হল না? বেরো—উঠানে চলে যা তোরা।

পারুল বউ কোলের ছেলেটা নিয়ে এসে দাঁড়াল।

চিনতে পারো পুনুবাবু? বল দিকি—কে? দেখ ভাই, ড্যাবড্যাব করে তোমার দিকে তাকাচ্ছে কি রকম। ভারি বুদ্ধি—সব বোঝে আমার পুনু। কাল সমস্তটা দিন জ্বরে হাঁসফাঁস করেছে, চোখ মেলে চাইতে পারে নি। সন্ধ্যের পর ঘাম হয়ে গিয়ে তখন থেকে গা ঠাণ্ডা হতে লাগল। ওমা কি হবে—হাত বাড়াচ্ছে দেখ, তোমার কোলে যাবে—

অনীতা উঠে বসল তাড়াতাড়ি। বাচ্চাটার নাকে কফ, গলায় একরাশ তামা-লোহা-রূপোর মাদুলি। সে যাই হোক—নাক সিঁটকালে হবে না, উত্তম কথা বলতে হবে। হাসির মতন ভাব করে অনীতা বলে, বড় সুন্দর ছেলে দিদি। নামটাও বেশ আদুরে—পুনু।

পারুল হাসতে হাসতে বলে, নাম হল পুনশ্চ। ওঁর কাণ্ড। এক বয়সে একটু পদ্যটদ্য লিখতেন—রবি ঠাকুরের কোন বইয়ের নামে নাম দিয়েছেন।

বাদুড়টার হাতের বন্ধন শ্লথ করে অনীতা উঠে পড়েছিল। ইতিমধ্যে সে উঠে পিঠের উপর আবার লেপটে পড়ল। হেন অবস্থায় বাঁ-হাতখানা ঘুরিয়ে এদের গায়ের উপর দিয়ে পারুলের সামনে ওটিকেও দরদ দেখাতে হয়।

উঁ-উঁ—কি রকম শব্দ করছে পুনু বাচ্চাটা। শব্দের মানে পারুলই বোঝে। অনীতাকে বলে, ধর গো-হাত বাড়াও। নতুন কাকীর কাছে যাবার বায়না ধরেছে—

পুনুকে কোলে বসিয়ে দিয়ে পারুল দু-পা পেছিয়ে মুগ্ধভাবে চেয়ে থাকে। সেই যে বলে থাকে, বুকে-পিঠে শরশয্যা—অনীতার হল তাই। হাত দুটো

ধনিশপিশ করে। কিন্তু গর্ভধারিণী মা অমন করে তাকিয়ে আছে—অনীতাও অগত্যা আনন্দে গলে গলে পড়তে লাগল।

পারুল বলে, অনেক শখ ছিল ওঁর এক সময়। বড় দুই মেয়ে মণিরেণু—তাদের পোশাকি নাম মণিকা আর রেণুকা। তারপরেও মেয়ে—তখন রেগে-মেগে নাম দিলাম আন্না। আর নয় গো, আর মেয়ে দিও না হে মা-ষষ্ঠী। কিন্তু কালা ষষ্ঠী কানে নেন না—আন্নার পিঠোপিঠি আবার মেয়ে হল, কান্না।—বাপ মায়ের কান্না ছাড়া আর কি বলো?

অনীতা মুরুব্বির ভঙ্গিতে বলে, ঈশ্বরের দান—দূব ছাই করতে নেই দিদি।

পোড়া ঈশ্বরের কি বিবেচনা আছে? কি করে মানুষ করি এতগুলোকে কি খাওয়াই, কোথায় বিয়েথাওয়া দিই? কান্নার পরে অবিশ্যি ছেলে। সে ও এক ব্যাপার। ঠাকুরপোকে বলি, এবাবে তুমি দেখে শুনে নতুন ধরনের একটা নাম দাও। তার সব তাতে রগড, নাম দিল—এক্স। ওদের বিজ্ঞানে যখন আব নাম পাওয়া যায় না, তখন নাকি এই নাম চলতি। এক্সের পরে হল জেড। ষষ্ঠীঠাকরুনকে বাংলায বলে বলে হল না তো ইংরেজি শেষ-অক্ষরের নাম দিয়ে দেখা যাক, তাতে যদি দুঃখটা বোঝেন।

মণির তাড়ায় অন্য সবাই সবে পড়েছে, আন্নাটাই কেবল বসে আছে কালকের মতো। গল্পের মাঝখানে চোখ মিটমিট করে সে বলল, কাকীমাকে জলখাবার দেবে না?

পারুল বলে, সেই লোভে তুই নড়ছিস নে পেটুক মেয়ে?

পিঠের উপব থেকে এক্স ফোঁস করে ওঠে, কাল ও খেয়েছে কাকীমার সঙ্গে। আজকে আমি—

আন্না ঘাড় নেড়ে বলে, না—খাই নি আমি। বলুক কাকীমা—

এক্স বলে, খেযেছে মা। এত খেযেছে যে শুযে তারপর দম নিতে পারছিল না।

অনীতা বলে, আচ্ছা, দু-জনেই খেও তোমবা। খাবার সময আমি ডাকব। বড় লক্ষ্মী ছেলে এক্স—গলাটা ছাড়ো দিকি মাণিক আমার। আন্না, যাও তুমি—জলখাবার খাবে তো ভাল করে মুখটুখ ধুয়ে এসো। মুখে গন্ধ হয়েছে।

ঠাকুরবাড়ির সেই দীঘি ফাঁকা জায়গা এতটুকু আবরু নেই। এক শুকনো-গুঁড়ি চেলা করছে ওধারে—বউভাতের ভোজের রান্নাবান্নার কাঠ। অনীতা আর মণি জলে নামছে—কুড়ুল থামিয়ে লোকগুলো চেয়ে চেয়ে দেখে। কলকাতা শহর থেকে আসা বউটাকে একটুখানি দেখে নিচ্ছে—অস্বাভাবিক কিছু নেই ওতে। পাড়ার অন্য বউঝিরা ধীরে সুস্থে চান করে ভিজা কাপড়ের জল ছিটাতে ছিটাতে তাদের চোখের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। কারো কিছু মনে হয় না, অনীতারই অস্বস্তি লাগে। ঝুপঝুপ করে গোটাকয়েক ডুব সেরে সে উঠে পড়ল।

মণি বলে, ও কি—হয়ে গেল কাকীমা? শহুরে মানুষ—জল দেখলে তোমরা মূর্ছা যাও।

তা তো বটেই! মুখ ফুটে কিছু যে বলার নেই—হাসে অনীতা মৃদু মৃদু। দাও না সরিয়ে কাঠ-কাটা ঐ লোকগুলোকে। আব, এদিক-ওদিকে যত লোক চলাচল করছে। আর, বউমানুষ বলে দোষদৃষ্টি হবে না—কথা দাও। রাজহংসীর মতো, দেখতে পাবে, এতবড় দীঘি তরতর করে পার হয়ে যাচ্ছি।

মণি কি করবে—অর্ধেক চান করে কাকীমার পিছু পিছু বাড়ি চলল। ছায়া-ছায়া পথ—কদমগাছে বিস্তর কদমফুল ফুটে আছে। কি সুন্দর, কি সুন্দর। আর এক ঝুপসি মতন গাছে গোটা কতক স্বর্ণচাঁপা। মণির পরের বোন রেণু সাজি হাতে ফুল তুলে তুলে বেড়াচ্ছে। উপরের ফুল ক'টার নাগাল পায় না—লাফ দিয়ে ডাল ধরবার চেষ্টা করছে।

অনীতা দাঁড়িয়ে পড়ে পটপট কয়েকটা ফুল তুলে ফেলল। রেণু দু-পা পিছিয়ে হাঁ-হাঁ করে ওঠে, তোমার ও-ফুল ডালিতে দিও না কাকীমা। সরে যাও, ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়। ঠাকুরের পুজোর ফুল।

অনীতা বলে, অজাত-কুজাত নই আমি। আর দেখছ, এই তো চান করে এলাম—

রেণু বিপন্নভাবে বলে, থাকগে—কি দরকার কাকীমা? মানে, চাল-চলন খাওয়াদাওয়ায় তেমন বাদ বিচার করো না তোমরা—ছোট্ট-ঠাকুরমার কানে গেলে রক্ষে রাখবেন না।

সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলে, বিকালে ফুল তুলতে আসব, অনেক ফুল লাগবে। তখন এসো তুমি—কেমন ? ফুলশয্যার ফুল ছোঁয়াছুঁয়িতে মরে যায় না।

চাঁপাফুল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুখ কালো করে অনীতা চলে গেল। ছোট্ট মেয়েটা অবধি জেনে বুঝে রেখেছে, এ বাড়ির পুণ্য কাজ তার ছোঁয়াছুঁয়িতে পণ্ড হয়ে যায়।

সকালে উঠে মিহির আবার বেরিয়েছে বউভাতেরই কোন ব্যাপারে। মা উপস্থিত নেই—কানাই খুবই খাটাখাটনি করছে—তা হলেও আসল দায়িত্ব তার উপরেই তো! এদের যে-কোন কাজকর্মে সামাজিক ভোজটা অতি উপাদেয় রকমের হয়ে থাকে। চিরকালের সুনাম। সেইটে বজায় রাখবার জন্য এত ছুটোছুটি। মিহিরকে পেলে অনীতা মাথা খুঁড়ত আজকে। কাজ নেই ওগো তোমাদের বউভাতে। অনাচারী উচ্ছৃঙ্খল বউয়ের হাতে ভাত দিয়ে পরিবেশন করাবে, সে ভাত মুখে তুলবে না তোমাদের নিষ্ঠাবান আত্মীয়জনেরা। থু-থু করে ফেলে দিয়ে ভোজের আসরের মধ্যে আবার একদফা অপমান করবে।

খেতে বসেছে, কিন্তু খাবে কি—হাত উঠছে না মুখে। কান্না ঠেকাবে না ভাত খাবে ? লোভী আন্না দুপুরের জন্যেও তক্কে-তক্কে ছিল—যথাসময়ে কলাপাতা নিয়ে পাশে বসে পড়েছে। বসেই প্রশ্ন, তুমি খাচ্ছ না কাকীমা—আমি তবে খাই ? এক্ষু টের পেয়ে যাবে আবার—বড্ড শয়তান কিনা!

এবং অগোগ্রাসে খেতে শুরু করল। অনীতাকে হঠাৎ প্রতিহিংসায় পেয়ে বসে। বাড়িসুদ্ধ সকলের উপর—কিন্তু আপাতত হাতের মাথায় আর কাউকে না পেয়ে মেয়েটার উপর শোধ তুলে নিচ্ছে। কত খেতে পারে দেখা যাক। ফুলশয্যার ব্যাপারে এয়োস্ত্রীরা রাত্রে খাবে, রান্নার বিশেষ একটু আয়োজন। মাছ-ভাজা, মুড়িঘণ্ট, মাছের ডিমের টক—এমনি আট-দশ পদ নিজে রান্নাঘরে গিয়ে নিয়ে এলো বাটি ভরে ভরে। এর পরে মিষ্টিমিঠাই কি আছে, পারুলকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। পারুলের ঘরে ঢুকতে গিয়ে অনীতা থমকে দাঁড়াল। তার সম্বন্ধে রসালো আলোচনা হচ্ছে। বলছে পারুলই।

নতুন বউ আমাদের খাউক্তি-দাউক্তি ভালো। নিজের হাত জগন্নাথ—লজ্জাশরমের বালাই নেই। আমরা শুনি শহুরে মেয়েরা কম খায়। ওরে বাবা!

আর ঐ বিরজা কি চোখে দেখেছে অনীতাকে—সব সময় তার হয়ে লড়ছে।

শুধু বিরজা নয়, বিরজা-দিদি বলে ডাকবে তাকে অনীতা। পারুল বউয়ের কথায় বিরজা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, যাঁর পছন্দের বউ সে-মানুষ বাড়ি থাকলে কত রকম সাজিয়েগুজিয়ে মুখে তুলে ধরতেন। নিজের বাড়ি-ঘরদোর, নিজের সংসার—নিয়েথুয়ে যদি খেবেই থাকে, বাইরের উড়ো-লোক তা নিয়ে মুখ বাঁকাবে কেন ?

একেবারে ধাঁতে ঘা দিয়ে বলা। পারুলও জবাব দিল, এবং অবস্থা অচিরে ঘোরতর হয়ে উঠত। বোধকবি সেই আশঙ্কায় অনীতা সঙ্গে সঙ্গে ঘবে ঢুকে বলে, কালকের সন্দেশ-চন্দোরপুলি আছে দিদি ? যত-কিছু খাই, শেষটা মিষ্টি মুখে দিয়ে জল না খেলে আমার যেন পেট ভরে না।

পারুল তাড়াতাড়ি ঢোক গিলে বলে, বেশ .তা—বেশ তো। রাক্ষসগুলোর ভয়ে ছাপবাক্সে তালাচাবি দিযে রেখেছি। নাও চাবি। না হয় চলো, আমি বের করে দিচ্ছি। ভাল ক্ষীরের-ছাঁচও আছে, খেয়ে দেখো দু-চারখানা। বজ্জিবাড়ির দশ রকম তালে আমার সব সময খেয়াল থাকে না ভাই। ঐ বিরজা যা বলল—পরের জায়গা তো নয়, নিজে দেখেশুনে চেয়েচিন্তে খাবে।

বোধনতলায় বলু আর জেড ধুলোবালি সাজিয়ে দোকান-দোকান খেলছে। বলু দোকানদাব, জেড খদ্দের। পুনু হঠাৎ ডাকাতের মতো সেখানে গিয়ে পড়ে। দোকানেব মহামূল্য মালপত্র মুঠো মুঠো ছড়াচ্ছে, নিজেব সর্বাঙ্গে মাখছে। বিপন্ন দোকানদার পারুলেব ভযে বলতেও পাবছে না কিছু। অনীতাকে দেখে কাঁদো-কাঁদো হযে বলু নালিশ কবে, দোকান লুঠপাট কবছে দেখ বউদি—

অনীতা শাসন কি করবে—তার আগেই একফোঁটা শিশু টলতে টলতে এসে গায়ের উপব ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কোন দিক থেকে নিস্তারিণী বলে ওঠেন, তোমায বড্ড গছে গিযেছে নতুন বউ। আহা, কোলে নাও একটু।

অনীতা বিরসমুখে বলে, এঁটো-হাত দিদিমা—

বাঁ-হাতে নাও তুলে। ঠোঁট ফোলাচ্ছে দেখ না, মনে মনে কষ্ট করছে।

পুনুও দু-হাত উপরে তুলে তৈরি—কোলে তুলে নিলেই হল।

কাল কথায় কথায় আমাকে ভগবান বলেছিল। কিন্তু সেই একটিমাত্র

নয়, অশুচি ভগবান এদের বাড়ি। তাঁরা কোলে চড়ছেন, পিঠে ঝাঁপাচ্ছেন, চুল ছিঁড়ছেন, কাপড়ে ধুলো-কাদা মাখাচ্ছেন, পাতের খাবার গবাগব কেড়েকুড়ে খাচ্ছেন। অনীতাও আদর করে দু-হাতে জড়িয়ে কোলে তুলে মুখের উপর মুখ চেপে ধরে যথাসাধ্য ভক্তি-ভালবাসা দেখাচ্ছে। তাই আরো কাল হয়েছে—ভক্তের প্রতি প্রসন্নতা অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে গেছে। তিলেক ইতস্তত ভাব দেখালে ঠোঁট ফোলাচ্ছেন তাঁরা, মনে মনে কষ্ট করছেন, ভ্যা করে রোদনরবও তুলছেন অকস্মাৎ। আর কিছুতে না হোক, এই ভগবানের ধকলেই অনীতাকে হাঁসপুকুর ছাড়তে হবে। স্টেজে গৃহলক্ষ্মী সেজে দু-এক ঘণ্টার মিষ্টি অভিনয় চলে—তা বলে ঘরের মধ্যে বউ সেজে সে-অভিনয় বারো মাস তিরিশ দিন কি করে সম্ভব ?

দুপুরের খাওয়াদাওয়া মিটে চারিদিক নিঝুম হয়ে গেছে, চোরের মতো পা টিপে টিপে মানুষটি সেই সময় দর্শন দিলেন। কাল সন্ধ্যায় গাঁটছড়া খুলে সরে পড়েছিলেন, আর এই।

কেমন লাগছে অনীতা ?

তবু ভালো—মনে পড়ল এতক্ষণে !

আর কিছু বলতে পারেনা, কথা আটকে আসে অভিমানে। তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

কি করি বলো ? কাল তো কাছে আসবার উপায় ছিল না।

আমি যদি মরে যেতাম, তবু না ? এতখানি বেলার মধ্যেও ফুরসৎ হল না, আছি কি মরে গেছি—একটাবার খোঁজ নেবার ?

মিহির বলে, দশজনের পায়ের ধুলো পড়ছে বাড়িতে—সকল দায়ঝক্কি বলতে গেলে আমার উপরে। বড্ড তাই ছুটোছুটি হচ্ছে। তা ছাড়া পাড়াগাঁয়ের বাড়ি দিনমানে দেখাসাক্ষাৎ মুশকিলও বটে !

প্রবোধ দেওয়ার ভাবে বলে, কত লোকজন এসেছেন, বউভাতের দিন আরও সব আসবেন। তোমার সমবয়সিরাও আছেন। আলাপ-পরিচয় করো, ভাল লাগবে—বেশ নতুন লাগবে—

ক্ষিপ্তকণ্ঠে অনীতা বলে, একটির সঙ্গে করেছি, ভূতি যার নাম। রক্ষে

কষো, একটিতেই শখ মিটে গেছে—পরিচয়ে আর দরকার নেই। কবে ছাড়া পাবো, ঠিক করে বলো তো আমায়। টিকতে পারছি নে, আষ্টেপৃষ্ঠে যেন চাবুক মারছে। বউ না হয়ে যদি মেয়ে হতাম, আর পথের এত হাঙ্গামা যদি না হত, এক্ষুণি ছুটে বেরুতাম।

মিহির বলে, মা উপস্থিত থাকলে সংসারের ধাঁচ অন্য রকম দেখতে পেতে। তিনি নেই বলেই যত গোলমাল—

কথা কেড়ে নিয়ে অনীতা বলে, নেই বলে তবু কিছু বাঁচোয়া।

মিহির উষ্ণ হয়ে বলে, মাকে একেবারে দেখ নি, এমন নয়। ঘরের বউ যখন হয়েছ, ভবিষ্যতেও অনেক দেখাশুনো হবে। মায়েব বিচারটা ততদিন না হয় মুলতুবি থাক।

অনীতাও তেমনি সুরে বলে, আমিও বলি তাই। ভবিষ্যতে কি হবে না হবে, সে কথা মুলতুবি থাক এখন। জগদ্দল-পাথর চাপা দিয়ে দম আটকে মেরে ফেলছ আমায়—ঠিক কবে বলো, কবে মুক্তি দেবে? কবে—কবে? বাবাব কাছে গিয়ে প্রাণ ভরে নিয়ে বাঁচব?

মিহির বেদনাহত দৃষ্টিতে তাকাল। বলে, ফুলশয্যা আজকে। চিরজীবনের মধ্যে এই একটা দিন আমাদের। তুমি মুখ ভার করে থেকো না অনীতা, কোনদিন তা হলে মনের এ-দাগ মুছবে না। এই দিনটা অন্তত হাসিখুশিতে বেড়াও।

তাই তো কবছি কাল এসে অবধি। এরা যেটুকু বোঝে, তাই বলছি। যে বকম পছন্দ করে, তেমনিভাবে চলে ফিরে বেড়াচ্ছি। এমন হাসছি, শ্বশুরবাড়ি পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেছি যেন একেবাবে! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, অভিনয়ে আমার খুঁত থাকে না। এতক্ষণের পর একটুখানি—এই দুটো মিনিট কেবল তোমাব সঙ্গে গ্রীনরুমে বসেছি সাজগোজ খুলে।

হঠাৎ অন্য কথা পাড়ে, বাবাব চিঠিপত্র এলো?

মিহির বলে, কালকেই তো রওনা হয়ে এসেছ। এর মধ্যে কখন তিনি চিঠি দেবেন, আর কখনই বা এসে পৌঁছবে?

চিঠি না আসুক, টেলিগ্রাম করলে তো এসে যেতো!

আকুল হয়ে সে বলে উঠল, অসুখ করেছে আমার বাবার—

সে কি ? কে বলল একথা ?

আসবার সময় বাবার চোখে জল দেখে এসেছি। ভাল থাকলে ঠিক তিনি খবর নিতেন।

মিহির অনীতার মুখে চেয়ে থাকে। মনে মনে এতক্ষণ যত ক্ষোভ-দুঃখ জমেছিল, সমস্ত জল হয়ে যায়। মেয়েটার মনের কথা খোলা-পাতা বইয়ের মতন মুহূর্তে সে পড়ে ফেলল। আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, কি পাগল তুমি! এই সমস্ত জুড়ে-গেঁথে মন খারাপ করছ? এতকাল মানুষ-টানুষ করার পর পরের ঘরে চলে এলে, বাবার চোখে জল তো আসবেই! সব বাপ-মায়ের আসে, আবার দু-দিন পরে সামলে নেবেন।

অনীতা বলে, আমার বাবার আর যে কেউ নেই!

মিহির বলে, বেশ ভাল আছেন তিনি। এই তো ঝড়ু-দা'রা একটু পরে ফুলশয্যার তত্ত্ব নিযে আসছে—ওদের কাছে খবর পাবে।

গভীর স্নেহে সে অনিতার চোখের জল মুছিয়ে দেয়। হঠাৎ খলখল হাসি কোন দিক দিয়ে—নিস্তারিণীর খোনা-খোনা গলা।

কে রে—দিন দুপুরে চোর ঢুকেছে নতুন বউয়ের ঘরে ?

দুপুরবেলাতেও বুড়ির বিশ্রাম নেই—লাঠি ঠুকঠুক করে নজর হেনে বেড়ান সর্বত্র। মিহির পিছন-দরজা খুলে এক লম্ফে বাঁশবনে লাফিয়ে পড়ল। আর অনীতা তক্তাপোশে পড়ে চোখ বুঁজেছে। একাইতো সে—কে আসতে যাবে তার ঘরের মধ্যে? এসে থাকে তো সে কিছু জানে না। সে ঘুমুচ্ছে।

আকাশের ঝোড়ো-কোণা কালো হয়ে গেছে। বাতাস বন্ধ। সন্ধ্যার দিকে ঝড় এলো। বাঁশের বেড়া খড়ের চালের এই পলকা ঘরটা অনীতাশুদ্ধ বুঝি বা উড়িয়ে নিয়ে যায়! অথবা ঘর-কানাচের বাঁশঝাড় আর তালগাছগুলো উপড়ে ঘরের উপর পড়ে জীবন্ত কবর-চাপা দেয় বুঝি!

ঝড় থামল তো তারপরে বৃষ্টি। আধভেজা হয়ে মিহির এসে দাওয়ায় উঠল। একলা আছি, সেইজন্যে দয়া হল নাকি—দুপুরবেলার রাগারাগির ফল? কিম্বা বাইরে যাওয়া হয়েছিল—বৃষ্টির মধ্যে ছুটতে ছুটতে এসে এই ঘরটা সকলের

আগে পাওয়া গেল ? কি বৃষ্টি, কি বৃষ্টি ! উঠানে এরই মধ্যে বিস্তর পরিমাণ জল জমে গেছে।

ঘরে দু-জন—মিহির আর অনীতা। এই দুর্যোগে নিস্তারিণী বুড়ি বেরিয়ে এসে আর মস্করা করতে পারছেন না। ভাল হয়েছে—বৃষ্টির জলে ঘরখানা বাড়ির ভিতরে আলাদা এক দ্বীপ হয়েছে যেন ! দু-জনে একেবারে একলা। বৃষ্টিবাদলা এমনি চলে আরো অনেকক্ষণ ! সমস্ত রাত্রি এবং পরের দিন, এবং তার পরের দিনও চলে !

মনের ভারবোঝা ঝড়বাতাসে উড়ে গেছে। মজা লাগছে খুব। দাওয়ায় বেরিয়ে এসে অনীতা হাত বাড়িয়ে দাঁড়ায়। চালের জল সহস্র ধারায় ছাঁচতলায় পড়ছে। অনীতার হাত ভরে ছাপিয়ে যাচ্ছে। দেহমন জুড়িয়ে গেল জলের ঝাপটায়।

মিহির ঘরের ভিতর থেকে দেখে হাঁ-হাঁ করে ওঠে, কি পাগলামি হচ্ছে—কাপড়চোপড় সমস্ত ভিজে গেল।

ভিজুক গে—

জরজারি হয়ে পড়তে পারে ঠাণ্ডা লেগে। অভ্যেস তো নেই। হোক গে জর—

ডাক্তার নেই কিন্তু এখানে। জঙ্গিপাড়ায় আছে, তা-ও হাতুড়ে গোবদ্যি—

অনীতা হেসে বলে, খাসা জায়গা তবে তো। ডাক্তার যখন নেই, রোগ হলে তবু বাঁচার আশা থাকে।

তুমি এ কথা বলো কি করে অনীতা ? যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল—ডাক্তারই তো যমের হাত থেকে প্রাণটুকু কেড়ে তাড়াতাড়ি চেঞ্জে পাঠিয়ে দিলেন। ডাক্তারের উপর তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

আছিই তো ! অনীতা থিয়েটারের ভঙ্গিতে বলে, ভিজিটের বাবদে হিয়া-মন-প্রাণ সমর্পণ করে বসে আছি। আর আমার কোন সম্বল নেই ডাক্তারবাবু—

ঝিলিক দিল সহসা, কড়কড় শব্দে কোথায় বাজ পড়ে। বৃষ্টি আরও চেপে এলো। ঘরের মধ্যে আঁধার গাঢ় হয়েছে। আরে, আরে—…উঁহু, কি করছে দু'টিতে বসে বসে—অন্ধকারে দেখব কি করে ?

আরও রাত হল। উঠানের ওধারের ডোবাটা জলে ভরতি। মকমক্‌ করে ব্যাঙ ডাকছে। কখনো একটু বা কমে, কখনো দুনো জোরে।

ফুলশয্যা জমল না। পাড়ার বউঝি আসে নি—আসবে কি করে? বাড়ির এরা ছাতা ধরে কোন গতিকে এ ঘরে এসে উঠেছিল—রীতকর্ম সেরেই চলে গেছে। দুর্যোগরাত্রে চোর-ছ্যাঁচোড়ের মজা, নিজের ঘর ফেলে বেশিক্ষণ থাকা চলে না। থাকবেই বা কি নিয়ে? না এসেছে মানুষজন, না জমে আমোদ-আহ্লাদ! কলকাতার বড়লোকের বাড়ি থেকে তত্ত্বতাবাসও কিছু এলো না যে তাই নিয়ে খানিক গুলতানি চালানো যাবে।

অনীতা বলে, বাবার অসুখ করেছে—নইলে ঝড়ুদা'রা এসে পড়ত।

মিহির বলে, আসবে কেমন করে? ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে টের পাচ্ছ না—কি কাণ্ডটা বাইরে চলছে! কুকুর-বিড়ালটা অবধি বেরোতে পারে না এমন ভয়ায়।

তোলপাড় বাইরে। নিশাচর-রাজ্যে বিপ্লব বেধেছে, সোঁ-সোঁ আওয়াজ হচ্ছে। বাতাসের বেগে ডালপালার ঝাপটা লাগছে বেড়ার গায়ে—ঠিক যেখানটায় এদের তক্তাপোশ। যেন কারা ধাক্কা দিচ্ছে বলিষ্ঠ হাজার বাহু দিয়ে। ভেঙে ফেলবে নাকি, বেড়া ভেঙে টুঁটি টিপে ধরবে? সন্ধ্যার দিকে রেড়ির তেলের দীপ জ্বেলে দিয়েছিল—তাই বাতাসে কখনো থাকে? নিভে যাওয়ার পরে হেরিকেন ধরিয়েছে। হাওয়ায় দপদপ করছে হেরিকেন। কালো ছায়া ঘরময় নড়েচড়ে বেড়ায়, বেড়ার উপর নাচে। বিকালবেলা আজ ছেলেপুলেদের মধ্যে বসে কন্ধকাটা ভূতের গল্প হচ্ছিল। কান্নাটা চোখ বড় বড় করে বড্ড জমিয়ে গল্প বলতে পারে। মাথা নেই কন্ধকাটা ভূতের—রাত দুপুরে তাদেরই গ্রামময় ছুটোছুটি করে বেড়ায়। বৃষ্টি বাদলায় গা বাঁচাতে তাদেরই এক-দল এসেছে বুঝি ঘরের মধ্যে! হাওয়ায় ভর করে বেড়ায়—বেড়ার মাথা আর চালের মধ্যে যে ফাঁক আছে, সেই পথে স্বচ্ছন্দে দলসুদ্ধ ঢুকে পড়তে পারে।

হাওয়ার দমকে হেরিকেনটাও নিভে গেল।

মিহির কেমন দেখ নির্ভাবনায় ঘুমুচ্ছে। অভ্যাস আছে ওদের, সাহস আছে। অনীতা আর চুপচাপ থাকতে পারে না—গায়ে নাড়া দেয়, ওগো, শুনছ? একবার ওঠো—

ঘুমোও নি তুমি ?

উঠে আলোটা জ্বালো—

ঠাণ্ডার মধ্যে জমাট ঘুম—আলস্য লাগে মিহিরের, উঠতে ইচ্ছে করে না। বলে, আলো কি হবে ? এই তো বেশ ! আমি রয়েছি, ভয় কিসের ?

জ্বালোই না আলো। বাইরে যাবো—

মুখ দেখতে পাচ্ছে না। কণ্ঠস্বর শুনে তাড়াতাড়ি মিহির আলো জ্বালল।

হয়েছে কি ?

মুখ-চোখের ভাব দেখে ভয় করে। শহরের মেয়ে—পাড়াগাঁয়ে আসে নি আর কখনো। কিন্তু এই একটি অনীতা শুধু নয়—এমন কতই বিয়েথাওয়া হচ্ছে, দিব্যি তারা মানিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছে।

অস্বাভাবিক উত্তেজনার স্বরে অনীতা বলে, বাবা এসেছেন—

কি বলছ ?

হ্যাঁ, স্পষ্ট শুনেছি বাবার গলা। বাবা ডাকছেন আমায়।

তক্তাপোশ থেকে নেমে মিহিরের হাত ধরে টেনে বলে, ঠিক, ঠিক ! বাবার গলা চিনতে পাবি নি আমি ? বাবাব যে কেউ নেই আমি ছাড়া ! ঝড়ু দা'র সঙ্গে বাবাও চলে এসেছেন। বাইরে চলো, দেখতে পাবে।

দরজা খুলে নামতে হল দাওয়ায। খোলা দাওয়ায় জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, মাটির মেঝে কাদা কাদা হয়ে গেছে। মিহির বলে, কই—কোথায় ? এত ঝড়জলে আসবেন কেমন কবে, আব কেনই বা আসতে যাবেন ?

অনীতা বলে পিছনের বাঁশতলাটা দেখে আসি চলো। আমি স্পষ্ট শুনেছি।

মিহির বিরক্ত হয়ে বলে, ইচ্ছে হয়—যাও তুমি। রাত দুপুরে পাগলের পাগলামিতে বৃষ্টি ভেজবার শখ আমার নেই।

রাগ করে মিহির ঘরে গিয়ে উঠল। অনীতা একলা কতক্ষণ দাঁড়াবে ? উঠোনে নামতে ভয় করে, জলের ঝাপটায় দাওয়াতেও দাঁড়ানো যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর ফিরে এলো। মিহির ইতিমধ্যে বিছানায় পড়ে আবার চোখ বুঁজেছে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে অনীতার চোখে আগুন ঝরে। আগুন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে নিভে গেল অশ্রুর ধারায়।

ভোরবেলা চেনা গলা পেয়ে অনীতা ধড়মড় করে উঠল। মোহিনী কাকে যেন জিজ্ঞসা করছে, বিয়ে-বাড়ি এই বটে? ঝড়ু বলছে, ঠিক এই—এ ছাড়া বাড়িই নেই এ-দিগরে।

দোর খুলে অনীতা বাইরে আসে। বড্ড কষ্ট হয়েছে তোমাদের। আহা, মুখ ফুটে বলতে হবে কেন—চেহারাতেই বুঝতে পারি।

তবু ঝড়ু মুখে কিছু না বলে সোয়াস্তি পায় না।

বাপ ঠাকুরদার পুণ্যি ছিল দিদিমণি, সেই জোরে বেঁচে এসেছি। বাপরে বাপ—পিরথিমে এত জায়গা থাকতে এদ্দুরে এই জায়গায় এসে ঘর তুলেছে এরা কোন সুখে?

চুপ, চুপ! এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে অনীতা ঝড়ুকে থামতে ইসারা করে। মোহিনী বলে, কর্তামশায় বরকনের সঙ্গে ফুলশয্যের মিষ্টি-কাপড় পাঠাচ্ছিলেন। তোমার যে বেশি পুলক ঝড়ু—কুটুম্ববাড়ি এসে নেমন্তন্ন খাবে—

ঝড়ু বলে, বাচ্চা খুকু চোখের উপর এত বড়টা হল—তার ঘরবাড়ি সংসারধর্ম দেখবার লোভ হয় না বুঝি? এখন দেখছি, না এলেই ভালো হত।

নিশ্বাস ফেলে আবার বলে, তোমার জন্যে একঝুড়ি ফুল নিয়ে এলাম দিদিমণি। ফুলের গয়না—মাথার মুকুট থেকে পায়ের তোড়া। কাপড়-চোপড় বরকনের সঙ্গে পাঠানো যায়—কিন্তু ফুল আগের দিন পাঠালে নষ্ট হয়ে যেতো। ফুলের জন্যেই আসবার বেশি গরজ—

অনীতা বলে, কই ঝড়ু-দা, ফুল কোথায়?

কাল পৌঁছুতে পারলাম না—বাসি হয়ে গিয়েছিল—তার উপর বৃষ্টির জল পেয়ে, দেখলাম, পচন ধরেছে। কি হবে, খেয়াপারের সময় গাঙের জলে ঝুড়িসুদ্ধ ঢেলে দিয়ে এসেছি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, তাই ভাবছি দিদিমণি, কত সাধ-আহ্লাদের বিয়ে তোমার—কোথা দিয়ে যেন সব ভেস্কি হয়ে গেল। এমনি জায়গায় এমনধারা তোমার ঘরবাড়ি, কোনদিন কেউ স্বপ্নে ভাবতে পারি নি।

অনীতা হাসিমুখে বলে, আমার শ্বশুরের ভিটে—এখানে দাঁড়িয়ে এসব কেন বলো ঝড়ু-দা? তোমাদের চোখে যা-ই হোক, আমার কাছে স্বর্গ—

মোহিনী যেন মুকিয়ে ছিল। অনীতার কথায় আরও জোর দিয়ে বলে, বটেই তো! ঝড়ু খারাপ দেখছে কিসে, জানি নে বাপু। দিব্যি গোয়াল-গোলা বাগান-পুকুর। আর যার হাতে দেওযা হয়েছে—সেই আসল মানুষটি তো সাক্ষাৎ শিবঠাকুর!

মিহির এলো। ঝড়ু বলে, ভালো আছ দাদাবাবু? সমস্তটা দিন কাল বড় কষ্ট গেছে। গাড়ি দেরি করে এলো। জঙ্গিপুর পৌঁছবার আগে থেকেই বৃষ্টি। দু-তিন ঘণ্টা কেটে গেল, বৃষ্টি আর কমে না। রাস্তায় এক-হাঁটু জল—

মোহিনী বাকিটুকু বলে দেয়, জলকাদায় আছাড় খেতে খেতে এসে দেখি খেয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আবার সেই অবস্থায় স্টেশনে ফিরে গিয়ে সারারাত ঠায় বসে মশা তাড়ানো। আমার যেমন হোক—বুড়োমানুষটার বড্ড কষ্ট হয়েছে, আছাড়ই খেয়েছে বার চারেক। সেই জন্যে ক্ষেপে গিয়েছে।

কুটুম্ববাড়ির লোক দেখে আরও অনেকে ঘিরে দাঁড়াল। ফুলশয্যার জিনিসপত্র নেড়েচেড়ে দেখছে। খানিকপরে ঝড়ুকে আলাদা ডেকে নিয়ে অনীতা জিজ্ঞাসা করে, বাবার কথা বলো ঝড়ু-দা। অসুখ করেছে?

অসুখ করবে কেন?

আমি নেই, সেইজন্য। এতগুলো বছরের মধ্যে কোনদিন তাঁর চোখের আড়াল হয়েছি? লুকিও না—বাবার কথা আমায় খুলে বলো।

ঝড়ু বিরক্ত হয়ে বলে, এসেছ তো পরশু—

পুরোপুরি দুটো দিন মাঝে গেছে—সে কি কম হল ঝড়ু-দা? পাহাড় ধ্বসে যেতে পারে, সমুদ্দুর উথলে উঠতে পারে, কত কি হয়ে যেতে পারে, তার মধ্যে! আসবার সময়টা বাবা ছোট ছেলের মতো কাঁদলেন। ঝগড়া করেন, রাগ করেন—তুমি তো চিরকাল দেখছ বাবাকে—অমনধারা জল দেখেছ কখনো তাঁর চোখে? মা যেদিন মারা যান—তোমরা তো বলো,

সেদিনও কাঁদেন নি, পাথর হয়ে বসেছিলেন। সেই বাবা আমার হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

ঝড়ু বলে, এখন বুড়ো হয়ে মন নরম হয়ে পড়েছে। তোমরা চলে আসার পরে সামলে নিয়েছেন। আছেন বেশ ভালো।

একটু হেসে আবার বলে, আরও ঢের ঢের ভাল থাকতেন, যদি ঐ দরদের ঠাকরুনটি অষ্টাঙ্গ মেলে চেপে না থাকত।

অনীতা স্তম্ভিত হয়ে বলে, পিশি দেখাশুনো করেন না বাবাকে? আমি এঁত করে বলে এলাম—

ঝড়ু মুখভঙ্গি করে বলে, হুঁ—দেখবেন! কালকেই সকালবেলা দেখি, টেবিলের উপর বাবুর খাবার যেমনকে-তেমন পড়ে রয়েছে—ছোঁন নি মোটে। রাত্তিরে কাঠ-কাঠ উপোস গেছে। তাই বলতে গেলাম, ডেকেডুকে খাওয়ালে না কেন পিশি? জানো তো, ঐ ধরনের ভুলো মানুষ—তার উপরে মনটা খারাপ হয়ে আছে! তা ফোঁস করে উঠল। মেয়ের বিয়ে হয়ে ঠাকরুন সাপের পাঁচ পা দেখেছে। দু-এক কথা হয়ে যেতে মুখের উপর বলেও দিল তাই। দায়ে পড়ে ঢের দাসীবৃত্তি-চেড়িবৃত্তি করেছি—এবার দেশে-ভুঁইয়ে চলে যাবো। খবরদারি করবার অন্য মানুষ দেখে নাওগে তোমরা।

ঝড়ুকে সামনে বসিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনীতা বাপের কথা শোনে। এই দুটো দিনের প্রতিটি মিনিটে যা-কিছু ঘটেছে। ঘটেছে কিছুই না—তবু বিশাল চোখদুটোয় বারম্বার জল টলটল করে। মুছে ফেলে, আবার ভরে যায়।

মিহির যথারীতি উধাও। অনীতা তাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অনেক পরে একসময় পাওয়া গেল। হাঁটু পর্যন্ত কাদা মাখা, জেলেপাড়া থেকে খালুইতে করে মাছ নিয়ে আসছে। কলকাতা থেকে ঝড়ুরা সব এসেছে, আর এই নূতন বউ—তা বলে এতটুকু সমীহ নাই। অনীতা সুড়ুৎ করে কাছে গিয়ে সকলের অলক্ষ্যে ফিসফিসিয়ে বলে, ঘরে এসো—

মিহিরের চমক লাগে। মাছ নামিয়ে রেখে কাদা-পায়েই ঘরে ঢুকে বলে, কি?

আমি চলে যাবো—আজকেই। বাবার বড় অসুখ।

মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সে বলল, সবাই ভাল আছেন।

অনীতা বলে, মোহিনী কি জানে? আমি বলছি—সে কথা বিশ্বাস হল না? ঋতুদাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। আর, বিশ্বাস তোমাদের হোক ভালো না হোক ভালো—আমি যাবোই।

মিহির বলে, সেটা কি ঠিক হবে? বুধবারে বউভাত, যোগাড় যন্তোর হয়ে গেছে—

অনীতা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, আমার বাবা মরে যাবেন আর বউভাতের মচ্ছব করব এখানে বসে বসে? অনাচারি ম্লেচ্ছ মেয়ে—চান করে এসেও পুজোর ফুল ছোঁওয়া যায় না—সে হল ন্যাকি বাড়ির বউ! তার হাতে ভাত তুলে দিয়ে বউভাত হবে! এই তিন দিন যে বউ সেজে থাকতে দিয়েছে—বাড়ির গিন্নির অভাবে কেউ গলাধাক্কা দিয়ে বের করতে পারছে না, সেই জন্যে। বাবা কেঁদে কেঁদে উপোস করে গলা শুকিয়ে মরে যাচ্ছেন—কিসের লোভে, কি আনন্দে, কোন অধিকারে তোমাদের পাপচক্রে আমি ঘুরে বেড়াব?

মিহির মরমে মরে গিয়ে বলে, পাপচক্র বলছ অনীতা। কিন্তু আমার বাপ ঠাকুরদা'রা জীবন দিয়ে এই সংসার গড়ে গেছেন—মায়ের এত পুণ্যের লোভ, তবুও সংসার ফেলে সোয়াস্তিতে তিনি দুটো দিন তীর্থবাস করতে পারেন না—

অনীতা রুক্ষকণ্ঠে বলে, সেই প্রত্যাশা আমার কাছেও নাকি—সমস্ত ছেড়েছুড়ে আমিও তেমনি তোমাদের সংসারের ঘানি ঘোরাবো? দ্বীপান্তরে এনে ফেলেছ। বাবার কাছে যাবো—নানান অজুহাতে এখন ছুটি নামঞ্জুরের চেষ্টা। এত সব মতলব বিয়ের আগে ঘুণাক্ষরে জানতে দাও নি তো!

বিয়ের পরে সব মেয়েই শ্বশুরঘর করে, তার জন্য আগেভাগে চুক্তিপত্র করতে হয় না—

ব্যঙ্গের হাসি হেসে অনীতা বলে, সে নাকি এমনি শ্বশুরঘর। বাইরের বৃষ্টি থামে তো ঘরের বৃষ্টি থামে না—টুপটাপ বৃষ্টির জল ঝরছে তো ঝরছেই। আবরু বলে বস্তু নেই—অচেনা আগন্তুক বলে নেই এতটুকু দয়ামায়া কি সৌজন্যবোধ! মেয়েদের আছে সকাল-সন্ধ্যা রাঁধাবাড়া আর পরনিন্দা-পরচর্চা। পুরুষদের একহাঁটু কাদা ভেঙে হাটবাজার করে বেড়ানো, গরুর জাবনা দেওয়া, ভুঁই কোপানো। এমন করে মানুষ থাকে না, থাকতে পারে জন্তুজানোয়ার পোকামাকড়—

মিহির বলে, বাবার জন্যে তোমার মন ভাল নেই অনীতা। এসব আলোচনা থাক। বরঞ্চ ভেবে দেখা যাক, কি করা যেতে পারে এই অবস্থায়—

কিন্তু অনীতা থামে না। পাহাড় থেকে ঢল নেমে আপন বেগে ছুটেছে, রোধ করার শক্তি কার এখন? বলে, আর কিছু না হোক, অত বড বাপের আমি এক মেয়ে—বিস্তর বড বড় সম্বন্ধ এসেছিল সেজন্য। বাইরের লোকে যা-ই ভাবুক, পিশি যত দেমাক করে বেড়াক—তোমার অন্তত আন্দাজ করা উচিত, দিদিকে এমনি-এমনি পছন্দ করে নি অলক, ফন্দিফিকির করতে হয়েছিল।

মিহির ঘাড নেড়ে বলে, সে জানি আমি। আন্দাজ নয়, ভালো ভাবেই জানি। অর্থটা ভেবে দেখতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার খুব কঠিন হওযা উচিত ছিল—পেরে উঠলাম না। কেমন এক নেশায আমিও আচ্ছন্ন হযে গেলাম। কিন্তু তুমি আমাদের অবস্থা জানতে—আমার বেশভূষা-চালচলন দেখে নিতান্ত গোমুখ্যুও বুঝে নিতে পারে! আমাব মা সেই প্রথম দিনেই খুলে বলেছিলেন তোমাকে। আমিও কিছু গোপন করি নি।

অনীতা বলে, গোপন কেন থাকবে? বাবা নিজে এসে দেখে গিয়েছেন। উকিল মানুষ তিনি—দশজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও জেনে বুঝে গেছেন। দেখেশুনেই তো আরো আগ্রহ হল। এবাড়ি বউ এনে তোলাব জায়গা নেই—থাকতে হবে তাই কলকাতায। এত সম্বন্ধ ছেড়ে দিয়ে এইখানে পছন্দ—বাবাব কাছছাডা হতে হবে না বলেই। তোমাব বেলাতেও তাই। এম.এস-সি. পাশ করে প্রফেসারি করো কিম্বা চাকরিতে ঢোক, সে-ও কিছু কলকাতার বাইবে নয়—

মিহির বলে, ভাগ্যবশে বড়-ঘরে বিয়ে হল বলে ঘরসংসার আত্মীয়জন ছেড়ে আমাকেও শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠতে হবে?

অনীতা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, ঘর মানে এই বাঁশের বেড়া আর ফুটো চাল! আর, মা বৃন্দাবনবাসী হযেছেন—সংসার- বলতে এখন একপাল এই হিংসুটে পরগাছার দল। শ্বশুরবাড়ি খারাপ হবে না এর চেয়ে! এবারে দারোয়ানের খোপে নয়, উপরতলায় সব চেয়ে ভালো ঘরে—

অনেক দযা তোমাদের!

নিস্তব্ধ হয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর শান্তকণ্ঠে বলে, জজিপাড়া থেকে একটার গাড়ি ধরলে সন্ধ্যে নাগাত কলকাতা পৌঁছনো যাবে। তা হলে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে এখান থেকে রওনা হতে হয়। আর এক হতে পারে, সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে ভোরে কলকাতা পৌঁছানো। আমি বলি, মিছে দেরি করে লাভ নেই। আরো কয়েকঘণ্টা কষ্টভোগ—তার চেয়ে তড়িঘড়ি চলে যাওয়াই ভালো।

কথাটা জানাজানি হতে সোরগোল পড়ে গেল। মোহিনী বলে, সে কি দাদাবাবু? বউভাতের কি হবে তা হলে? কর্তামশায়ের অসুখ—ঝড় এমন কথা বলে কি করে? আসবার সময়টাও দেখেছি তাঁকে—ফটক অবধি এগিয়ে এলেন। তিনি আরো বললেন, বউভাতের পরে বেশি যেন দেরি হয় না। মেয়ে-জামাই জোড়ে যেতে হবে, তা-ও বলে দিলেন।

ঝড়ুর কাছে গেলে, এত লোকের জেরায় পড়ে সে আমতা-আমতা করে। অসুখ হয়েছে বই কি বাবুর—বিষম অসুবিধার মধ্যে আছেন। তবে যোগাড় যন্তোর হয়ে গেছে যখন, বউভাতটা চুকিয়ে যেতে হয়। তিন-চারটে দিনে কি আর হবে?

গতিক বুঝে অনীতাও নরম হয়েছে। একলা মিহির কেবল লড়ে বেড়াচ্ছে বাড়িশুদ্ধ সকলের সঙ্গে। নানারকম বিদ্রূপ-কথাও শুনতে হচ্ছে, তা সে কানে নেয় না।

তাড়াতাড়ি গোছগাছ করে নাও ঝড়ু-দা। পারুলকে বলে, চাট্টি ভাতে-ভাত চাপিয়ে দাও তুমি বউদি। ধরতেই হবে একটার ট্রেন। ভয়ঙ্কর অসুখ সত্যিই—বীরেশ্বর-কাকার কাছে টেলিগ্রাম এসেছে, তিনি সেটা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এমন ভাব জবরদস্তি করে সে-ই যেন পাঠিয়ে দিচ্ছে অনীতাদের।

বাবাকে দেখে নি তিনদিন। গাড়ি থেকে নেমে অনীতা ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল বাপের কাছে। কি করবে, খানিকক্ষণ ভেবেই পায় না। দু-হাতে গলা জড়িয়ে ধরে। গলা ছেড়ে দিয়ে নাচুনে ভঙ্গিতে ঘুরে নেয় এক পাক।

হিমাংশু বলেন, সিঁথেয় সিঁদুর দিয়ে খাসা চেহারা খুলেছে আমার বেবির। মাথার উপর কাপড় তুলে পুরোপুরি বউ হয়ে দাঁড়া—দেখি, কেমন দেখায়!

অনীতা শ্খলন করে, ইঃ—বউ দেখবার শখ হল এখন! আচ্ছা বাবা, সন্ধ্যে থেকে বাড়ি বসে বসে কি করছিলে তুমি? ক্লাবে যাও নি কেন?

ক্লাবে যেতে দিতে তুই-ই তো নারাজ বেবি—

নারাজ হই যা-ই হই, কবে শুনেছ আমার কথা? ঝগড়া করে খোশামুদি করে কিম্বা পালিয়ে পালিয়ে ঠিক গিয়ে ক্লাবে উঠেছ। তিনটে দিন আমি নেই—সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে অমনি ব্যোম-ভোলানাথ!

হিমাংশুরও এতক্ষণে খেয়াল হল। তাই তো রে! তিনদিনে কি করে এলি তুই শ্বশুরবাড়ি থেকে?

পাল্কি নৌকো তারপরে রেলগাড়ি আর মোটরগাড়ি চড়ে। এমন জায়গায় বিয়ে দিয়েছ বাবা একযাত্রায় সব রকম গাড়ি চড়া হয়ে যায়।

ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, তিন দিনে এসেছি বলে মুখ অমন করছ—ভেবে রেখেছিলে বুঝি যে বনবাসে পাঠিয়েছ, তিন বছরের আগে ফিরে আসব না! আর তদ্দিন বেশ সমস্ত রাত্তির উপোস করে বারাণ্ডায় ঘুরে বেড়িয়ে মজায় মজায় কাটিয়ে দেবে—উঁ?

বুধবারে বউভাত যে তোর! আমার কাছেও নেমন্তন্ন-চিঠি পাঠিয়েছে—

অনীতা সহজভাবে বলে, আবার চিঠি পাঠিয়ে দেবে—হল না এখন বউভাত।

হিমাংশু বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। কথা শুনছেন, কিন্তু বুঝতে পারেন না একবর্ণ। বললেন, কি কাণ্ড করে এলি, বল্ দিকি সমস্ত খুলে। সমাজ-সামাজিকতার ব্যাপার ছেলেখেলা নয়। দশের চোখে ওরা খাটো হয়ে যাবে, লোকে হাসিতামাসা করবে। তোর শাশুড়ি উপস্থিত থাকলে হয়তো সামলে নিতে পারতেন। মিহির ছেলেমানুষ···আরে, তারও তো আসবার কথা—কোথায় সে? ঝড়ুটাই বা কোন দিকে পালাল?

ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়ে অনীতাও সারা পথ এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে এসেছে। তিনটে দিন কাটিয়েছে, আরও তিন-চারটে দিন দাঁত কামড়ে পড়ে থাকতে পারত না কি? হতে দিলেন না বাবা-ই। না খেয়ে না ঘুমিয়ে বুড়োমানুষটা সমস্ত রাত নিশিপাওয়ার মতো ঘুরে বেড়ান—এই দেখ না, ক্লাবে না গিয়ে চুপচাপ মুখ গুঁজে ঘরের মধ্যে বসে। একটু আগে এক পশলা

কান্নাও হয়ে গেছে হয়তো! গণ্ডগোলের মূলে হলেন ইনি, আবার এখন পরকে দুষছেন।

অনীতা বলে, তোমার অসুখ—তার মধ্যে ভালো লাগে বউভাতের আমোদস্ফূর্তি?

হিমাংশু রাগ করে বলেন, কে বলেছে আমার অসুখ?

অনীতাও ঝাঁঝালো সুরে বলে, কেউ বলে দেবে তবে আমায় জানতে হবে? চেহারা কি হয়েছে, দেখ তো আয়না ধরে! অসুখ হয়েছে কি না হয়েছে, তুমি তার কি বোঝ? কানাকড়িও দাম দিই নে আমি তোমার কথার—

বেশ, ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে দেখুক—

নিজে দেখি তো আগে—দেখেশুনে যা করবার করি। ধাপ্পা দিয়ে কেউ আমার কাছে পার পাবে না, অত সোজা মেয়ে নই—

গরগর করতে করতে সে নিজের ঘরে ছুটল।

ভাঁড়ার ঘরের সামনে কমলবাসিনী আর মোহিনী। হাতমুখ নেড়ে মোহিনী কুটুম্ববাড়ির কথা বলছে, কমলবাসিনী পা ছড়িয়ে বসে কটকি-যাঁতিতে সুপারি কুচাতে কুচাতে শুনে যাচ্ছেন।

সে কি কাণ্ড পিশিমা! গাঙে তুফান—ঢেউয়ের পর ঢেউ যেন গিলে খেতে আসে। নড়বড়ে খেয়ানৌকা, আমার বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করছে। এই বুঝি যাই সবসুদ্ধ জলের নিচে। গাঙ পার হয়ে তারপরেও যাচ্ছি। পথ আর ফুরোয় না। জঙ্গল এঁটে আসছে—লোকালয় ছেড়ে বাঘ-ভালুকের রাজ্যে চললাম নাকি? একটা মানুষও দেখতে পাই নে পিশিমা, যে জিজ্ঞাসাবাদ করে নেবো—

সুপারির কুচি পানে মুড়ে কমলবাসিনী একটা মুখে ফেললেন, আর একটা দিলেন মোহিনীকে। পান-ভরা মুখে অস্পষ্টকণ্ঠে বললেন, পথের অত ব্যাখ্যান করছিস কেন রে—পথে তো বসত করতে যাচ্ছে না মেয়ে। বাড়ি-ঘরদোর কেমন দেখে এলি, তাই বল্—

মোহিনী হেসে দু-হাত সামনে ঘুরিয়ে বলে, অট্টালিকা পিশিমা, রাজা-মহারাজারা যে-রকম জায়গায় থাকে। কোথায় লাগে তোমার জামাইয়ের

বাড়ি! গায়ে-হলুদের তত্ত্ব নিয়ে লেকরোডে গিয়েছিলাম—তাঁদের বাড়ির সামনে মোটরগাড়ি। আর ওনাদের দুয়োরে হাতি। হি-হি-হি—হাতি শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে।

পিচ কেটে মোহিনী বলতে লাগল, নিতান্ত মিথ্যে নয় পিশিমা। যা চেহারা গাইগরুগুলোর—এক-একটা হাতিই যেন! ওনারা থাকেন বটে চালাঘরে, কিন্তু খাওয়াদাওয়া ভালো। তেমন জিনিস আমরা খেতে পাই নে।

কমল নিশ্বাস ফেলে বলল, দাদা হাত-পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দিলেন জেদাজেদি করে। জেদ ছাড়া কি বল্! ভালো পাত্তোরটা ফসকে গেল তো যাকে সামনের মাথায় পাও, ধরে নিয়ে বরের পিঁড়িতে বসাও। একই দিনে দুটো বিয়ে না হলে সৃষ্টি যেন রসাতল যেত! সেই যে গল্প শুনে থাকিস—ঘুঁটেকুড়ানির ছেলেকে ঐরাবত-হাতি শুঁড়ে তুলে নিয়ে রাজতক্তে বসাল, এ-ও হল সেই বৃত্তান্ত।

মোহিনী বলে, বলিহারি কপাল মাস্টার-ছোঁড়ার! ছুঁচ হয়ে ঢুকে কেমন ফাল হয়ে বেরিয়ে পড়ল। অলকবাবু না বিগড়ালে চোদ্দপুরুষ ধরে মাথা খুড়েও এ-বাড়ির জমাই হতে হত না।

অনীতাকে দেখে থতমত খেয়ে চুপ করল। কমলবাসিনী বলেন, এই যে না! আমি গিয়েছিলাম উপরে—দুয়োর বন্ধ করে তখন তুই কাপড়চোপড় ছাড়ছিলি। মোহিনীর কাছে শুনছিলাম—মনটা বড় ব্যস্ত হয়ে আছে কিনা!

অনীতা তিক্ত কণ্ঠে বলে, তা একেবারে এক্ষুণি কেন পিশি? সারা জীবন পড়ে রইল হা-হুতাশ করবার! বাবার খাবারটা নিতে এসেছি। তোমরা ব্যস্ত রয়েছ—আমি নিয়েথুয়ে টেবিলে দিচ্ছি।

মোহিনী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। কেন দিদিমণি, ব্যস্ত আবার কিসের? জল পুরে নিয়ে যাচ্ছি—টেবিলটা মুছে দিইগে আগে।

কমল হাঁক দিয়ে ওঠেন, দাদার খাবারের কি হল ঠাকুর?

ঠাকুর বলে, লুচি হয় নি এখনো—

অনীতা রান্নাঘরের দরজায় চলে গেছে। আগুন হয়ে বলে, ক'টা বাজল, খেয়াল আছে? কেন হয় নি, জিজ্ঞাসা করি? না খেতে দিয়ে বাবাকে মেরে ফেলবার জন্য তোমাদের রাখা হয়েছে?

ঠাকুর বলে, কি করব দিদিমণি, একখানা হাতে সমস্ত করতে হচ্ছে। ফাঁক-মতো ময়দাও মেখে রেখেছি, কেউ একটু বেলে দিলে হয়ে যেতো। মোহিনী এসে চান-টান করতে কলঘরে ঢুকল—পিশিমাকে এত করে বললাম, কখন সে বেরুবে—বাবুর যুগ্যি আপনি ক-খানা বেলে দিন। তারপরে আমিই সমস্ত করে নেবো, নয় তো চানের পরে মোহিনী এসে করবে। তা কানেই নিলেন না পিশিমা। তারপরে মোহিনী কল থেকে বেরুল তো তাকে নিয়ে আর পানের ডাবর নিয়ে বসলেন।

কমল গর্জে ওঠেন, মোহিনীর কাজ আমি করব—মোহিনী আর আমি এক হলাম নাকি? শোন আস্পর্ধার কথা! আবার তাই নিয়ে লাগানি-ভাঙানি হচ্ছে—

থামো পিশিমা—

গলার স্বরে ঠাকুর অবধি চমকে ওঠে। অনীতা অমন সুরে কখনো বলে না বড়-ছোট কারো সঙ্গে। বলতে লাগল, আমার বাবার চেয়ে কেউ বড় নয়—বাবার কাজ সকলের আগে। নিজে তুমি না করতে চাও, রসালো কথা-বার্তায় মোহিনীকে টেনে বসিয়ে কাজ পণ্ড করবে কেন? অন্যায় করেছ, আবার হুমকি দিচ্ছ ঠাকুরের উপর!

আর যাবে কোথা? ঝড়ু যা বলেছিল—মেয়ের বিয়ের পর এখন আর এক মূর্তি। গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মতো উঠোনে ছিটকে পড়ে কমল তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন, তুমি গালাগাল দিচ্ছ চাকরবাকরের হয়ে? জানি গো জানি—জ্বালাটা কোথায় বুঝতে পারি। পেয়ারের বন্ধুবান্ধব এলে, তাই বুঝেই তো মেয়েটাকে বের হতে দিতাম না। আমি কি আমার মেয়ে কখনো কিছু বলতে গিয়েছি অলককে? আমাদের দোষ তবে কোথায়?

অনীতা বলে, দোষ আমার—আমার এই ময়লা চেহারার। বিশ্বসুদ্ধ লোক তা জানে। অত চেঁচিও না, পায়ে ধরছি—তুমি থামো। বাবার কানে যাবে। এমনি যা হয়েছে, তার উপর দুঃখ আর দিও না ওঁকে। দয়া করো—

কিন্তু থামে না কমল।

মায়ায় জড়িয়ে পড়ে আছি, তাই। না খেতে পেয়ে এসেছি নাকি

তোমাদের বাড়ি? আমার কত জমি-জিরেত আওলাত-পশার বারোভূতে খাচ্ছে। ভাসুর-দেওররা রেগে টং—চিঠির পর চিঠি লিখছে। তা যার জন্যে চুরি করি, সে-ই বলে চোর! চলে যাবো আমি পাকিস্তানে—এই মাসের মধ্যে যাচ্ছি। সকালেই চিঠি লিখে দেবো।

ঝড়ু কোথায় ছিল, ছুটে এসে পড়ে। বলে, যাও তাই। কন্যে-দায় চুকে গেছে, কোন মধুর লোভে আর পড়ে থাকবে? গেলে বাঁচা যায়। তবু সকলে বুঝেসমঝে চলবে, দিদিমণি না থাকলেও খানিকটা দেখাশুনো হবে বাবুর। দরদের বোন হয়ে ঐ যে আগলে থাকো আর মিষ্টি মিষ্টি বুলি ছাড়ো, ওর মধ্যে অন্য কারো সেঁধোবার জো থাকে না।

অনীতা তাড়া দেয়, আঃ—ঝড়ু-দা হচ্ছে কি বলো তো? যাও তুমি এখান থেকে। এই চেঁচামেচি কোনদিন ছিল না এ সংসারে! ঐ যে—বাবা যেন উপরে উঠে এসেছেন। থামবে কিনা বলো তোমরা—

চিৎকার থামিয়ে কমলবাসিনী হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলেন। অনীতা রান্নাঘরে ঢুকে লুচি বেলতে বসল।

মোহিনী তাড়াতাড়ি গিয়ে পড়ে। সরো দিদিমণি, তুমি পারবে না—

তীব্রস্বরে অনীতা বলে, কুটুম্ববাড়ি দুঃখকষ্ট পেয়ে এসেছিস—তুই খানিক শুয়ে নিগে এখন। গরিবঘরে পড়েছি, এসব কাজ পারতে হবে আমায়—

চলে যাবেন কমলবাসিনী। এই ক-দিন ঠাকুরের রান্নাও খাচ্ছেন না, নিজে আলাদা ভাতে-ভাত ঘুঁটে নিচ্ছেন। তারও চাল-তরকারি আনাচ্ছেন নিজের পয়সা দিয়ে। এদের বাড়ির খড়কেটাও আর দাঁতে ঠেকাবেন না। পাকিস্তানে ভাসুরকে চিঠি দিয়েছিলেন, জবাব এসে গেছে।

সেইদিন সকালবেলা ফটকের সামনে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। অনীতা উপর থেকে দেখে, সাজসজ্জায় ঝলমল কোন এক রাজেন্দ্রাণী এসে ঢুকল। কাছে এসে অবাক। ওমা, সীতা যে! দিল্লি থেকে সীতা চলে এসেছে। চাওয়া যায় না তার দিকে, বিদ্যুতের মতন জ্বলছে।

ও বাবা, দিদি এসেছে। ও পিশি, দিদি কেমন হয়ে এসেছে দেখ। কালকেও তোর চিঠি এলো—তাতে আসার কথা নেই। হঠাৎ চলে এলি যে বড়!

সকলে এসে দাঁড়িয়েছে। গয়নার শিঞ্জন তুলে সীতা ধীরে ধীরে এসে কমল ও হিমাংশুর পায়ে প্রণাম করল।

অনীতা বলে, তুই তো দিদি আমার! দাঁড়া—তোর পাওনাটাও শোধ করে দিই।

পা ছুঁতে গেলে সীতা জড়িয়ে ধরল তাকে। হিমাংশু বলেন, কখন এসেছিস রে?

এই তো মামা, সোজা এই আসছি। মা পাকিস্তানে চলে যাচ্ছেন—সেই চিঠি গিয়ে পৌঁছল কাল। চিঠি পড়েছে আবার শাশুড়ির হাতে। তিনি বললেন, মায়ের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে—এক্ষুণি চলে যাও। রাত দশটায় নাইট-প্লেনে উঠে ভোরবেলা দমদমে নেমেছি।

বাঃ-বাঃ, বড় ভালো হয়েছে। উল্লাস প্রকাশ করে হিমাংশু আবার অফিসঘরে ঢুকলেন।

অনীতা বলে, একা নাকি ?

সীতা মুচকি-মুচকি হাসে। একা ছেড়ে দেবে, সেই পাত্তোরই বটে !

স্বামীসোহাগিনী আনন্দে থই পাচ্ছে না যেন। অনীতা চেঁচিয়ে উঠল, ও বাবা জামাইবাবুও এসেছেন। কোথায় রে ? ট্যাক্সি তো চলে গেল— কোথায় তিনি লুকিয়ে বসে রইলেন ?

সীতা বলে, লেকরোডের বাড়ি গেছে। লজ্জা করল বোধ হয়, সোজা এসে শ্বশুরবাড়ি উঠতে। থাকবার জো নেই—দুপুর নাগাত দেখিস ঠিক এসে পড়বে।

কমলবাসিনী সেদিকে আসছিলেন। শেষ কথাগুলো কানে গেছে, তিনি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, না—আসতে হবে না তার এ-বাড়ি। তুই-ই বা এলি কেন ? খবর পেলে আমি পথে দাঁড়িয়ে তোদের সঙ্গে দেখা করে আসতাম।

মা !

'মা' বুলি অতি মধুর—কিন্তু আজকের এই ডাকে যেন আগুনের হল্কা বয়ে গেল। এমন ঝাঁজ সীতার কণ্ঠে—বিয়ের পর মেয়েও এক আলাদা মানুষ হয়ে এসেছে। চমকে যান কমলবাসিনী। ক্ষীণস্বরে বলেন, জানিস নে তো সমস্ত ব্যাপার—

কিন্তু এটা জানি মা, এই বাড়ির উপর দাঁড়িয়ে অমন কথা উচ্চারণ করলে আমাদের মুখে পোকা পড়বে। তা-ও বুঝি নয়—পোকা-মাকড়েরও ঘেন্না আছে।

কমলবাসিনী সুড়সুড় করে নিজের ঘরে ঢুকলেন। সীতারা উপরে গেল। সীতার হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মোহিনী গয়না দেখে, মুখ উঁচু করে তুলে গলায় কত রকমের আছে, দেখে। নাড়াচাড়ায় হীরা-মুক্তা ঝিকমিকিয়ে ওঠে।

এত দিয়েছে ?

রকমসকম দেখে সীতার হাসি পেয়ে যায়। অনীতাকে বলে, শাশুড়ির কাণ্ড ! বিষম খেয়ালি। গোড়ায় নাকি খুব চটেছিলেন—কোথাকার কোন হতচ্ছাড়ি ঘরের বউ হয়ে আসছে। তারপরে কটা রঙের দৌলতে কি আর কোন গুণে জানি নে, নজরে লেগে গেলাম। আর রক্ষে নেই।

অনীতা বলে, কটা রং শুধু? দেবীপ্রতিমার মতো এমনি গড়ন, এই নাক-চোখ-মুখ—কলকাতা শহরে তা-বড় তা-বড় রূপসী মেয়ে তো আছে—ক-জনের সাহস আছে, দাঁড়াক দেখি আমার দিদির পাশে!

সীতা তাড়া দিয়ে ওঠে, বাজে বকবি নে। এতদিন মুখ বুজে সয়ে এসেছি—আর নয়। দেখলি নে, মা'কে কি রকম তাড়া দিয়ে উঠলাম। নইলে কি সামলানো যায় তোদের? এই মোহিনী, ঢের হয়েছে গয়না দেখা—নিজের কাজে চলে যা দিকি! গায়ের ভারবোঝা নামিয়ে আরাম করি—

গয়না খুলে খুলে সীতা টেবিলের উপর রাখছে। বলে, শাশুড়ি তাঁর বিয়ের সময় থেকে যত গয়না জমিয়েছেন, সমস্ত ধরে ধরে আমায় পরিয়ে দিলেন। পরিয়ে তারপর সামনে দাঁড় করিয়ে তাকিয়ে থাকেন। লোকে যেমন ছবি দেখে। লজ্জায় মরে যাই, ভাই! দিনকতক কেটে গেলে অবশ্য খানিকটা রেহাই পেলাম। কিন্তু দেখ্ না, এসেছি একটা দিনের জন্য—আসবার সময়টা আবার সাজাতে বসে গেলেন।

এ-বউকে সাজিয়ে সুখ আছে যে দিদি, তাই সাজায়। বড্ড ভালো হয়েছে—তোর সাজসজ্জায় সুখসৌভাগ্যে পিশির আনন্দের অবধি নেই। কিছু না বললেও তাঁর মুখ দেখে বুঝি। এতই তো বকলি, বেকুব হলেন—মুখ কালো হল না তবু একটু।

গয়না ও বেনারসি ছেড়ে অনীতার একখানা সাদামাটা শাড়ি পরে সীতা সুস্থির হল।

মোটে একটা দিন থাকবি কেন রে দিদি?

ইচ্ছে তো করে অনেকদিন থাকতে—কিন্তু উপায় নেই। আবার কোন মরুভূমিতে নিয়ে তুলছে—তার জন্যে গোছগাছ আছে। একেবারে ভিন্নরাজ্যে চলে যাওয়া—চাট্টিখানি কথা নয়!

তারপর অনীতাকে জিজ্ঞাসা করে, তোর শ্বশুরবাড়ি থেকে কি দিল রে?

অনীতা বলে, গরিব মানুষ—কি আছে তাদের যে বউকে দেবে?

সীতা লজ্জা পায়। অত শত ভাবে নি—সহজ কৌতূহলের বশে জিজ্ঞাসা করেছিল। বলে, খুব যে ঠেশ দিয়ে দিয়ে বলছিস—

অনীতা বলে, হিংসের জ্বালায় বেরিয়ে যায় দিদি। হায় রে

আমায় লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে তোকে পছন্দ করে নিল—হিংসে হবে না ?

সীতা রেগে যায়, দেখ্—আমি মা নই, মোহিনীও নই। পাড়াগাঁ থেকে এসেছিলাম—জেনে বুঝেও সাহস করে কিছু বলতে পারি নি। আমি কি চেয়েছিলাম এসব ? এত ঐশ্বর্য এত সুখ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি ? নিজে এক কীর্তি করে বসে এখন শোনাচ্ছেন আমায় !

গলা ধরে আসে, কথা আটকে যায়। সামলে নিয়ে আবার বলে, সইব না আর মুখ বুজে। দিদি হই তো আমি—চড় মারব, গাল টিপে ধরব অনন্যধারা বলিস যদি আর কখনো। কে কাকে কি ভাবে পছন্দ করায়, সমস্ত জানি রে ! অন্যের কাছে অভিনয় করগে যা, আমার চোখে ধুলো দিতে পারবি নে।

অলক এসে গেল। তার একটু পরেই কমলবাসিনী রওনা হয়ে যাচ্ছেন।

সীতা একবার বলে, না-ই গেলে মা !

কেন ? কমল মেয়ের দিকে ভ্রূকুটি করলেন। মিথ্যে ভয় পেয়ে তখন চলে এসেছিলাম। পাকিস্তানের মানুষ খুব ভালো—কোন গোলমাল নেই সেখানে। নিজের দাপটের জায়গা ছেড়ে কি জন্যে এখানে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে থাকতে যাবো ?

সীতা বলে, আমরা এসেছি—আজকের দিনটা থাকো নেহাত।

তোরা তো ভোরেই চলে যাচ্ছিস। তোর ছোট-কাকা নৌকো নিয়ে দৌলতপুর স্টেশনে থাকবে। নৌকো ফেরত গেলে মহা মুশকিল—তারাও চটে যাবে। এক বুঝতাম, দু-পাঁচদিন থেকে যাবি, লজ্জার মাথা খেয়ে তোদের লেকরোডের বাড়ি গিয়ে উঠতাম। জামাইয়ের ভাত খাবো, তবু এদের ভাত নয়।

অনীতা এসে কাতর হয়ে বলে, কী যে করি পিশিমা ! আমার এক বিষম দোষ, যা মুখে আসে ট্যাস-ট্যাস করে বলে যাই। সামলাতে পারি নে। এই জন্যে কেউ আমায় দেখতে পারে না।

কমল বলেন, ভগবান ঐশ্বর্য দিয়েছেন—সবই তোমাদের মানায় মা। ছোটমুখে বড়কথা শোনবার জন্যেই আমাদের সংসারে আসা।

বাবার একটু অযত্ন-অবহেলা হয়েছে কি আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। কোন রকম কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আমায় তুমি জলবিন্দু না খেতে দিয়ে রাখো—হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করব, কিন্তু নিজের ব্যাপারে রাগ কিছুতে করব না।

কমলবাসিনী উত্তপ্ত কণ্ঠে বলেন, তিনটে দিন তুমি ছিলে না—তার মধ্যে তোমার বাপকে না খাইয়ে অর্ধেক মেরে ফেলেছি! কিন্তু চলে যাচ্ছি তো বাপু, এখন আর কেন কলঙ্ক দাও? এই মেজাজে পরের ঘর করতে পারবে না, সে জানি—তুমিই চিরকাল বাপের বাড়ি পড়ে থেকে ষোলআনা যত্নআত্তি কোরো।

মোহিনীকে বলেন, একটা রিক্সা ডেকে আন মা—শিয়ালদহ স্টেশনে নিয়ে যাবে।

অনীতা বলে, আমাদের গাড়ি না চড়বে তো ট্যাক্সি ডেকে আনুক অন্তত। জামাইবাবু ও-ঘরে—বাইরের মানুষের সামনে বাবার মাথা হেঁট করে লাভ কি? আমার দোষ—বাবা তো কিছু করেন নি!

কমল চুপ করে রইলেন। অনীতা আবার বলে, বাবা কোর্ট থেকে আসুন। তাঁকে একটু বলে যাবে না পিশিমা?

বলাই আছে একরকম। দিনে-রাতে পাকিস্তানের একখানা গাড়ি— আরো লম্বা করে বলতে-কইতে গেলে আজকে যাওয়া হয় না। আমার গায়ে জল-বিছুটি মারছে বাছা, তোমাদের দালানকোঠা ছেড়ে রাস্তায় নামতে পারলে বাঁচি।

ট্যাক্সিতে মেয়েজামাই স্টেশনে পৌঁছে দিতে চলল। নিলাজ অনীতাও উঠে বসল তাদের পাশে। ঘণ্টা দিয়েছে, ট্রেন ছেড়ে দেবে এবার। অনীতা কামরার মধ্যে উঠে পড়ে আবার কমলের পায়ের ধুলো নিল।

আমি খারাপ মেয়ে, অনেক দোষঘাট করেছি। কিন্তু যাবার সময় মনে রাগ নিয়ে যেও না—আশীর্বাদ করে যাও।

কমলবাসিনী আশীর্বাদ করেন, চিরজীবী হও—সুখে-শান্তিতে থাকো—

ঐ রকম কালো মুখ করে আশীর্বাদ করে নাকি? কিছুতে তুমি মাপ করতে পার না—মা হয়েছিলে কেন তবে? 'কুসন্তান যদি হয়, কুমাতা কদাপি নয়।'

কমল বললেন, মা কেন বলছ—পিশি। তা-ও টেনেটুনে অনেক রকমের হিসাবপত্তোর করে।

অনীতার দু-চোখ জলে ভরে যায়।

সম্পর্কে যা-ই হও, তোমায় পেয়ে আমি কিন্তু মাকেই চেয়েছিলাম। মিথ্যুক মেয়ের এই কথাটা তুমি বিশ্বাস কোরো। কপাল খারাপ—তা নইলে আসল মা আঠারো দিনের মেয়ে ফেলে চলে যাবে কেন?

গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। সীতা চেঁচাচ্ছে, নেমে আয়—নেমে আয়। লাফিয়ে পড়ল অনীতা। স্তব্ধ হয়ে চলন্ত গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

তারপর যেন চটকা ভেঙে হেসে ওঠে। চলুন—জামাইবাবু। আমার তাড়া রয়েছে ওদিকে। বাবা এতক্ষণে এসে গেছেন। যে দিকটা না দেখব, ঠিক একটা গোলযোগ ঘটে আছে।

হিমাংশু চুপচাপ বসে রয়েছেন। অনীতা ছিল না—ক্লাবে পালাবার এমন সুবর্ণসুযোগ হেলা করে বাড়ি বসে আছেন—গোলযোগ নিশ্চয় ভাবিক্কি রকমের। বাপকে দেখে অনীতা ছুটে চলে যায়।

কি হয়েছে বাবা?

হবে আবার কি!

আলবৎ হয়েছে। কেউ কিছু বলেছে তোমায়?

কণ্ঠস্বর চড়ছে, নিশ্চয় তুমি কোনখানে গিয়েছিলে কোর্ট থেকে। সায়ান্স-কলেজে গিয়েছিলে কিনা, সেই কথাটা বলো আমায়। বলতেই হবে।

নির্বাক নিস্পন্দ হিমাংশু—পাথরের মতন। তারই মধ্যে অনীতা জবাব পেয়ে যায়।

কেন গিয়েছিলে বাবা, অপমান হতে? আমায় না বলে যাও কেন যেখানে-সেখানে?

এবারে হিমাংশু জবাব দেন, বললে তুই যেতে দিতিস নে। কমলের জামাই এলো—আমার জামাই আসবে না কেন? আমার সাধআহ্লাদ থাকতে নেই?

অনীতা বলে, না বলে যেমন গিয়েছিলে—ঠিক হয়েছে, মুখ কালো করে

বসে আছ। তোমার মেয়েকে কেউ ভালবাসে না বাবা, কেউ তার ভাল চায় না। তা হলে মনের কথাটা বুঝে দেখতো একটু। আছে পুরুষালি দম্ভ—চিরকাল ঘরের বউকে দিয়ে দাসীবৃত্তি করিয়েছে, সে অধিকারের এক চুল এদিক-ওদিক হতে দেবে না। শ্বশুরবাড়ি নয়, সে তোমার মেয়ের ফাঁসের দড়ি—দম আটকে তিলে তিলে মেরে ফেলবে।

বলতে বলতে উন্মাদ হয়ে ওঠে যেন, কণ্ঠস্বরে অগ্নিজ্বালা। হিমাংশু ভয় পেয়ে যান।

আহা, হল কি বেবি? অপমান করবে কেন আমায়! মিহির কি তেমনি ছেলে? ওদের ক্লাস শেষ হয়ে আসছে, পড়াশুনোর বড্ড চাপ—

তোমার মেয়ে কুমারী। এইটে পাকাপাকি জেনে রেখে দাও বাবা। হ্যাঁ তাই। আর কখনো জামাইয়ের কথা তুলবে তো ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে আমি জীবন শেষ করব।

দুমদুম করে সিঁড়ি ভেঙে অনীতা উপরে চলে গেল। কিন্তু কতক্ষণ? আধঘণ্টা—না, তা-ও নয়। আবার এসেছে বাপের কাছে। শান্ত মুখ, হাসছেও যেন।

কাপড় ছাড়তে হবে না বাবা? খাবে না, ক্লাবে যাবে না?

না, কিছু করবো না আমি—

ইস, অবাধ্যপনা হচ্ছে! অবাধ্য হয়ে কবে পার পেয়েছ? যা বলি, ভালোয় ভালোয় তাই করলে তো ঝগড়াঝাটি হয় না! আচ্ছা, ঘাট মানছি আমি বাবা। অন্যায় হয়ে গেছে ঐরকম করে বলা—শাস্তি দাও, কিল-চড়-লাথি-জুতো যা খুশি মারো—

পিঠ পেতে দিয়েছে, যদৃচ্ছা মেরে গেলেই হল। পাগল—আস্ত পাগল একেবারে!

কোর্টের পোষাক ছেড়ে খেতে বসতে হয় অতএব। এখন এই ভালো দেখা যাচ্ছে—মেজাজ বিগড়াতে কতক্ষণ? পলক ফেলতে যে সময়, তা-ও নয়। জুত পেয়ে তবু হিমাংশু একটু বেঁকে বসলেন, একলা খেতে যাবো কেন রে? তুই আয়, সীতাকে ডাক, জামাইকে ডাক—টেবিলে খাবো চারজনে মিলে।

একটা নিশ্বাস পড়ো-পড়ো হয়েছিল, ভয়ে চেপে নিলেন। অন্য কথা

পাড়েন, কম্বল চলে গেছে—টেবিলে খেলে সীতাকে আজকে কেউ বকুনি দেবে না।

খাওয়াদাওয়া অন্তেও রেহাই নেই। অনীতা তাগাদা দেয়, বসে রইলে কেন? যাও ক্লাবে—

হিমাংশু রাগ করে ওঠেন, অলক এসেছে—আর আমি ক্লাবে গিয়ে বসে থাকব? কি মনে করবে ওরা?

অনীতা ফিক করে হেসে ফেলল। ভারি কাজের মানুষ—উনি বাড়ি থেকে সব করবেন! ছুতো ধরলে হবে না বাবা, ক্লাবে গিয়ে দাবা খেলোগে। চাটুজ্জে মশায়রা পথ তাকিয়ে আছেন তোমার জন্য।

অলকের কাছে গিয়ে বলে, দিদি বলছিল—জানেন জামাইবাবু, বোনটা সব সময় পাহারা দিয়ে দিয়ে ঘুরছে। বাড়ি থেকে এক পা বেরোয় না যে একটু নিরিবিলি বসব।

সীতা আশ্চর্য হয়ে বলে, কখন? দেখ্—যা-তা ওরকম বানিয়ে বলবি নে।

মুখে নয় দিদি—মনে মনে বলছিস। আমি টের পাই। তাই বাইরে চলে যাচ্ছি। একা-একা থাক্ তোরা দু-জনে।

সীতা বলে, না—যাওয়া-টাওয়া হবে না। এইটুকু সময় আছি, উনি এখন হাওয়া খেতে চললেন!

অনীতা গলা খাটো করে বলে, বাবা বিগড়ে গেছেন—ক্লাবে নিয়ে গিয়ে ওঁর জায়গায় বসিয়ে দিয়ে আসি। ড্রাইভারের জিম্মায় পাঠাতেও পারতাম—তা হলে হয়তো মাঝপথে কোন এক পার্কে নেমে চুপচাপ বসে থাকবেন। কাউকে বিশ্বাস করবার জো নেই। আমার কত মুশকিল, সে তো জানিস তুই!

তাই। হিমাংশুকে ক্লাবে দলের ভিতর বসিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। ফিরে আসছে, তখন ব্লাউজের ভিতর থেকে চিঠি বের করল। মিহিরের চিঠি—আজকের ডাকে এসেছে। কেউ জানে না—জাঁক করে অপরকে দেখাবে, তেমনধারা বরের চিঠি নয়। উপরে উপরে একবার চোখ বুলিয়ে রেখেছিল, নিঃশঙ্কে ভাল করে পড়ছে এইবার এতক্ষণে।

···রাতের দুঃস্বপ্নের মতো ভুলে যাওয়াই ভালো। অশুচি বান্ধবীর সঙ্গে

অহোরাত্রি আনন্দের তুফান—তার মধ্যে খড়-কুটোর মতন আমি ভেসে যাবো, ক-দিন পরে কিছুই খেয়াল থাকবে না···

আপনি-তুমি বাদ দিয়ে সেই আগেকার সম্বোধন। সকলকে গোপন করে উপযাচক হয়ে অনীতা চিঠি লিখেছিল, তার এই জবাব। কি লিখেছিল, তা সে বলবে না—মরে গেলেও না। কি লজ্জা, কি অপমান! বুড়োমানুষ বাবা থাকতে না পেরে সায়ান্স কলেজে চলে গিয়েছিলেন, তার জন্য তাঁকে বকুনি দিল! নিজেকেও খুব গালিগালাজ করছে মনে মনে। চিঠি শতকুটি করে ছিঁড়ে কাচের জানালা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল। তাই তাই, কুমারী মেয়ে সে, বাপ আর মেয়ে—শুধুমাত্র দুটি প্রাণীর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সংসার। মাঝখানে কেউ নেই, কোনদিন কেউ ছিল না। মিহির লিখেছে ঠিক কথা—তবে দুঃস্বপ্নই পুরোপুরি নয়, মিষ্টি মিষ্টি অনেক টুকরো স্বপ্ন জড়িয়ে ছিল ঐ সঙ্গে। কিন্তু স্বপ্ন যেমনই হোক, পরমায়ু এক লহমার।

জলতরঙ্গ বেজে উঠল—খিল খিল, খিল খিল। সীতা বলে, ঐ যে—ফেরা হল এবারে। ও হাসি আর কেউ হাসতে পারে না।

অলক বলে, সত্যি, আগেও অনীতা দেবীকে কত দেখেছি। এত হাসতে দেখি নি কখনো। পাগলের মতো হাসছেন।

সীতা মুখ টিপে হেসে বলে, বলো দিকি কি জন্যে?

অলক বলে, কি জানি? আমরা হলাম আইনের লোক। ডাক্তারে বলতে পারে, লোকে কি জন্যে পাগল হয়। ব্যাধি সারাতেও পারে—

সীতা রাগ দেখিয়ে বলে, সারাতে কেউ না আসে, খবরদার! পারে তো এই পাগলামির ব্যাধি ছড়িয়ে দিক পৃথিবীর সকল বর-বউয়ের মধ্যে।

গভীর কণ্ঠে আবার বলে, পাগল হয়ে ভালবেসেছে, পাগল-করা ভালবাসা পেয়েছে—তাই এমনি। কাল তখনো তুমি এসে পৌঁছও নি—কত গল্প করল আমার সঙ্গে! একটুখানি লাগিয়ে দিলেই হল। বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে আলাদা এক মানুষ—আনন্দে যেন টগবগ করে ফুটছে।

অলক দুষ্টমি-ভরা চোখে চেয়ে বলে, বিয়ে আরও একটি হয়েছে এ-বাড়ি। বড্ড বাঁচোয়া—সে ক্ষেত্রে এ-হেন উৎকট লক্ষণ নেই।

সীতারও জবাব তেমনি। হবে কি করে? অমন ভালবাসা তো পায় নি সে যা পাচ্ছে—তাতে খুঁত আছে, খাদ আছে, ভেজাল আছে।

ঝগড়াটুকু জমতে পারে না, অনীতা এসে ঢুকল। অলক বলে, মিহিরবাবু কাছাকাছি তো থাকেন—তিনি এলে ভালো হত। কতদিন আর দেশে ফিরতে পারব না—দেখাসাক্ষাৎ হয়ে যেতো, সকলে মিলে রাতটুকু হুল্লোড় করে কাটাতাম—

অনীতা বলে, দেখা তো কতই হয়েছে!

দেখেছি অনীতা দেবীর মাস্টারকে। প্রোমোশান পেয়ে প্রভু হবার পর এখানকার ভাবগতিক দেখতে চাই একটু। সত্যি, চিঠি লিখে দিন না কাউকে পাঠিয়ে।

আসতে তো একপায়ে খাড়া। ছুতোনাতা পেলেই হল। ঝড়ু-দাকে পাঠাচ্ছিলেন বাবা। আমি মানা করলাম—না বাবা, কাজ নেই। একেই রামানন্দ, তায় আবার ধুনোর গন্ধ! এদ্দিন নানান মচ্ছবে কাটল। কাল না পরশু বুঝি পরীক্ষা আবার একটা—

মুচকি-মুচকি হেসে আবার বলে, বাবা বলেন, বেচারি একা-একা পড়ে আছে সোনারপুরে। আমি ঝগড়া করি বাবার সঙ্গে, থাকুকগে—পড়াশুনা হল তপস্যা, তপোবন চাই। এখানে এলে একেবারে কিছু করবে না। দেখে এসেছি তো! বিয়েবাড়ি মানুষ গিজগিজ করছে—তার মধ্যে···ছি-ছি! কি বলব জামাইবাবু, পুরুষমানুষ আপনারা যেন কী!

লজ্জায় রাঙা হয়ে অনীতা থেমে গেল। অলক হেসে ওঠে।

'পাশা উলটে গেছে তা হলে? উঃ, কী ভয়টা করতেন আপনি মিহিরবাবুকে! এখন তিনিই আপনার হুকুমের তলে—

ভ্রূভঙ্গি করে অনীতা বলে, ভয় করতাম আমি? কক্ষণো না—

বটে! মনে নেই, সেই একদিন বিহার্শালে রওনা হচ্ছি—মিহিরবাবু এসে পড়লেন। আমার কাছে খুব তম্বি করলেন আপনি—অবিশ্যি চাপাগলায়, বাইরে অবধি না পৌঁছয়। তার পরেই সুড়সুড় করে পড়ার ঘরে চললেন অভাজনকে নিঃসহায় একাকী পরিত্যাগ করে। সে ছবিটা কোন দিন ভুলব না অনীতা দেবী। রাগ করি আর যা-ই করি—সেদিন কিন্তু ভদ্রলোককে বীর বলে ভেবেছিলাম। এখন দেখছি, কাপুরুষ তিনিও—

অনীতা হাসতে হাসতে বলে, পুরুষমানুষ আবার বীরপুরুষ হয়ে থাকে কবে? আমায় সেই যে পরীক্ষার নাম করে হুমকি দেওয়া হত—সেই কায়দাটাই পুরোপুরি শিখে নিয়েছি এখন। গুরু-মারা বিদ্যে। আপনারা শুধু দেখতেই লম্বা-চওড়া—বুদ্ধিতে এক এক শিশু। বাবাকে জানি—আর ঐ একজনকে দেখছি এখন ভালো করে। আপনার কথা বলতে পারব না—আপনি কেমন, সেটা দিদি বলবে।

সীতা কলকল করে ওঠে, একেবারে উল্টোটি রে! আমাকেই পাঁচ বছুরে শিশু ভাবে ওরা। রান্নাঘরে যেতে দেবে না—আগুনের কাছে গেলেই কাপড়চোপড় ধরে নাকি একখানা কাণ্ড হয়ে যাবে! একদিন সিনেমায় যাচ্ছিলাম—পথে মোটর বিগড়াল। ট্যাক্সি ডাকাডাকি করছে। আমি এত করে বলি, হাঁটতে জানি গো আমি—পা-দুটো একেবারে অচল হয়ে গেল তোমাদের বাড়ি বসে বসে। একটুখানি হাঁটি, দোহাই প্রভু, কত আর পথ—এইটুকু হেঁটে যাই। তা কিছুতে দয়া হল না। মুখের উপরেই বলছি—বলুক যে মিছে কথা! জন্ম থেকে যেন আমায় তুলোর বাক্সে করে রেখেছিল, তারপরে ওদের ওখানে গিয়ে উঠেছি।

হতাশ সুরে আবার বলে, কাকে ছেড়ে কার কথাই বলি! বাবা অবিকল তাঁর ছেলেরই মতো, মা'টিও ঠিক তাই—

অনীতা বলে, বলিস নে দিদি, বলিস নে। সব শ্বশুরবাড়ির ঐ এক রীত। পরের মেয়েকে ননীর পুতুল ভাবে। আমার লজ্জা করত। হাসছিস দিদি, কিন্তু সত্যি কথা—কাণ্ড দেখে আমার মতন অতি-বেহায়ারও লজ্জা এসে যায়। খেয়ে উঠে একটু গড়াচ্ছি—আবার একজন বলে, খাও ভাই উঠে এসে। খেয়ে খেয়েই জীবন শেষ! নতুন বউয়ের যেন কষ্ট না হয়, ঘুম হয়েছিল বউয়ের? ঠাকুরদীঘিতে যাই চলো কাকীমা, সাঁতার কাটিগে। ওরে, তোরা গল্প কর্ না কাকীমার সঙ্গে···শহরে অত মজা নেই—শহরের মানুষ আমরা অত সব ভাবতে পারি নে। তবু রক্ষে, শাশুড়ি বৃন্দাবন গিয়ে আছেন। তাঁর কথা যা শুনলাম—ওরে বাবা! ধুমসি বউকে পটের ঠাকুরের মতন সাজিয়ে বসিয়ে রাখতেন তিনি।

বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। চিরকাল শহরে কাটিয়ে এখন মনে হচ্ছে

জামাইবাবু, আসল বাংলাদেশ দেখা হল এইবারে। শান্ত সবুজ চোখ-জুড়ানো রূপ, মানুষগুলোর মন-জুড়ানো আলাপ-ব্যবহার। ইচ্ছে করে, সে-দেশের সেই ঠাণ্ডা মাটির উপরে জীবন ভোর হেঁটে হেঁটে বেড়াই, নেচে নেচে বেড়াই, ক্লান্ত হয়ে তারপর একদিন গড়িয়ে পড়ে চোখ বুজি—

অনেক রাত অবধি চলল আমোদ-আহ্লাদ, খাওয়া-দাওয়া। তারপরে অনীতা নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিল। সীতা আর অলক তখনও মুগ্ধকণ্ঠে তার কথা বলাবলি করছে। সীতা বলে, বাইরে পাগলামি, কিন্তু কাজ গোছাতে ওস্তাদ। দেখছ না, মিহিরবাবু সুদ্ধ গোটা সংসার এর মধ্যে আঁচলের গেরোয় বেঁধে ফেলেছে। আর তোমার বেলা—ওবে বাবা!

অলক হেসে বলে, আমি মিহিরবাবুর চেয়েও ভালো—

ভালো বই কি! চরণে দণ্ডবৎ তোমার! কলকাতায় হল না, দিল্লিতে নয়—চললে এখন সাত-সমুদ্দুর পারে মরুভূমির মুল্লুকে। পড়তে অনীতার পাল্লায়—ছটফটানি ঠাণ্ডা করে দিত।

অলক বলে, খুব বেঁচে গেছি তা হলে—কি বলো? শুনেই আমার ভয় লাগছে। বেচারি মিহির!

আর, কি করছে অনীতা এখন? আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। শুয়ে শুয়েও হাসছে না কি? অন্ধকার—কাজ নেই পাঠক, উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে। চরাচরের অন্তর্যামী যদি কেউ থাকেন, তিনিই দেখুন নিশীথ আকাশে তারার সহস্র চক্ষু মেলে। আর রয়েছেন পাশের ঘরে হিমাংশু রায়—চোখে না দেখেও তিনি টের পাচ্ছেন। ঘুম নেই বুড়োমানুষটির, শয্যায় এপাশ-ওপাশ করেন। মেয়ের ভয়ে দুয়োর খুলে বেরিয়ে আসবার সাহস নেই।

২২

বছর কেটে গিয়েছে, বছরের পরেও দু-তিন মাস হতে চলল। এক পরমাশ্চর্য খবর—অনীতা পাশ করে থার্ড-ইয়ারে পড়ছে এখন। পাশও করেছে খারাপ ভাবে নয়। যে অঙ্ক বাঘের মতন ডরাত, তাতেই মোটা নম্বর পেয়েছে। অথচ বুঝিয়ে দেবার কেউ ছিল না—করেছে নিজে নিজে সমস্ত। হৈ-হল্লোড়ও চলেছে যথারীতি। কেমন করে যে হল, কেউ বলতে পারে না। হিমাংশু পর্যন্ত অবাক।

হাঁসপুকুর থেকে মণি মাঝে মাঝে পোস্টকার্ড ছাড়ে। অন্নপূর্ণা ভাইকে সুস্থ করে তুলে এখন মহানন্দে তাঁর সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাই হোক, সংসারে যেন তাঁকে আর কখনো না টানেন ঈশ্বর! তীর্থ-সন্দর্শন চলুক এমনি বাকি জীবন ভবে। যা-সমস্ত শুনে এসেছে দুর্বাসা ঠাকরুনটির সম্বন্ধে—কোনদিন অনীতা সামনাসামনি পড়তে চায় না। একটা বেলা ধরে অসংখ্য মিথ্যে বলে এসেছিল—ধরা পড়ে গেছে। এখনো না যদি পড়ে থাকে, ধরিয়ে দেবার মানুষেরা তৈরি হয়ে আছেন। দেখা হলে অন্নপূর্ণা দৃষ্টির আগুনে মিথ্যাবাদিনীকে ভস্মই করে দেবেন হয়তো!

দুর্বাসা হন যা-ই হন, তবু কিন্তু শ্বশুরবাড়ির দঙ্গলের ভিতরে ঐ-একটা মানুষেরই বিস্তারিত খবরাখবর দেবার জন্য মণিকে সে লেখে। অন্য কারো সম্বন্ধে গরজ নেই। সময়ই বা কোথা? সেই যা লিখেছিল মিহির—অগুন্তি বান্ধবীর সঙ্গে অহোরাত্রি আনন্দের তুফান, খড়কুটো হয়ে মন থেকে সবাই একেবারে ভেসে চলে গেছে।

হিমাংশু সামলে নিয়েছেন। ভেবেচিন্তে বরঞ্চ তৃপ্তিই পাচ্ছেন খানিকটা। আহা, বেড়াক না হেসে-খেলে! আনন্দোচ্ছলাকে তাড়াতাড়ি সংসারে বাঁধতে যাওয়া নিষ্ঠুরতা হচ্ছিল—থাকুক এমনি। ছেলে নেই—অনীতাই তাঁর ছেলে, ছেলের মতোই লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে উঠুক। ধীমতী—পরীক্ষায় কেমন

নম্বর পেয়েছে শুধুমাত্র নিজের চেষ্টায়। বড় হোক, নিজের ভালমন্দ ভাল করে বুঝতে শিখুক। তারপর যে পথে মতি যায়, চলবে। গতানুগতিক নীতি-নিয়মের নিগড়ে প্রাণশক্তি চুরমার করে দেওয়া—তাঁর অনীতার জন্যে চান না এই সামাজিক অভিশাপ। সন্তান ঐ একটি বই তো নয়!

পুজোয় কলেজ বন্ধ হচ্ছে, এবারও অভিনয় তদুপলক্ষে। অভিনয় মানেই অনীতার আহার-নিদ্রা বন্ধ। সন্ধ্যা থেকে রিহার্শাল চলছে—সেই হলঘরটায়, বরাবর যেখানে তাদের রিহার্শাল চলে।

অনীতার মাথার দু-পাশে দুই দীর্ঘ বেণী, দু-কানে দু-টুকরো হীরে। ডান-হাতে দু-গাছা চুড়ি, বাঁ-হাতে ছোট্ট ঘড়ি আর অনামিকায় আংটি। পায়ে রঙিন স্লিপার। এই সামান্য সাজে দলের মধ্যে সে ঝিকমিক করছে।

রাস্তার উপর একজন দু-জন করে লোক জমে গেছে, উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। লোকগুলোকে এরা আমলের মধ্যে আনে না। জানলার একটা কপাট বাতাসে বুঝি বন্ধ হয়েছিল—অনীতার বাড়াবাড়ি—সে এসে পরিপাটি করে খুলে দেয়, টিক লাগিয়ে দেয় আবার যাতে বন্ধ হতে না পারে। পর্দাটা কি ভেবে আর সরিয়ে দিল না। উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখুকগে ওরা যত খুশি। চোখের দেখায় দেহ ক্ষয়ে যায় না।

আরে, আরে—কে মানুষটি সকলের পিছনে? মিহির নয়? আকাশের চাঁদ ভুম করে রাস্তার উপর পড়লে এত অবাক হতে হয় না। না, মিহির কখনো নয়—মিহির কেমন করে হবে? আবছা আলোয় দেখাচ্ছে অবশ্য তারই মতো। যে-ই হোক, থাকুকগে দাঁড়িয়ে। অনীতা দেখতে পায় নি—এমনি ভাব দেখিয়ে সরে গেল।

একটু পরে থুতু ফেলতেই বুঝি—সে আবার জানলায় এলো। না, কোথায় মিহির? তাই হবে, সে কেন আসতে যাবে এখানে? রবাহূত এসে রাস্তার জনতার মধ্যে ভিড় করে দাঁড়াবার মানুষ মিহির নয়। আর একদিন কত ঝুলোঝুলি করেও তো একটা মিনিট এখানে দাঁড় করানো যায় নি।

বেশ খানিকটা রাত হয়েছে। আর ভালো লাগছে না—রিহার্শাল আজ এই অবধি। ট্রাম থেকে নেমে অনীতা বাড়ি যাচ্ছে। অনেকগুলো বড় গাছ

রাস্তার উপর। আলো আছে অবশ্য মাঝে মাঝে, কিন্তু জমাট অন্ধকার ভেদ সাধ্য নয় একটা-দুটো আলোর। অনীতা চলেছে দ্রুতপায়ে। সাদা কাপড় আঁধারে যেন ঝিলিক দিচ্ছে—যেন আলোর এক তীর ছুটেছে অন্ধকার ভেদ করে।

ক-পায়েরই বা পথ! ফটকের অনতিদূরে—তাইতো, মিহিরই দাঁড়িয়ে। অনীতা ঢুকে যাচ্ছিল বাড়িতে—মিহির পাশে এসে বলে, বিপদে পড়ে এলাম—

বাক্যটা শেষ করল না। 'এলাম তোমার কাছে'—বলতে ইচ্ছে হয় না। ভাববে, সেই চিঠির পর গায়ে পড়ে আবার অন্তরঙ্গতা জমাতে এসেছে। 'আপনি' 'আপনি' করে বলেই বা কোন লজ্জায়? সেই আগেকার পন্থায় নৈর্ব্যক্তিক ভাবে, বিপদ পড়ে এসেছি—যদি সাহায্য করা সম্ভব হয়। হয়তো কষ্ট হবে, নানা রকম অসুবিধা হবে—

অনীতা বলে, হয়তো কিছুই হবে না। আগে শোনাই যাক ব্যাপারটা—

বৃন্দাবন থেকে মা আসছেন সোমবারে।

অন্নপূর্ণা আসছেন, সে খবর অনীতা মণির চিঠিতে আগেই পেয়েছে। গেল-বছর পুজোর সময় হাঁসপুকুর ছিলেন না, এবারে নিজে উপস্থিত থেকে দুর্গোৎসব করবেন।

মিহির বলে, সোনারপুরের বাসায় উঠবেন, আমায় লিখেছেন।

অনীতা নির্বিকার ঔদাসীন্যে বলে, বিধবা মানুষ—ছেলের বাসা রয়েছে, সেখানে না উঠে হোটেলে উঠতে যাবেন না কি?

সেই তো মুশকিল!

অনীতা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, মুশকিল কি? একলা একটি মানুষ কত জায়গা জুড়ে থাকবেন? একবেলা দুটো দুটো চাল ফুটিয়ে খাবেন, কত খরচ তাতে?

মিহির করুণ কণ্ঠে বলল, আমাদের এদিককার কোন খবর তাঁকে জানাই নি। জানেন, ছেলে তাঁর খুব সুখে-স্বচ্ছন্দে রয়েছে—

নয় তা?

চমক লাগে অনীতার কথার সুরে। সামলে নিয়ে মিহির জোর দিয়ে বলল, আনন্দ তো বটেই! বিরাজকে নিয়ে এসেছি এখানকার বাসায়। সে

রেখেবেড়ে দেয়, যত্নআত্তি করে। খাটিখুটি খাই—কোন ঝামেলা নেই। কিন্তু মা উঁরা সেকেলে মানুষ—সুখ-শান্তির একটা ধারাই শুধু জেনে রেখেছেন। তা ছাড়া, পরের ঘটনাগুলো কিছু তো জানানো হয় নি!

হঠাৎ অনীতা জেরা শুরু করে দিল, কি করা হচ্ছে আজকাল?

চাকরি নিয়েছি।

পড়াশুনোয় ইস্তফা তা হলে? বাঁচা গেছে!

আহত সুরে মিহির বলে, এগজামিন হয়ে গেছে—পড়াশুনো এখন কোথা? হীরালালবাবু যেখানে কাজ করেন, তাঁদের অফিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মারা গেল। ঐখানে যাতায়াত করছি। পাকাপাকি কিছু হয় নি এখনো—

আসল কথায় আবার ফিরে আসে। এক নিশ্বাসে বলে ফেলল, মা বেশি-ক্ষণ থাকবেন না। সকালে আসবেন, আবার সন্ধ্যের লোক্যালে জঙ্গিপাড়া রওনা হয়ে যাবেন। সামান্য কয়েক ঘণ্টার মামলা। ঐ সময়টুকু যদি সোনারপুরে থেকে আসা যায়—

আচ্ছা—বলে অনীতা ভিতরে ঢুকে গেল। একবারও পিছনে চাইল না। চিত্রার্পিতের মতো মিহির দাঁড়িয়ে আছে। অনীতা কি বুঝল, কে জানে? কিন্তু দাঁড়িয়ে থেকে লাভই বা কি? ফটকের ভিতরে যাওয়া কোন মতেই চলে না। ধীরে ধীরে সে ফিরল।

সারা রাত মিহির নানারকম মতলব ফেঁদেছে। বৃন্দাবনে একটা টেলিগ্রাম করে দিলে কেমন হয়? তাই দেবে কাল—যে অফিসের জরুরি কাজে তাকে পাটনায় চলে যেতে হল, বাড়িতে কেউ থাকছে না। কিন্তু সে না থাকুক, বিরজা তো থাকবে! তা ছাড়া টেলিগ্রাম বৃন্দাবনে কতক্ষণে পৌঁছবে ঠিক কি? খুব সম্ভব তার আগেই তিনি রওনা হয়ে পড়বেন। তা আসুন, আসবেন বই কি—কতদিন দেখে নি, আহা, মাকে! যা জানবার, জানুন শুনুন এসে—কি করা যাবে? সারারাত এমনি কত ভেবেছে, কিন্তু কোন-কিছু স্থির হল না।

অনীতাও ভেবেছে। কি বলতে চায় মিহির—জোর করে বলে না কেন? সোনারপুর অনেকদূর—পায়ে হাঁটতে হয় অনেকটা। অতদূর যাওয়া যায় না,

উপযাচক হয়ে কোন মতে যাওয়া চলে না সেখানে। হীরালালের কোল-কনসারন অফিসের নামটা জানা আছে—নেতাজি সুভাষ রোডে খুঁজে বের করা কঠিন হবে না। টেলিফোন-গাইডেই ঠিকানা আছে।

তাই হল। বেলা দশটায় অনীতা অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। গেটের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লোক-চলাচল দেখছে।

অফিসে ঢুকতে গিয়ে মিহির অবাক হয়ে যায়। অনীতা আমতা-আমতা করে বলে, এদিকে এসেছিলাম একটু কাজে। তা ভাবলাম, সাহায্যের কথা কি হচ্ছিল—সেইটে ভাল করে জেনে যাওয়া যাক।

মিহির বলল, মা সোমবারে আসছেন—

সেটা মনে আছে। স্মরণশক্তি আমার খুব খারাপ নয়। বুদ্ধিও একেবারে নেই, তা নয়। কারো সাহায্য না নিয়েই পাশটাশ করতে পারি। গেজেটটা দেখা হয়েছে?

মিহির বলে, অঙ্কে লেটার দেখে সকলে তাজ্জব—

মুখ টিপে হেসে অনীতা বলে, সকলে মানে কারা? অফিসের বন্ধু-বান্ধব? কত ছেলেমেয়েই তো পায় এমন—তাঁরা তাজ্জব হতে গেলেন কেন?

মিহির জবাব দিতে পারে না, মাথা চুলকায়।

অনীতা বলে, সে যাকগে। যা হচ্ছিল—মা আসছেন সোনারপুরে ছেলের বাসায়—এর মধ্যে আমি কি করব, বুঝতে পারছি নে।

আসছেন শুধু ছেলের কাছে নয়, পুত্রবধূর কাছেও।

অনীতা গম্ভীর হয়ে গেল। মিহির তাড়াতাড়ি বলে, কোনরকম অভিসন্ধি মনে নেই—শুধু মায়ের দিক দিয়েই কথাটা ভাবছি। বুড়োমানুষ—ক'টা দিনই বা বাঁচবেন! একালের সঙ্গে পরিচিত নন—আমাদের চলাচল ওঁদের কালের সঙ্গে কিছুই মেলে না। তিনি জানেন, ছেলে আর তাঁর নিজের পছন্দ-করা বউ সুখে রয়েছে মোটের উপর—

কথার মাঝখানে একটু খোঁচা দিতে ছাড়ে না। মিথ্যেও অবশ্য নয়—বউ পরম সুখে রয়েছেন, কাল বিতার্শালের সময় স্বচক্ষে তার একটু পরিচয় পেয়ে এলাম।

অনীতা, বলে, আর ছেলে যে দুঃখের পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছেন, তারও বিশেষ-কিছু লক্ষণ নেই।

মিহির জোর দিয়ে বলে, সত্যিই তাই। দুঃখ পাবার কি আছে? কিন্তু ওঁরা ধরে বসে আছেন—যার ঘর-গৃহস্থালী হল না, তার কিছুই হল না। এ ছাড়া জগতে যেন করণীয় কিছু নেই।

অবশেষে মরীয়া হয়ে বলে ফেলল, তাই ভাবছিলাম একটু যদি অভিনয় করা যায়। বুড়োমানুষকে আঘাত দিয়ে কাজ নেই। উনি বুঝে যান, ছেলে-বউ একত্র পরমানন্দে সংসারধর্ম করছে।

ভ্রূ কুঁচকে অনীতা ভাবতে লাগল।

মিহির বলে, অত ভাবনার কি আছে? সহজভাবে নিলেই হয়। ওই তো কলেজে অভিনয় হবে—ধরে নেওয়া যাক, তেমনি একটা বেলা এক ভিন্ন নাটকের অভিনয়। বিরজার কথা নিশ্চয় মনে আছে। তাকে বলে রেখেছি— মরে গেলেও সে ভিতরের কথা ফাঁস করবে না। মা সকালবেলা এসে পৌঁছচ্ছেন, সন্ধ্যের আগে চলে যাবেন। পুজো অন্তে আবার বৃন্দাবনে গিয়ে উঠবেন।

অনীতার দ্বিধা কেটে গিয়ে ক্রমশ কৌতুক লাগছে। দুর্বাসা ঠাকরুন, কত বড় দুর্ধর্ষ তুমি দেখা যাক। পারবে না কক্ষণো এই শক্ত মেয়ের সঙ্গে। হরিণ নিয়ে সবাই খেলতে পারে, বাঘের সঙ্গে খেলা করে দেখা যাক।

মনে মনে একটু হিসাব করে নিয়ে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সোমবার তো? ঠিক হয়েছে—কেস নিয়ে রবিবারে বাবা জলপাইগুড়ি যাচ্ছেন, ফিরবেন মঙ্গলবারে। আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটে যাচ্ছে। একটা বেলার ব্যাপার—বাড়িতে যা-হোক কিছু বলে এলেই হবে। বাবা নেই, কাজ কিছুই থাকবে না। ঐ একটা মানুষ নিয়েই তো যত-কিছু ঝামেলা!

হাসতে হাসতে অনীতা বলে, অভিনয়ে আরও নাম হয়েছে আমার। হালের অভিনয় নিশ্চয় কোথাও দেখা হয়েছে—তাই আমায় বুঝি মনে পড়ে গেল?

ভালো রে ভালো! মায়ের পুত্রবধূ সাজতে কাকে বলতে যাবে মিহির? এ কি বলছে অনীতা—কী মনে করে সে মিহিরের সম্বন্ধে?

অনীতা বলে, হবে তাই। রাজি হলাম। আমি 'না' বলি নে কোনখানে অভিনয়ের ডাক এলে।

সোমবারে ভোরবেলা অনীতা সেই আর একদিনকার চেনা বাড়ির উঠানে বটতলায় এসে দাঁড়াল। জানাজানি হওয়ার ব্যাপার নয়—সঙ্গে তাই কাউকে নিয়ে আসে নি, এতটা পথ একা-একা চলে এসেছে।

পাড়াতেই বিরজার সঙ্গে দেখা। বোঝাক ঝাঁট দিচ্ছে—অনীতাকে দেখে ঝাঁটা ফেলে একগাল হেসে উঠি-কি-পড়ি ছুটে এলো।

তুমি আসবে, জানতাম আমি বউদি। দাদাবাবু বলে রেখেছে।

এত যে পথের কষ্ট, সমস্ত ধুয়েমুছে গেল মানুষটিকে পেয়ে। বিরজার দু-খানা হাত জড়িয়ে ধরে অনীতা বলে, কেমন আছ বিরজা-দিদি।

বিরজা পায়ে হাত দেবে তো ছিটকে সরে যায় অনীতা।

ও কি হচ্ছে বলো তো? তুমি বয়সে বড়—আমায় নরকে ডোবাবে, সেই মতলব করেছ? নতুন বউ পেয়ে যা খুশি করে নিয়েছ, সেটা আর হচ্ছে না।

ঐ পা ছোঁওয়া নিয়ে হুটোপুটি। শেষটা অনীতা মোক্ষম ভয় দেখায়। ইস—আমারই তো অন্যায় হয়ে গেছে। দিদি হলে তুমি—তোমার পায়ের ধুলো নেওয়া হয় নি। দাঁড়াও—

তখন বিরজা পালাতে দিশা পায় না। অনীতা বলে, আমায় আসতে বলে এলেন—সে-মানুষটি কোথায়? ডেকে দাও বিরজা-দিদি—

বিরজা ফিরে দাঁড়িয়ে হেসে উঠে বলে, ঘুমুচ্ছে। ডাকাডাকি করে জাগাওগে তুমি। আমার বয়ে গেছে।

তারপরে একটু তাড়া দিয়ে ওঠে, বলি ভিতরে আসবে—না পর-অপরের মতন বাইরে দাঁড়িয়ে তকরার করবে অমনি?

গলা শুনে ঘুম ভেঙে, চোখ মুছতে মুছতে মিহির বেরিয়ে এলো। লজ্জিত ভাবে বলে, সকাল হয়ে গেছে—মোটে টের পাই নি। ছি-ছি। অতদূর থেকে এসে পৌঁছনো হল, আর আমি বিছানায় পড়ে পড়ে গড়াচ্ছিলাম ঘরের মধ্যে।

অনীতা বলে, বন্ধুবান্ধবেরা এসে রাত্রি জাগিয়েছিল বোধ হয়—

মিহির সহজ ভাবে কৈফিয়ৎ দিয়ে চলেছে, বর্ষার পরে চতুর্দিকে কসাড জঙ্গল হয়ে পড়েছিল। কাল রবিবার ছিল—হঠাৎ খেয়াল হল, সকাল থেকে জঙ্গল কাটতে লেগে গেলাম। পাহাড জমেছে ঐ যে! বড্ড কষ্ট হয়েছিল—মরে ঘুমিয়েছি এই এতবেলা অবধি।

কাটা জঙ্গল স্তূপীকৃত করে রেখেছে একদিকে, আঙুল দিয়ে দেখায়। অনীতা বলে, কি দরকার ছিল এত খাটনির? মা আসছেন, বাইরের কেউ তো নয়—

মিহির মৃদু কণ্ঠে বলল, মা ছাডাও তো আছে! ঝোপজঙ্গলে ভয় ধরে যায় কিনা অনেকের! রাত দশটা অবধি একটানা চালিয়েছি, তারপরে বিরজা রাগারাগি করতে লাগল—

অনীতা শিউরে উঠে বলল, রাত্তিরবেলা জঙ্গল কাটা—সাপটাপ থাকে আবার জঙ্গলে—

তবু তো শেষ করতে পারলাম না। বাইরেটা ছিমছাম দেখাচ্ছে—ভিতরের দিকে এখনো আবর্জনার কাঁডি। মা'র আবার উল্টো ব্যাপার—জঙ্গলে আপত্তি নেই, এঁটো-আস্তাকুড সহ্য করতে পারেন না। নিয়ে আসি তো তাঁকে, এসে আবার একদফা লাগতে হবে।

অনীতার পরিপাটি প্রসাধন ও কাপডচোপডের দিকে মিহির বারম্বার তাকাচ্ছে। কি যেন বলি-বলি করে।

অনীতা বলে, কি?

আজ কি এই রকমই থাকবে? এ সাজে মা চেনেন কি না চেনেন! সেদিন একেবারে ভিন্ন রকম দেখেছিলেন কি না!

গম্ভীর হয়ে অনীতা বলে, সেদিন আর আজ এক নয়। আজকেরটা ভেবে দেখি নি এখনো। অভিনয়ে মেক-আপ আমি নিজেই করি, কারো পরামর্শ নিই নে। জিনিসপত্র সঙ্গেই থাকে।

ঝোলানো-ব্যাগ হাতে—সেটা এদিকে-ওদিকে দোল দিতে লাগল। মিহির মুশড়ে যায়। বোঝা যাচ্ছে না, কি মতলব অনীতার মনে। নিয়ে এসে ভাল হল কি মন্দ হল, কে জানে? নতুন বিপত্তি না ঘটায় আবার!

স্টেশন থেকে ট্যাক্সি করে মিহির মাকে নিয়ে এলো। ঘন্টা তিনেক বাইরে ছিল—এই সামান্য ক্ষণের মধ্যে অনীতা কি কাণ্ড করেছে! নিজের—এবং ভিতর-বাড়ির চেহারাও একেবারে বদলে ফেলেছে। শুচিবায়ুগ্রস্ত বিধবা মানুষ—শ্যেনদৃষ্টিতে চতুর্দিকে অনাচার খুঁজে বেড়ানো তাঁর অভ্যাস। এ নিয়ে কত যে দুর্ভাবনা মিহিরের—কিন্তু পরিচ্ছন্ন ধোয়া-মোছা ঘর-দালানের দিকে চেয়ে সে আশ্বস্ত হল। বিরজাকে নিয়ে অনীতা করে ফেলেছে এই সব। না—যেটুকু সময় মা থাকবেন, তৃপ্তি ও প্রসন্নতা নিয়েই থাকতে পারবেন।

সদ্য স্নান করে এসেছে অনীতা। কপাল জুড়ে ইঞ্চিখানেক আয়তনের বিশাল সিন্দুরকৌটা—সিঁথির সিন্দুরও তদনুপাতে। একেবারেই ভরিখানেক সিঁদুর লেপেছে। পরনে টকটকে লাল পাড় শাড়ি। এমনই এক স্নিগ্ধ লালিত্য তার সর্বাঙ্গে—তার উপর নতুন বেশভূষায় অপরূপ শ্রী খুলেছে। চোখ মেলে চার দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। আর একদিনের বঙ্গকুমারী, আজকে দেখ দেখ, গৃহস্থঘরের কল্যাণী বউ। সাজে-পোশাকে চলনে-বলনে তিলমাত্র খুঁত পাবে না। অভিনয়ে মেয়েটার এত নাম অমনি-অমনি হয় নি।

গলায় আঁচল জড়িয়ে অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করে সে পায়ের ধুলো নিল, দু-পায়ের ধুলো নিয়ে ঠোঁটে আর মাথায় ঠেকাল। অন্নপূর্ণা তার চিবুকে হাত দিয়ে হাতখানা নিজের মুখের কাছে এনে গভীরকণ্ঠে আশীর্বাদ করলেন, সাবিত্রী-সমান হও—

শুরুতেই খাসা জমিয়ে তুলল। মিহির ভাবছে, তীর্থধর্ম করে মা বদলে এলেন না কি? ঠিক তাই। পরের মেয়েকে আদরের ঘটাখানা দেখ। নিজের ছেলে এঁর সিকির সিকি পায় নি কোনদিন—

কিন্তু খানিক পরেই মেজাজ টের পাওয়া গেল। রান্নাঘরে পা দিয়েই চিৎকারে তিনি বাড়ি মাথায় করে তুললেন।

কী ম্লেচ্ছ গো তোমরা! একটু গোবরমাটিও দিয়ে দাও নি—এইখানে রান্না হবে নাকি? কাজ নেই বাপু, আমি উপোস করে থাকব—

মিহির তাড়াতাড়ি গিয়ে বলে, গোবরমাটি দেওয়া হয়েছে মা। দিয়েছে বিরজা। আমি নিজে দেখেছি, ও যখন দিচ্ছিল।

বিরজাও সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, হ্যাঁ মা, দিয়েছি। মিছে কথা কেন বলতে যাবো ? সত্যি দিয়েছি আমি—

বেগার-দেওয়া দিয়েছ। আর তোমার কি দোষ দেবো বাছা, বাড়ির বউ ঐ যে হারামজাদি—তার আক্কেলে তাজ্জব বনে গেছি। বিধবা শাশুড়ির হেঁসেল লেপবার ভার তোর উপরে দিয়ে সে বেটি নিশ্চিন্ত হয়ে আছে—

সভয়ে মিহির এদিক-ওদিক তাকায়। অনীতার কানে না পৌঁছয়। তা হলে সর্বনাশ! 'হারামজাদি' ঠিক গালাগাল নয়। গ্রাম্য প্রবীণাদের কথার ধরন ঐ—ভালবেসে দবদ দেখিয়েও বলা হয়। কিন্তু শহুরে লোকে সে জানে না।

যা ভয় করছে, তাই। অনীতা এসে পড়ে, কি হয়েছে মা ?

অন্নপূর্ণা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেন, উনুনের ঝিকে কত কালের বাসি কালির দাগ। দেখ দিকি একবার চোখ তাকিয়ে। বলি, কেমন মা তোমার বাছা—মেয়েকে এইটুকু আচার-বিচার শেখায় নি ?

মিহির প্রমাদ গণে। অনীতার মুখে তাকিয়ে দেখবার সাহস নেই।

কিন্তু—তা নয় তো! ম্লান কণ্ঠে অনীতা জবাব দিল, মা আছে কি? সে কবে চিতেয় পুড়িয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হয়েছি। আঠারো দিন বয়স আমার তখন। আর আপনাকেও কাছে পাই নি মা—কোথায় শিখব তা হলে বলুন—

অন্নপূর্ণা নীরব হলেন। কথার কি জাদু জানে অনীতা, সমস্ত রাগ জল করে দিল। মা-হারা অভাগা মেয়েটার জন্য অন্নপূর্ণার দুঃখ হয় মনে মনে।

অনীতা বলে, গোবরমাটি দেওয়া-ই হয় নি মা। বিরজা-দিদিকে দিয়ে হবে না বলে আমি সন্ধ করে দিয়েছি। আমার নিজের হাতে করতে হবে, রান্নার ঠিক আগে করব। একপাল বেরাল—বলা যায় না, হয়তো বা মাছের কাঁটাই মুখে করে এনে ফেলল।

ছেলেমানুষের বিচার-বিবেচনায় অন্নপূর্ণা তাজ্জব হয়ে যান।

তা এইবারে রান্নার যোগাড় হোক—কি বলেন? বেলা কম হয় নি, তার উপরে রাত জেগে কষ্ট করে এসেছেন।

এবং মুখের কথা শুধু নয়—কোথা থেকে গোবর জলের ভাঁড় এনে ন্যাতা বুলিয়ে উনুন লেপতে বসে গেল।

মিহির হাঁ-হাঁ করে ওঠে। আহা, নিজে করতে হবে কেন? বিরজাই পারবে। দেখিয়ে শুনিয়ে দিলে তারই দ্বারা হবে। কেন, সে করে থাকে না?

অন্নপূর্ণা বলেন, করছে করুক না! ঝি-বউয়েরই কাজ—ওতে ক্ষয়ে যাবে না।

মিহির আর কি করবে এর উপর? অনীতার পরিত্রাণের জন্য মৃদু কণ্ঠে তবু একবার বলে, মানে অসুখ করেছিল কিনা। ডাক্তার জল বসাতে মানা করেছে।

কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষ অনীতাই। সে বলে, মিথ্যে কথা মা। অসুখ আমার কোন সময় হয় না। আমার শরীর দেখলে কি অসুখের মতো মনে হয়, বলুন। কোন্ ডাক্তার বলেছে, নামটা জেনে নিন তো!

ছেলে মিথ্যা বলছে, স্পষ্ট ধরা পড়ে গেল। কিন্তু রাগ হয় না অন্নপূর্ণার, মুখ টিপে তিনি হাসেন। বেশ লাগছে মেয়েটাকে—ভারি দুষ্টু। মিহিরকে জব্দ না করে ছাড়বে না। বলে, কই মা, জিজ্ঞাসা করুন ডাক্তারের নাম। ছাড়বেন না আপনি—

ভাব দুটিতে খুব—কিন্তু দেখ না, কি করছে পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো, একের অন্যকে অপদস্থ করবার চেষ্টা। অন্নপূর্ণা বললেন, যা করছিলি—করে যা তুই বাপু। ওর কথায় কান দিতে হবে না। মিহিরটা চিরকেলে মিথ্যুক। আমরা সবাই জানি।

হেঁসেল নিকিয়ে অনীতা কলতলায় হাত ধুতে গেল। অন্নপূর্ণা রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে ভিতরে মুখ বাড়িয়ে পরীক্ষা করছেন। দেখে খুশি হলেন। সত্যি—কাজকর্মের যোগ্যতা আছে মেয়েটার। চমৎকার।

মিহিরও দেখল মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে। করেছে কি দেখ—শুধু উনুন নয়, সিমেণ্টের মেঝের খানিকটা এবং খাড়া দেয়ালেরও হাত দুই পরিপাটি করে নিকিয়েছে। অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি। সহসা মনে পড়ল, সাবান নেই তো কুয়াতলায়। এক টুকরো সাবান নিয়ে সেদিকে ছুটল।

অনীতা সবিস্ময়ে বলে, সাবান কি হবে।

নোংরা গোবরমাটি ঘাঁটাঘাঁটি হল তো অনেক—

গোবর বুঝি নোংরা ?

ঘরে এসে তাই নিয়ে সে অন্নপূর্ণার কাছে হেসে হেসে নালিশ করে, শুনুন, শুনুন মা—আপনার ছেলেকে শাসন করুন। সাবান নিয়ে যাওয়া হয়েছে নোংরা ঘেঁটেছি বলে। গোবর হল নোংরা—কি রকম নাস্তিক তা হলে বুঝুন—

অন্নপূর্ণা প্রসন্ন হাসি হাসেন।

বলিস নে, বলিস নে। লেখাপড়া-জানা এক আকাট-মুখ্যু—ওর পরে ভরসা করি নে। তুমি মা জ্ঞানগম্যি দিও। সে তুমি পারবে।

সহসা গলা নামিয়ে বললেন, শোন্ তবে—এক গুহ্যকথা বলি। কতকালের বাসনা, বৃন্দাবনে গিয়ে থাকব—কিছুতে তা হয়ে উঠে না। মেয়ে দেখতে এলাম কলকাতায়। আহ্নিকের পর গোবিন্দজীকে খুব করে ডেকে বললাম, আমার কাঁধের বোঝা যে তুলে নিতে পারবে, সেই মেয়ে জুটিয়ে এনে দাও—তোমার পাদপদ্মে যাতে পড়ে থাকতে পারি ঠাকুর। প্রণাম করে চোখ মেলে সামনে দেখি, তুই এসে বসেছিস। লোকে বলে, আমার পছন্দ-করা কনে—তা নয় রে, ত্রিলোকতারণ গোবিন্দজী খুঁজে পেতে এনে দিয়েছেন।

আবার বললেন, এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—ঠাকুরের দয়া বলেই এমনটা হয়েছে। তুমি আমার জন্য দুটো ভাত চাপিয়ে দাও মা। আমার আজ ইচ্ছে করছে না, আলসেমি লাগছে। কত আর ভালো লাগে বলো !

অনীতার মুখ শুকাল। কিন্তু বিপন্ন ভাবটা চেপে নিয়ে সহজ সুরে বলে, আমায় রান্না করতে বলছেন ? স্বপাকে খান যে শুনেছি—

না খেয়ে করব কি ? এদ্দিন যে মায়ের দেখা পাই নি ! মা যা রেঁধে দেবে সে হচ্ছে অমৃত। অমৃত জোটে না বলেই দুটো করে চাল-সেদ্ধ খেয়ে বেঁচে রয়েছি।

দুধ-সংগ্রহের জন্য মিহির বেরিয়েছিল। ফিরতি মুখে দেখল, নিরিবিলি কুয়ার ধারে দাঁড়িয়ে অনীতা বিরজার কাছে পাঠ নিচ্ছে।

অনীতা বলে, তেল গরম হয়ে গেলে তখনই মোচা ছাড়ব ?

বিরজা একটু বিরক্ত হয়ে বলে, আগে জল দিয়ে সিদ্ধ করে নেবে। সিদ্ধ হয়ে গেলে তখন—

তেল-মশলা দেব কড়াইতে ?

এক কথা কতবার বলি বউদি? নিংড়ে জল বের করে নিতে হবে না? মোচার ঘণ্টটাও রাঁধতে জানো না—কি রকম তুমি!

অপ্রতিভ মুখে অনীতা বলে, এইবারটা বলে দাও লক্ষ্মী দিদি আমার, আমি ঠিক মনে করে রাখব। মোচা সিদ্ধ করে নামিয়ে জল নিংড়ে তো ফেললাম। তারপর?

মিহির মাঝখানে বলে, মোচার হাঙ্গামায় কাজ নেই। সাদামাটা দু-একখানা তরকারি হোক। সেই যথেষ্ট—

অনীতা হতাশ ভাবে বলে, ইচ্ছে করে হাঙ্গামায় যাচ্ছি নাকি? বাগান থেকে মোচা কাটিয়ে এনে মা নিজের হাতে কুটতে বসে গেছেন—

অবস্থা বুঝে মিহির মায়ের কাছে গিয়ে পড়ে, মা, মিছে তোমার কোটনা কাটা। ঐ মানুষ মোচার ঘণ্ট বেঁধে খাওয়াবে, তবেই হয়েছে!

কয়েকটা নটেডাঁটা এদিকে। তারই একগাছা তুলে লাঠি ধরার ভঙ্গিতে অন্নপূর্ণা বললেন, পালা বলছি—এখান থেকে পালা। তোর মিথ্যেকথা ধরিয়ে দিয়েছিল, সেইজন্য বাছার নামে কোটনামি করতে এসেছিস?

হাসতে হাসতে ডাক দেন, বউমা, শুনে যাও তো মা—

অনীতা আসতে বললেন, বলছে কি জানো? তুমি পারবে না মোচা রাঁধতে—

অনীতা বিস্ময়ের ভান করে বলে, কেন?

তাই তো বলি! গেরস্তঘরের মেয়ে সামান্য ঘণ্ট রাঁধতে পারবে না—এ কেমন কথা! রান্না করে দাও তো ওদের দেখিয়ে! একটু বুঝি দ্বিধান্বিত হয়েছেন মনে মনে। বলেন, কি বলো?

রাঁধবোই তো! সদ্য-লব্ধ বিদ্যার পরিচয় দিয়ে অনীতা বলে, আগে মোচা সিদ্ধ করে নিতে হবে কিনা—জল চাপিয়ে দিয়ে এসেছি। কিন্তু মা যতই ভালো রান্না হোক, নিন্দুকের নিন্দা বন্ধ হবে না। দেখা আছে কি না!

অন্নপূর্ণা বলেন, দেখবো আমিও। অন্যায় করে পিছনে লাগলে রক্ষে রাখব না। ধরে মারব, দেখতে পাবি। বড় হয়ে গেছিস তোরা—ওকথা আমি মানি নে।

চুলের বোঝা আলুথালু ভাবে জড়ানো, আঁচল কোমরে বাঁধা, আগুনের আঁচে মুখ রাঙা, কপালের উপর ঘাম ফুটেছে বিন্দু বিন্দু। মিহির দেখে দুঃখ করে, কি বিপদে এনে ফেললাম লজ্জার অবধি নেই। এমন একটা ব্যাপার হবে, আগে ভাবতে পারা যায় নি।

খুন্তি দিয়ে ঘুঁটতে ঘুঁটতে মুখ না তুলে অনীতা বলে, এখন হা-হুতাশ করে লাভ কি? বিপদ কাটিয়ে উঠতে হবে যেমন করে হোক—

এটা কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া যেতো। মা-কে রাজি করাতে পারতাম। বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে এই ফল।

অনীতা বলে, এত যখন সইছে, রান্নাই বা বাদ থাকবে কেন? ঘি সম্বরা দিয়ে নামাবো তো বিরজা-দিদি?—উঁহু, আর এগিয়ো না তুমি এদিকে। বিধবা মানুষ খাবেন—ওখান থেকেই যা বলবার বলো—

বলে অনীতাই বিরজার আঁশ-হেঁসেলের দিকে মুখ বাড়ায়। রান্নাবান্না তোমার যে শেষ বিরজা-দিদি—জায়গা অবধি হয়ে গেছে! বুঝতে পারলাম—খেতে আসা হয়েছে, তারই ফাঁকে একটু দুর্ভাবনা হচ্ছে! তা আমার জন্য ভাবতে হবে না কারো। খেতে হবে—নিশ্চিন্তে খেতে বসা হোক। সেই ভালো।

মিহির মৃদু কণ্ঠে বলে, বাইরের জনকে উপবাসী রেখে বাড়ির মানুষ খাবে, সেটা কি করে হয়?

আমি—আরে সর্বনাশ, পুরুষমানুষের সঙ্গে বসে খাবো? মা খাবেন, সকলের খাওয়া হয়ে যাবে—বাড়ির বউ সকলের শেষ।

মিহির তাই বসে পড়ল। দেরি করলে অনীতার খাওয়ার আরও দেরি পড়বে। হাতায় করে অনীতা খানিকটা ঘণ্ট এনে দিল।

কেমন হল, চেখে বলতে হবে। মুখ টিপে হেসে বলে, অন্যের প্রশংসা মুখ দিয়ে সহজে বেরোয় না, জানি। তবু জিজ্ঞাসা করছি।

কিন্তু শুধুমাত্র মিহিরের ব্যাপার হলে না হয় প্রাণপণে প্রশংসা করত এবং কায়ক্লেশে উদরস্থ করাও চলত। বিকট অষুধও তো দায়ে পড়ে খায়! কিন্তু রান্না যে মায়ের ইচ্ছেয়—বিশেষ করে তাঁরই জন্য। নিজে কুটে-ধুয়ে জোগাড় করে দিলেন—অথচ রান্নার ভার দিলেন কিনা অনীতার উপর, যার হাত

ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটই ধরেছে, হাতাখুন্তি ধরল বোধকরি এই প্রথম। পোড়া-পোড়া বিস্বাদ এই বস্তু মায়ের জিভে পড়লে কি কাণ্ড হবে—মায়ের মেজাজ ভাল রকম জানা আছে। দুর্যোগের শঙ্কায় দালানের খাটে মিহির চুপচাপ চোখ বুজে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। দরকার হলে এই অবস্থায় নিদ্রার ছলনা চলবে।

ঘণ্টাখানেক কাটল—মিহিরের সত্যি সত্যি তন্দ্রাও এসেছিল একটু। কোন-কিছু ঘটল না তো! উঁকি দিয়ে দেখে, ঘরের মধ্যে মেঝের উপর মা শুয়ে—অনীতা তাঁর শিয়রে পা ছড়িয়ে বসে পাকাচুল তুলছে। আর কত কি গল্প চলছে শাশুড়ি-বউয়ে! মোচার ঘণ্টের পরও এই রকম আলাপন—মায়ের হল কি?

কান খাড়া করল মিহির। মা বলে যাচ্ছেন, এই পুজোর সময়টা যা-সমস্ত দেখেছেন বউবয়সে। এক মাস আগে থেকে শোন, শেষ রাতে বাড়ি বাড়ি ঢেঁকির পাড় পড়ছে। চিঁড়ে কুটে কুটে ডোল বোঝাই হচ্ছে। পুজোর ক-দিন উঠোনে যে এসে দাঁড়াবে, তাকে চিঁড়ে দই বাতাসা খাওয়াতে হবে ভরপেট। আনন্দময়ী মণ্ডপে থাকতে কেউ অভুক্ত থাকবে না। দশমীর সকালবেলা প্রতিমায় গর্জন-তেল মাখিয়ে দিয়েছে—বিদায়ের দিন বলে মায়ের চোখ ছলছল করছে যেন। যে তাকাচ্ছে সেদিকে, সে-ও চোখ মোছে। জমেছে গাঁয়ের বউ মেয়েরা, তেল সিঁদুর দিচ্ছে প্রতিমার কপালে। তাই আবার তুলে নিয়ে এ ওকে মাখায়। কপালময় সিঁদুর লেপটানো, গাল ভেজা চোখের জলে—আবার আসিস মা আসছে বছর। তোর পাট ডুবিয়ে রেখে দিলাম ঠাকুরদীঘির জলে, বছর অন্তে আবার মণ্ডপে পাতব।···আর ঐ যেখানটায় খেয়া পার হয়েছিল ওরা। সে কি কাণ্ড! মেলা বসে যায় নদীর কূলে কূলে। কত দোকানপাট! নৌকো করে ভাসানের প্রতিমা আসছে এগ্রাম ওগ্রাম থেকে। এ ঠাকুর কোথাকার? নুরপুরের চৌধুরিদের। এটা জঙ্গিপাড়া বারোয়ারিতলার। ওটা আমতলির উমেশ ভটচাজ মশায়ের··· গোণাগুণতিতে আসে না এত! নৌকাবাইচ হচ্ছে—সাঁ সাঁ করে তীরের মতো জল কেটে যাচ্ছে। যে দল জিতবে—তারা পাবে পিতলের কলসি, আর প্রতি জনে এক পাট করে ধুতি চাদর। কত জায়গার কত পুরুষ মেয়ে নৌকা করে

দেখতে এসেছে—নৌকোয় নৌকোয় নদী-জল দেখা যায় না। মানুষজনের চেঁচামেচি, ঢাক ঢোল কাঁসিতে চারিদিক তোলপাড়—

হঠাৎ থেমে অনীতার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, একালে সমস্ত উড়ে পুড়ে গেল। লোকের মনে সুখ নেই, সে আমলের দরাজ বুক নেই, সমাজ সামাজিকতাও সমস্ত উঠে গেল একে একে। অন্নের ধান্দায় সামাল সামাল—কি করবে? কিচ্ছু পেলি নে তোরা মেয়ে, সে আমোদ উৎসবের কিছুই দেখলি নে—

অন্য সময় হলে অনীতা বলত, আমরা পেয়েছি মা, গোটা পৃথিবী। সে পৃথিবী ছোট হয়ে একেবারে ঘরের উঠোনে এসে পড়েছে। অথবা উঠোনেরই বেড়া ধ্বসে গিয়ে চারিদিক একাকার হয়ে গেল। অনেক লোকের ভিড়—অনেকবিধ দায় ও দায়িত্ব। আত্মীয়গোষ্ঠী নিয়ে তোমাদের খণ্ডিত উৎসব আজ কোটি কোটির জনতা বখরা করে নিয়েছে। তাই আমাদের মহোৎসব সকলের বড় একটা চোখে পড়ে না।

জাঁক করে অনেক বলা যেতো, কিন্তু বলল না। অতীত তার সঙ্কীর্ণ মহিমার বড়াই করছে, এ জায়গায় আঘাত দিতে নেই।

২৩

মিহির এসে তাগাদা দেয়, কই মা, শুয়ে শুয়ে এখনো গল্প করছ—যাবে তো গোছগাছ করে ফেলতে হয় এবার।

অন্নপূর্ণা হাই তুলে বললেন, আজকে যাওয়া হবে না। শরীর কেমন খারাপ লাগছে, নড়তে চড়তে ইচ্ছে নেই।

চোখে অন্ধকার দেখে মিহির। তাড়াতাড়ি বলে, ও কিছু নয় মা। উঠে পড়ো দিকি—ঠিক হয়ে যাবে। ও বেলার ট্যাক্সিটা আসতে বলে দিয়েছি। আবার বীরেশ্বর কাকাকেও চিঠি লেখা হল, জঙ্গিপাড়ায় গিয়ে তুমি পুজোর কেনাকাটা করবে—

অন্নপূর্ণা বলেন, জঙ্গিপাড়ায় বড্ড দর। মনের মতন কাপড়চোপড়ও পাওয়া যায় না। তাই ভাবছি, জিনিসপত্তোর কলকাতা থেকে যতদূর পারি নিয়ে যাবো—

হেসে বললেন, আর সব হল পুজো, এটা হলগে উৎসব—দুর্গোৎসব। জিনিস দুটো চারটে তো নয়! তুই একটা ফর্দ কর্ দিকি—আমি বলে যাচ্ছি। সেই ভালো। বাড়ি পৌঁছতে ঘণ্টা কয়েক যেমন দেরি হবে, এদিকের কাজকর্মও তেমনি অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

আর উপায় কি—মায়ের কাছে বসে বসে মিহির লম্বা এক ফর্দ করল। নিয়ে বেরুচ্ছে—অনীতাকে একান্তে পেয়ে বিপন্নভাবে বলে, একটা বেলার জন্য নিয়ে এসে কি ফ্যাসাদে ফেললাম! মা হলেও বলব—কলকতায় জিনিসপত্র কেনা অজুহাত। ছেলের সংসারে ছুতোনাতায় কিছু বেশি সময় থেকে যেতে চান, আর কি! বড্ড সুখের সংসার মনে করেছেন বোধ হয়—

অনীতা বলে, ঝড়ুদাকে বলে এসেছি—মেয়েদের সঙ্গে বটানিক্যাল বাগানে পিকনিক করতে যাচ্ছি।

মিহির বলে, সেই তো বিপদ! বটানিক্যাল বাগানে সারারাত কাটানো যায় না। কি আর বলি, বলবার কোন মুখ নেই—

অনীতার কিন্তু বিশেষ চিন্তার লক্ষণ দেখা যায় না। যাকগে, যাকগে—এখন আর মিছে ভেবে কি হবে?

কিন্তু একটা কিছু বলতে হবে তো বাড়ি ফিরে!

নির্ভয় কণ্ঠে অনীতা বলে, পুরো একটা রাত হাতে রয়েছে। ভেবে নেওয়া যাবে এর মধ্যে যা হোক কিছু। বাবা সকালবেলা ফিরছেন, তার আগে পৌঁছতে পারলে হয়!

বলতে বলতে গা ধোওয়ার জন্য কুয়াতলার দিকে চলে গেল।

বেহান ঠাকরুন আছেন?

হীরালাল হাঁক দিয়ে এসে উঠলেন। রোয়াকে মাদুরের উপর চেপে বসে বললেন, অফিসের কাজে শেয়ালদহ এসেছিলাম। তা ভাবলাম, তীর্থধর্ম করে ফিরলেন—পুণ্যাত্মা মানুষের সঙ্গে দেখা করে দুটো ভালো কথা শুনে আসি। নরককুণ্ডে পড়ে থাকি, আমাদের তো ওসব হয়ে উঠবে না।

অন্নপূর্ণা বলেন, আমি এসেছি—টের পেলেন কি করে?

পুজোর মুখে আসবেন, সেটা জানতাম। পারুল লিখেছিল। তারপরে মিহির বাবাজি অফিসে দরখাস্ত করল, সোমবারে কামাই করবে। তার কাছ থেকে সঠিক জানতে পারলাম।

তা বটে! আপনার অফিসেই তো মিহির কাজ করে—

বুক চিতিয়ে হীরালাল বলেন, জানেন না বুঝি? কাজটা আমিই করে দিয়েছি।

অন্নপূর্ণা হেসে বললেন, আপনারা ছাড়া কে করবে? কাজের চেষ্টায় প্রথম এসে তো আপনার মেসেই উঠেছিল।

হীরালাল বলেন, মেজবাবুকে একবার বলতেই নিয়ে নিলেন। এতখানি খাতির আমার! অথচ দেখুন, কি কাণ্ড করে আসা হল ওদের বাড়ি থেকে। সে মেয়ের খুব ভাল জায়গায় বিয়ে হয়ে গেছে। বিধিলিপি—বুঝলেন বেয়ান, আপনি আমি কি করতে পারি? হীরে ভেবে কাচ তুলে নিলেন, এখন পস্তাচ্ছেন—

অন্নপূর্ণা বিরক্ত হয়ে বললেন, পস্তাবো কেন?

শোনেন নি কিছু ?

অন্নপূর্ণা বলেন, চোখে দেখে বউ করে ঘরে তুলেছি—শোনা খবর কি তার চেয়ে বড় ?

হীরালালের মুখের উপর তাকিয়ে বলতে লাগলেন, শোনাতে চায় বটে অনেকে—তাই দেখি বেহাই, মা মরা মেয়েটার বিস্তর শুভার্থী ! বলব কি আপনাকে, ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ো চিঠি যেতো বৃন্দাবনের ঠিকানায়। একটা দুটো পড়েছিলাম—তারপর দাদা একদিন বললেন, আমাদের অমৃতলোকে কাদা ছুড়ে ছুড়ে মারছে হিংসুটে শয়তানেরা। মনের শান্তি কেন নষ্ট করিস ঐ সব নিন্দেমন্দ পড়ে ? সেই থেকে চিঠি এলে না খুলেই উনুনে চালান করতাম।

হীরালাল মুখ কালো করে রইলেন। শেষে মরীয়া হয়ে বললেন, নিন্দেমন্দগুলো মিথ্যে না-ও হতে পারে ! বউমা নাচ-গান করেন হাট জমিয়ে, আমি নিজের চোখে দেখেছি বেহান।

অন্নপূর্ণা স্মিতমুখে বলেন, আপনি কি বলবেন বেহাই। আমি টের পেয়েছি পয়লা দিন দেখেই। ওর হাঁটাই হল নাচনা। কথা বলে গানের সুরে।

যত্রতত্র বেপরোয়া উনি ঘুরে বেড়ান—

এবারে আশ্চর্য হলেন অন্নপূর্ণা। তাই না কি ? দেখুন দিকি—আমার কাছে একেবারে ভিজে-বিড়াল ! সাহস হিম্মত আছে, নিজের পায়ে ডঙ্কা মেরে বেড়াতে পারে—সেইটে বুঝতে পারলে তো নির্ভাবনায় গোবিন্দজীর পায়ে পড়ে থাকতে পারি।

কুয়াতলার দিক থেকে অনীতা গা ধুয়ে আসছে। সাড়া পেয়ে অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি বলেন, যাকগে বেহাই, আর গুণ-ব্যাখ্যান করবেন না। আমার লাজুক মেয়ে—ভালো বললে লজ্জায় নেতিয়ে পড়ে।

হীরালাল অবাক হয়ে বলেন, উনি এখানে ?

তা ছাড়া কোথায় ? বাসা কে চালাচ্ছে তবে ? ঠিক করলাম বেহাই, হাঁসপুকুরের সংসার যেমন চলছে তেমনি চলুক—এ বউমা এখানেই থাকবে। পুজোর সময়টা দু-চারদিন গিয়ে ঘুরে আসতে চায়, আলাদা কথা। কিন্তু মিহির এখানে নিজে রান্না করে খাবে, সে হতে পারে না। রান্নার কত ক্ষমতা, সে তো জানাই গেছে সেবারের ফ্যান গালার ব্যাপারে।

খুব হাসতে লাগলেন অন্নপূর্ণা। হীরালালের কথা সরে না। দীর্ঘশ্বাস করে উনি একেবারে আলাদা হয়ে এসেছেন। চড়কবাড়ির মেয়ের বেলা তো গোখরো সাপের মতন ফোঁস করে উঠেছিলেন।

বিরজা চা-খাবার নিয়ে দালানে ঢুকল। অন্নপূর্ণা বলেন, উঠুন বেহাই—

অত খাবার এই অবেলায় ? আমার যে অম্বলের অসুখ—

বউমা নিজের হাতে করেছে। অমৃত খেলে অম্বল হবে না। চলুন—

অতসব উনিই করেছেন ?

সমস্ত। রাঁধতে খাওয়াতে বড্ড ভালবাসে। কি রে বিরজা ?

খাবার তৈরি করেছে বিরজা। কিন্তু অন্নপূর্ণার কথায় হাসিমুখে সে সায় দিল, হ্যাঁ ছোট-মা—বউদিদি উনুনের কাছে আমায় মোটে যেতেই দিল না।

সারাদিনের খাটনির পর হীরালালের ক্ষিধে পেয়েছে, পরিতৃপ্তির সঙ্গে তিনি খাচ্ছেন। অন্নপূর্ণার দরকারি কথাটা মনে পড়ে যায়।

সকালের দিকে আপনার সময় হবে বেহাই ?

মুখ তুলে হীরালাল বলেন, কেন বলুন তো ?

আজকের দিনটা মিহির অফিস কামাই করল। নতুন চাকরি—কাল আর পেরে উঠবে না। জিনিসপত্রের আণ্ডিল নিয়ে যাচ্ছি—তাই ভাবছিলাম, কেউ যদি সাথে-সঙ্গে থেকে গাড়িতে তুলে দিতেন। জলপাড়ায় নামবার সময়টা অসুবিধা নেই—স্টেশনমাস্টার আমাদের চেনা।

হীরালাল বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু পাটোয়ারি ব্যক্তি—মেয়ে জামাইর ভবিষ্যৎ ভেবে ঘুণাক্ষরে তা প্রকাশ হতে দেবেন না। আর দাঁড়াচ্ছেও মোটের উপরে মন্দ নয়। অন্নপূর্ণার অবর্তমানে পারুল কর্ত্রী হয়ে থাকছে—মিহিরের বউ তার মধ্যে চুঁ মারতে যাবে না। রাজি হয়ে তিনি বলেন, এ আর কত বড কথা ! সকালে উঠেই চলে আসব।

ওখান থেকে একটা গাড়ি ঠিক করে তাতেই চেপে আসবেন। এ পোড়া জায়গায় গাড়ি মেলে না।

একটু ইতস্তত করে বলেন, তা যেন হল ! কিন্তু অফিস তো আপনারও আছে—অসুবিধা হবে না তো ?

কিছু না, কিছু না। আমার কাজ বাইরে বাইরে—ঘড়ি ধরে আমায় হাজরে দিতে হয় না।

আরও জাঁক করে বলেন, একেবারে না গেলেই বা কি।৷ মাস ভোর অফিসে না গেলেও বাবুরা কিছু বলবেন না। এমনি খাতির আমার!

অন্নপূর্ণাব আহ্নিকের সময় হল, হীরালাল উঠলেন। যাবার মুখে আবার নিশ্চিন্ত করে যান, তাই ঠিক বইল বেহান। একবাবে গাড়ি নিয়ে আসব, আপনি তৈরি থাকবেন।

আহ্নিকের পর চোখ মেলে অন্নপূর্ণা দেখলেন, অদূবে পাথবের থালায় পেঁপে, আপেলের টুকবো, মুগের অঙ্কুর, একটুকু ছানা ও দুটো সন্দেশ পরিপাটি করে সাজানো। জায়গাটা আব একবার ধুযে, কোথা থেকে একটা আসন সংগ্রহ কবে পেতে দিযেছে। পাথবেব গেলাসে জল, সামনে প্রদীপ। কিছু বলতে হল না। আসনে বসে অন্নপূর্ণা বললেন, বাতে খাই নে। আজ কিন্তু আমার লোভ ধরিয়ে দিলি। এমনি কবে সাজিযে দিলে আপনি ক্ষিধে পায়।

অনীতা মুচকি মুচকি হাসে। বলে, উঃ—কি ভযটা দেখিয়েছিল সকলে মিলে! আপনি নাকি ভযানক বদবাগি—একটু খুঁত পেলে বেগে যান।

যাই-ই তো! তোর যে খুঁত পাচ্ছি নে—রাগবো কেমন কবে?

অনীতা বলে, একবাবে আনাড়ি আমি মা। কিছু জানি নে, কোন কিছু বুঝি নে। আপনি চোখ বুজে থাকেন—তা খুঁত পাবেন কি করে?

অন্নপূর্ণা হেসে বলেন, তোর মনটা যে গঙ্গাজল! একবার দেখেই বুঝে নিযেছি। যা তুই করিস, সমস্ত নিখুঁত। কিছুতেই আমি রাগবো না। দেখ, চেষ্টা করে দেখ্—

খাওয়া শেষ হলে অনীতা জামবাটি ভরে গরম দুধ এনে দিল।

অন্নপূর্ণা বলেন, দুধটুকু তোকে যে খেতে বলেছিলাম। না খেয়ে বেখে দেওয়া হয়েছে কেন?

দুধ আমি খেতে পারি নে মা—

আমি বললাম, তা কথাটা মোটে গ্রাহ্য হল না? অবাধ্য বজ্জাত মেয়ে—

গালি খেয়ে অনীতা কিন্তু হেসে ওঠে, এই যে মা রাগবেন না আমার পরে? বলতে বলতেই অমনি?

অন্নপূর্ণা বেকুব হয়ে বললেন, তোর একটা মেয়ে হোক। তখন বুঝবি মেয়ে না খেলে মায়ের রেগে যেতে হয় কিনা।

মেয়ে আমার আছে। মেয়ে যদি অবাধ্যপনা করে রাতে আমি ভাত খাবো না, এই বলে দিচ্ছি।

অন্নপূর্ণা মুখ তুলে তাকালেন। অনীতা দৃঢ়স্বরে বলে, জলবিন্দু মুখে দেবো না—দেখবেন।

অন্নপূর্ণা হতাশ ভাবে বললেন, একালের মেয়েগুলো কি শয়তান রে! সেকালকে ট্যাঁকে পুরে ফেলল এর মধ্যে?

শেষপর্যন্ত আপোষ হল, জামবাটির অর্ধেক দুধ শাশুড়ি খাবেন, বউ বাকিটা প্রসাদ পাবে। শাশুড়ির সামনে বসেই চুমুক দিতে হবে, আড়ালে গেলে হবে না।

মুটের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে মিহির সওদা শেষ করে অনেক রাত্রে বাড়ি এল। পরমাশ্চর্য ব্যাপার—চোখ কচলে পরখ করতে হয়, স্বপ্ন দেখছে কি না। মেঝের উপরে ঠাঁই করে অনীতা বসে আছে—থালার চতুর্দিকে সারি সারি বাটি। ব্যঞ্জন ও দধি মিষ্টান্নে দশ বারো পদ অন্তত হবেই। এবেলা মায়ের রান্নাবান্না নেই, অতএব অনীতার হেঁসেলে ঢুকবার কারণ ছিল না। বিরজা এত রেঁধেছে বসে বসে? অন্তর পুলকিত হল—মা হুকুম দিয়েই এত সমস্ত করিয়েছেন। চিরকালই সে একটু ভোজন বিলাসী—কিন্তু তরকারি ইদানীং একটা দুটোর বেশি প্রায় কখনো জোটে না। স্বাদও তার তেমনি!

বিরজা ঘুমুচ্ছিল—তাকে ডেকে অনীতা বলে, লেচি কাটা আছে—তুমি বেলে দাও বিরজা দিদি, আমি ভেজে ভেজে পাতে দিই—

মিহিরকে বলে, আস্তে আস্তে খেতে হবে কিন্তু। কখন ফেরা হবে কিছু তো ঠিক ছিল না—লুচিটা তাই ভেজে রাখি নি।

মিহির বলে, বিরজা রাঁধে নি এবেলা?

অনীতার হাসিমুখের দিকে চেয়ে সমস্ত বুঝল। বলে, এত সমস্ত করতে কে বলল? কত যে আমার লজ্জা হচ্ছে!

চোখের ইঙ্গিতে অনীতা থামিয়ে দেয়। ফিসফিস করে বলে, চুপ! মা ঐ ঘরে—হয়তো বা জেগে রয়েছেন।

খুমোন নি অন্নপূর্ণা। ছেলের সাড়া পেয়ে উঠে এসে পাতের সামনে বসলেন। অনীতাকে বললেন, আমি দেখছি বউমা। তোমার খাবারটা নিয়ে যাও —আর কত রাত করবে ?

মিহির বলে, আচ্ছা মা, না খেয়ে এত রাত্তির অবধি বসে থাকবার মানে হয় কিছু ?

অন্নপূর্ণা বলেন, সে আমি কতবার বলেছি। কানে নিল না। আজকালকার মেয়ে—কিন্তু ভক্তিশ্রদ্ধা নেই আমাদের আমলে যেমনটি দেখা যেত। আমি বলছি বউমা, মিহির বসে গেছে যখন—কিছু দোষ হবে না। তুমি খেতে বোসোগে।

অনীতা অবহেলায় বলে, খাবো—হোক না একটু দেরি। কি হয়েছে ?

অন্নপূর্ণা হাসতে হাসতে বলেন, অবাধ্যপনা করবি তো পিটুনি লাগাবো। একটা কথা শুনবি নে—কি ভেবেছিস বল্ তো !

অনীতা যেন কত অনিচ্ছার সঙ্গে খাবার নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

অন্নপূর্ণা বললেন, মাংসটা কেমন হয়েছে—ও, খাস নি এখনো ? মিষ্টি-মিষ্টি রান্না তুই ভালবাসিস—বউমা তাই শুনে কত যত্ন করে নিজের হাতে বাটাঘষা করে রেঁধেছে।

রঙে ও গন্ধে মিহির প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছিল—সমস্ত আগ্রহ তার উপে গেল সঙ্গে সঙ্গে ! মুখেও বলল, তোমার বউমা রেঁধেছে—তবে আর মুখে দিয়ে কি হবে ?

অন্নপূর্ণা তাড়া দিয়ে ওঠেন, যখন তখন পিছনে লাগবি নে বলছি—খবরদার ! বড় আস্পর্ধা হয়েছে—আমার সামনে মেয়ের রান্নার নিন্দে ?

অনীতা কাছাকাছি নেই তবু নিম্নকণ্ঠে মিহির বলল, দুপুরের ঐ মোচার ঘণ্ট—তারও তুমি তারিফ করছিলে মা বিরজার কাছে। আমি নিজের কানে শুনেছি।

আচ্ছা, দেখ্ খেয়ে এবার—

সন্তর্পণে মিহির একটি টুকরো মুখে দিল। না, মন্দ নয় তো…ভালই—চমৎকার—অত্যন্ত উপাদেয়। চেটেপুছে খেয়ে ফেলল, আরও পেলে আপত্তি ছিল না। বলে, এ রান্না তোমার বউয়ের—সত্যি বলছ মা ?

বিজয়দর্পে অন্নপূর্ণা বলেন, কেমন—বলি নি আমি ?

২৪

খাওয়ার পর এইবারে যে অতি কঠিন সমস্যা! অনীতা ঘরে এলো পান চিবাতে চিবাতে। গল্প করছে অত্যন্ত সহজভাবে—নানান আজে বাজে কথা। মিহির ঘেমে উঠেছে ভয়ে। মা ওঘরে আছেন—আর এই একটা মাত্র ঘর! অনীতা মনে না করে, এ একটা ষড়যন্ত্র—মেজাজ হারিয়ে না ফেলে এত-সমস্ত কাণ্ডের পর। কিন্তু এত হাসিখুশির মধ্যে মিহির তুলতেও পারছে না সে কথা।

মাংসটা কার রান্না! শুনলাম না কি—

শোনা হয়েছে ঠিকই। বিশ্বাস হচ্ছে না?

হবে কেমন করে? বন থেকে বেরুল টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। রান্নাঘরে পয়লা দিন ঢুকেই দেখানো হল, ওস্তাদ এ বিদ্যেরও।

অনীতা হেসে বলে, তবে বলি। বিদ্যে আমার নয়—মা সর্বক্ষণ পাশে পাশে দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন। শেষটা এই রাতদুপুরে আবার তাঁকে চান করতে হল। তার মানে—ওবেলা আমার মোচার ঘণ্টের অপযশ খণ্ডন করে দিলেন এমনি ভাবে।

যশ তো কত দিকেই ছড়ানো! রান্নার যশ-অপযশে কী-ই বা হবে!

অনীতা গাঢ় স্বরে বলল, তাই তো ভেবে এসেছি বরাবর। কিন্তু আজকে নতুন কথা ভাবছি। আমার পড়াশুনোর যশ, নাচ-গান-অভিনয়ের যশ, দৌড়ঝাঁপ-সাঁতারের যশ...কিন্তু চারদিকে ছড়ানো এলোমেলো যশে কেমন যেন মন ভরে না।

সহসা চোখ সজল হয়ে ওঠে, আমার মা ছিল না, ঘর-সংসার কখনো চোখে দেখি নি—সংসারটাকে অতি-তুচ্ছ ভেবে এসেছি বরাবর।

আরও রাত হল। আকাশ মেঘ-মেঘ করছিল। হঠাৎ জোরে বৃষ্টি এলো। ফুলশয্যার রাতেও হয়েছিল এমনি। মিহির একবার দরজা খুলতে গিয়ে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে। বৃষ্টির ছাটে ভিজে গেল ঘরের মেঝে।

অনীতা প্রশ্ন করে, বাইরে কি ?

মিহির উদ্বিগ্ন স্বরে বলে, অনেক রাত হল। একটা মাদুর-টাদুর নিয়ে রোয়াকে শোব ঠিক করেছিলাম। দূরে কোথাও যাওয়া যায় না—মায়ের তা হলে নজর পড়ে যাবে।

অনীতা বলে, রোয়াকে জলের সমুদ্দুর খেলছে। ঘরে কি অসুবিধে হল ?

ঘরে ?

আমি দিব্য ঘুমুতে পারব—কিছু আমি গ্রাহ্য করি নে। অসুবিধে আমার দিক দিয়ে কিছু নেই।

বলেই সে শুয়ে পড়ল খাটের উপর। এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ বোঁজা। আহা, বড্ড কষ্ট হয়েছে আজকে—বড় খাটনি গেছে! স্থির মূর্তির মতো নিস্পন্দ মিহির দাঁড়িয়ে আছে।

বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে অনীতা দৃকপাত নেই। কোথায় দম্ভ এখন নতুন কালের মেয়ের—আমাদের গরিব ঘর-গৃহস্থালী সম্পর্কে বক্রোক্তি, পরিহাস ? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নিশ্চয় অভিনয় হচ্ছে না—কোমল আত্মসমর্পণের ভাব তোমার সর্বাঙ্গে, সুমধুর ছবি একখানি যেন!

জানো অনীতা, বড় অভিনেতা আমিও। দেশসুদ্ধ লোককে ধোঁকা দিয়ে আসছি, নিজের মা'কে পর্যন্ত। সবাই জানে, বাপের এক মেয়ে—বাপের কাছা-কাছি থেকে সোনারপুরের সংসার করে। বাপেরও কাছে থাকে অনেক সময়। আর শ্বশুরবাড়ির আদরের জামাই—আমাকে যখন তখন যেতে হয় সেখানে। বন্ধুরা কত ঠাট্টাতামাসা করে এই নিয়ে। আমার চিঠির টুকিটাকি খবর পড়ে তোমার এই আজকের মূর্তিই মা আমার মনে মনে কল্পনা করে এসেছিলেন—

সকালবেলা হীরালাল এসে পড়লেন। দেরি করে ফেলেছেন। কোন ট্যাক্সি আসতে চায় না এতদূর—সেইজন্যে দেরি।

তাড়াতাড়ি করুন বেহান, সময় নেই।

অনীতা দু-পায়ে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করল।

অন্নপূর্ণা তার মুখের দিকে চেয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে স্নেহকণ্ঠে বলেন, মায়াবিনী! একটুতেই চোখ ছল-ছল করে। তা কি হয়েছে। ষষ্ঠীর আগে

যে মিহিরের ছুটি নেই। দু-জনে যাস চলে সেই সময়, পুজোর ক'দিন কাটিয়ে আসিস।

মিহির আঁৎকে ওঠে, এই আবার বিপদ! অসুখ করেছে অনীতার, যেতে পারল না—এই রকম একটা কিছু বানিয়ে বলতে হবে আর কি!

অন্নপূর্ণা পরমোৎসাহে বলছেন, দিব্যি হবে রে। ঘুর-ঘুর করে তুই পুজোর জোগাড় করে বেড়াবি। আমি চেয়ে চেয়ে দেখব—জগজ্জননী মেয়ে হয়ে এসে নিজের কাজকর্ম গুছিয়ে নিচ্ছেন।

অনীতা বলে, পুজোর কাজ করতে পারব আমি?

শোন কথা! উনি কাজ করবেন না, গদির উপর বসে থাকবেন। আর তিনকালে বুড়ি আমি খেটে খেটে মরবো!

ছোঁয়াছুয়ি হবে যে তা হলে—

অন্নপূর্ণা হেসে বলেন, কি বোকা মেয়ে রে। না ছুঁয়ে কাজকর্ম হবে কেমন করে?

অনীতা কেঁদে পড়ল, একালের মেয়ে—কত রকম অনাচার আমাদের! আপনি তো জানেন না মা—

অন্নপূর্ণা চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, জানাজানির কিছু নেই। গঙ্গাজলে ময়লা ভেসে গেলেও জল তাতে দুষে যায় না। নইলে চিরকাল স্বপাকে খেয়ে রান্না করতে বলি তোকে? রাক্ষুসীর মতো গিলতে বসি তোর দেওয়া জলখাবার?

হীরালাল ওদিকে চেঁচামেচি করছেন, কি হল বেহান? গাড়ি আজ নির্ঘাৎ ফেল হয়ে যাবে।

অন্নপূর্ণা এক কাণ্ড করলেন—ট্রাঙ্ক থেকে একজোড়া বালা বের করে পরিয়ে দিলেন অনিতার হাতে। গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, এ বালা আমার শাশুড়ি আমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন। শুনেছি তাঁকেও পরিয়েছিলেন তাঁর শাশুড়ি। শাশুড়িরা এ বংশের বউদের আশীর্বাদ করেন এই গয়না দিয়ে।

পরিয়ে দিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ট্যাক্সিতে উঠলেন।

যা ভয় ছিল—গাড়ি ছেড়ে গেছে। পরের গাড়ি সেই সন্ধ্যাবেলা। অন্নপূর্ণা বললেন, এক কাজ হোক বেয়াই মশায়। বউমার বাপের বাড়ি তো

পানিমতলার কাছাকাছি! পুজোয় মেয়ে যাচ্ছে—তাঁকেও বলে আসি, সময় করে যদি যেতে পারেন। আমার নিজের গিয়ে বলা উচিত।

হীরালাল ঘাড় নেড়ে বলেন, সে খুব ভালো কথা। গরিব-গরিব বলে কন্যাদায় কাটিয়েছিলেন—গরিব কুটুম্বর ঘরদোর আসবাবপত্তোর গুলো দেখে আসতে পারবেন অমনি।

গাড়ির শব্দ পেয়ে হিমাংশু ছুটতে ছুটতে ফটকে এলেন। ভেবেছেন, অনীতা এসেছে। অন্নপূর্ণাকে দেখে তিনি হাহাকার করে উঠলেন, ও বেহান, আপনার বউমা বটানিক্যাল বাগানে কাল বনভোজনে গিয়েছিল, আর ফেরে নি। আমি বাইরে গিয়েছিলাম, এই এসে শুনছি—

অন্নপূর্ণা বললেন, আমি জানি ওদের খবর। পালিয়ে গিয়ে নিজের জায়গায় উঠেছে।

ভালো করে শুনে নিয়ে হিমাংশু বলেন, কি কাণ্ড বলুন দিকি! কত রকম ভাবছি—বাগানের পাশে গঙ্গা, আর যা ডাংপিটে মেয়ে! যাবে, তা মিথ্যে কথা বলে চলে যায় কেন?

অন্নপূর্ণাও একমত। এই জন্যে বেহাই, দু-চক্ষে দেখতে পারি নে আজকালকার ছেলেমেয়েদের—

অভিনয় শেষে এবারে সাজপোশাক গুটানোর পালা। অনীতা স্নান করে নিয়েছে। মিহির অফিসে বেরুবে—একসঙ্গে ট্রেনে যাবে দু-জনে।

অনীতা বলে, অভিনয়ে খুঁত বিশেষ হয় নি—ভালই হয়েছে বলতে হবে। হ্যাঁ?

মিহির উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে, কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাবো জানি নে। মা কত যে তৃপ্তি পেয়ে গেলেন! পোড়ো-বাড়িতে একটা দিন আনন্দের লহর খেলে গেল। টেঁকা মুসকিল হবে এর পর, শ্মশানের মতো ঠেকবে—

বলতে বলতে অনীতার মুখে চেয়ে উচ্ছ্বাস থামাল। বলে, দু-পাঁচ দিন পরে আবার অবিশ্যি সব ঠিক হয়ে যাবে—

অনীতা বলে, সংসারে কি সব জন্তু বা আটকায়? খোলস ছেড়ে এবারে বাঁচি। আমার জুতো—

জুতোর খোঁজ পড়ল পুরো একটা দিন পরে। রান্নাঘরের পিছনের চালায় এশটা আজে-বাজে জিনিসের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল—রাতের বৃষ্টিতে ভিজে গেছে।

অনীতা হাসছে, বাঁ-হাতে তুলে ধরেছে একপাটি। বলে, ভিজে যেন আমসত্ত হয়ে গেছে। দূর—

ছুঁড়ে দিল জুতো। পাঁচিল পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

মিহিরের লজ্জার অবধি নেই।

তাই তো! খালি পায়ে যাওয়া যাবে কি করে?

কাপড়চোপড় ভাঁজ করছে অনীতা। সিঁদুরের কৌটো পরম যত্নে তুলে নিল ব্যাগে। তারই মধ্যে মিহিরের কথার জবাব দেয়, জন্মের দিন তো খালি পায়েই এসেছিলাম মশায়—

হাতের বালা খুলতে গিয়ে অনীতা থেমে গেল। কি যেন ভাবছে।

মিহির বলে, কি?

কিছু না। এই যে···ভাবছি, কিছু ভুলটুল হল কি না—

হঠাৎ ডান-হাতের চুড়িগুলো আর বাঁ-হাতের ঘড়ি খুলে অনীতা মিহিরের হাতে দিল। বলে, বালাজোড়া আমার খুব পছন্দ। ও আমি খুলব না।

মিহির আশ্চর্য হয়ে বলে, সাদামাটা ঐ সেকেলে জিনিস?

কিন্তু ওজন কত? এখনকার সব তো ফাঁকিজুকি।

একটু থেমে বলে, তা ছাড়া মা হাতে পরিয়ে দিলেন—যতই হোক, মা বলে ডেকেছি ওঁকে। তাই খুলতে কেমন কেমন লাগছে। তা এই চারগাছা চুড়ি আর ঘড়ির দামে বোধ হয় হয়ে যাবে—

মিহির বলে, বালা থাকুক—চুড়িঘড়ির জন্যেও তো কৈফিয়তের দায়ে ঠেকতে হবে।

অনীতা আগুন হয়ে বলে, সে আমি বুঝব। তা বলে দয়ার দান নিয়ে যাবো না কি এখান থেকে?

পরক্ষণে শান্তকণ্ঠে বলে, যাওয়া যাক তবে এবার—

মিহির বলে, কিছু ভুলটুল হল কি না—দেখে নেওয়া ভালো।

ভুল? নিশ্বাস ফেলল অনীতা। এক পা দু-পা এগিয়ে গিয়ে আবার দাঁড়ায়।

সহসা আকুল হয়ে বলে, ভুল তোমার। পাষাণ তুমি, মানুষ নও। কেন যেতে দিচ্ছ আমায়? আমার মা নেই, ভালো হবার কথা বলে শাসন করবার কেউ নেই—তাই আমি এমনি হয়েছি। লজ্জা করল না—আদর করে মা যা হাতে পরিয়ে দিয়েছেন, তাই খুলে দিচ্ছিলাম—আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলে তুমি?

ঈ, মিহিরের বুকে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু-চোখে জলের ধারা বইছে। ক্লান্ত কণ্ঠে টেনে টেনে বলে, আমাব নিজেব জায়গা তুমি নিতে দাও। আব পাবছি না অভিনয় করে করে।

শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকায়। হিমাংশু আব অন্নপূর্ণা দুই বেহাই-বেহান দরজায় এসে প:ডছেন। তাড়াতাড়ি তাঁবা সবে গেলেন। লজ্জা, লজ্জা!

॥ সমাপ্ত ॥